কবিতা

১৩৪৭-৪৮

Apologia pro vita sua

বুদ্ধদেব বসু

পুরোনো পাথরে ব'সে সুনন্দা সেদিন :
'বরং, অজ্ঞাত, অজ্ঞ, কাটাও আষাঢ়
পাটক্ষেতে হাঁটুজলে ; বরং সৌখিন
চিন্তাহীন সাঁওতাল পুরুষ হও, যার
দিনগুলি খনির তিমিরে মৃত, তবু
মৃত নয়, তবুও বসন্ত আসে, হাওয়া
হানে দুরন্ত দক্ষিণ, ভাঙে জবুথবু
জীবনের বেড়ি, গন্ধ ছড়ায় মহুয়া,
জড়ায় নির্লজ্জ হাত যুবতীর কটি।
আমি বলি, বরং বঞ্চিত হও, হও
অন্নহীন অন্নদাতা, হও তৃণ, মাটি,
অনামি খনিক, করাল রৌদ্রের দিনে
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙো, তবু
তবু বলো মনে-মনে, "রোগে দুঃখে ঋণে
বুভুক্ষায় জীবন বিনষ্ট আমাদের,
সন্তানেরা দগ্ধ ধান্যমঞ্জরীর মতো,
নিরুপায় প্রয়োজনে বন্দিনী জায়ারা।
আমরা মৃত্যুর, তবু জীবন জীবিত
আমাদেরই পশু শ্রমে। আমরা মৃত্যুর,
তবু নই সে-বিদ্যার ক্রীতদাস, যার
বশ্যতায় যাপে দিন ধূর্ত, সুচতুর
রাজমন্ত্রী পুরোহিত দিক্‌পালের দল,
আততায়ী ব্যবসায়ী, পতিতপাবন

মহাত্মা, মানবশ্রেষ্ঠ ; দৈনিকপত্রের
পতাকায় সমারূঢ় যারা ; উচ্চচূড়া
সমাজের, মহত্ত্বের অক্লান্ত ফোয়ারা,
উদার পরোপকারী কৃতী লোকপ্রিয়,
সংসারী সুজন আর সুমেধী সন্ন্যাসী ;
ক্রূর যারা, ঐশ যারা, যারা পৃথিবীর
আত্ম-বৃত নেতা, তারা যে-বিদ্যায় দক্ষ,
লোকে যার সুবুদ্ধি রটায় নাম, তার
স্পর্শে ঘৃণ্য নই, যদিও মৃত্যুর যূপে
আমরা আজন্ম বলি।"

বলো এই কথা।'

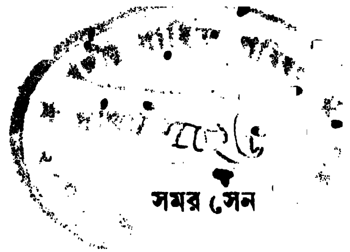
আকাশে ঘনালো সন্ধ্যা শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চারে।
একবার তাকালাম সুনন্দার পাণ্ডুর মুখের
দিকে, একবার সাঁওতালি পিঙ্গলরঙ্গী আঁকাবাঁকা
প্রান্তরের দিকে, যেখানে সন্ধ্যার সোনা দিগন্তের
নীলাভ পাহাড়ে জ্ব'লে গ'লে গেলো। তারপর আমি :
'সুনন্দা, তুমি কি ভাবো জীবনের পন্থা নির্বাচন
আমাদের হাতে ? জন্মাতে চাইনি, তবু জননীরে
দীর্ণ হ'তে হ'লো, জন্ম নিতে হ'লো। হ'তে হ'লো কবি—
সে কি আমার ইচ্ছায় ? তুচ্ছ হই, হই তৃণ, মাটি,
তবু তো অক্লান্ত এই ছন্দের বুনোন, আনন্দিত
পরিশ্রম, কথার কঠিন কারুকলা। আমি যেন
মূঢ় গ্রাম্য কারুকর্মী, পৃথিবীর শাসকশ্রেণীর
প্রভাব-প্রসাদ-মুক্ত, ঘর্মক্ষর উৎসাহে কাটাই

সারাদিন ; কত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ছায়া এসে পড়ে,
কত আলো চকিতে মিলায় , সেই সব পলাতক
আলো-ছায়া ফোটাই রূপের ছন্দে ; যৌবন ফুরায়,
জীবন নিঃশেষ হ'য়ে আসে, তবু ম্লান দিনান্তের
অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ছন্দ বুনি, কানে শুনি কোন্
অপরূপ ধ্বনি, যার সন্ধানের উদ্দীপনা দূর
করে মৎসর জরার গ্লানি। যেমন মাঠের শস্য
খনিজ ঐশ্বর্যরাশি সুবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না,
তেমনি আমারও কর্ম যে-অগাধ অজ্ঞতা-সঞ্জাত
সেখানে সুবুদ্ধি ব্যর্থ, ব্যর্থ সব পার্থিব বিদ্যার
চতুর কৌশল। যতবার নাগরিক প্রলোভনে
উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আরোহণে সচেষ্ট হয়েছি
ততবার, পরাজিত, ফিরেছি আপন মূঢ়তায়,
অজ্ঞান স্বধর্মে, জরা-জয়ী কারুকর্মে, ঘর্মক্ষর
কিন্তু ক্লান্তি-হর পরিশ্রমে। আমার জীবন এই।
ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছাও নেই এতে, আছে আবশ্যিক
অঙ্গীকার, মৃত্তিকায় প্রতিশ্রুত যেমন কৃষক।
মাঠে যারা ধান কাটে, পাটক্ষেতে কাটায় আষাঢ়,
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙে, তারাও জানে না
এই ধৈর্য, এ-নির্মম শ্রম, আমি যাতে ছন্দ বুনি।
আমার যে মুক্তি নেই, এ-ই মুক্তি ; যে-কর্মের চক্রে
আছি বাঁধা, আনন্দ তাতেই—এ যদি সৌভাগ্য হয়
এ-সৌভাগ্য জৈবধর্ম, মানুষ বঞ্চিত শুধু এতে
মানুষেরই লুব্ধ ধূর্ততায়। বসন্তে যেমন গাছ
ফোটায় নতুন পাতা, তেমনি কর্মের প্রেরণায়

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

মুক্তরে মানুষ, এই স্বত্ব এ-বিশ্বে ফিরায়ে আনো।
হাঁটুজলে মাঠে যারা কাটায় আষাঢ়, যারা নামে
খনির তিমিরে, কঙ্কাল রৌদ্রের দিনে রাজপথে
হাঁটু ভেঙে খাটে যারা, মৃত্তিকার, খনির, যন্ত্রের
ঐশ্বর্য তাদেরই। তাঁদেরই তা হোক্। আনন্দের উৎস
হোক্ সকলেরই স্বীয় শ্রম—কৃষকের, যন্ত্রীর, কবির।



কয়েকটি মৃত্যু

সমর সেন

(১)

তার মুখে সূর্যের কাঁচা সোনা,
মনে তার নতুন অরণ্যের স্বাদ,
তাই সবি ভালো লাগে।

প্রেমের ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া,
সরম নেই।
আর একটি গুণ,
ছেলেপিলে চায় না মোটেই।
পুন্নামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে
স্বচ্ছন্দে কেটে যায় দাম্পত্যজীবন।

অবশেষে ঠক্ঠকে বুড়ী হয়ে মারা গেল,
সংসার খালি ;
দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না,
সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায় :
সমাজ বদ্‌লেছে অনেক, নিরুপায়,
নইলে হে হরি,
এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী।

(২)

চলেছি সমুদ্রের পথে ;
বিস্তীর্ণ বালি, হলুদ বালি,

হাতে কাজ নেই, মন খালি,
শূন্যে মেঘের ফালি।

চায়ের দোকানে কতোদিন পয়সা খসিয়েছো,
কতো ধার নিয়েছো, শোধ দিতে গিয়েছো ভুলে,
কতো বই চুপিচুপি অক্লান্ত মেরেছো,
প্রায় শূন্য আলমারী।

আজ মৃত্যু সে সব কথা মনে আনে।
হলুদ বালির পথে।

(৩)

বৃষ্টিতে মাজা নীল শূন্য ;
জানি, করাল অভিশাপে
এ বসন্তের বাগান ভেসে যাবে রক্তস্রোতে ;
আমাদের এ টুক্‌রো প্রেম, কৃষ্ণচূড়া দিন,
এ বাসরঘর,
শ্মশান কুরুক্ষেত্রে শকুনের কোলাহলে
মোলায়েম বাঁশীর মতো।

এ কথা একদিন তুমি বলেছিলে।
তারপর তুমি চলে গেলে যমলোকে ;
মড়াপোড়া ধোঁয়ায় সারাদিন জ্বলেছে চোখ,
ফিরেছি শ্মশান ছেড়ে স্নান সেরে, দেখেছি,
পথেঘাটে স্বচ্ছন্দে চলে বর্বর জীবন,
অশোক, নির্লজ্জ ;
বৃষ্টির পরে নীল শূন্য ; রক্তঝরা কৃষ্ণচূড়া।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

তারপর চায়ের দোকানে বসে সহসা ভেবেছি :
আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি,
মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,
তুমি ছিলে তারই একজন,
এ অধমও তারি একজন।
সুতরাং শোক বৃথা ; মরে তুমি হয়ত বেঁচেছো,
আমরা বাঁচিনি,
আমাদের বসন্ত বাগান ভেসে যাবে রক্তস্রোতে,
আরো কতো বলোহরি হরিবোলে, দারুণ জোয়ারে।

কবিতা
আশ্বিন, ১৩৪৭

মুখোমুখি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনে রেখো তোমার পৃথিবীতে একদিন ছিলাম :
কি পেয়েছিলাম, কি দিলাম
সে হিসেব কখনো শেষ নয়।
ভয় হয়
আধবোজা চাঁদ কোনোদিন পূর্ণিমা
দেয় নি। নীল সীমা
দিয়ে চিরকাল আমাকে এঁকো।
তোমার পৃথিবীতে একদিন ছিলাম, মনে রেখো।

তোমার জান্‌লা দিয়ে,
ঝিল্‌মিলিয়ে
অনেক দূরের হাওয়া একদিন এসেছিলো।
হিসেব আছে তো : কে গিয়েছিলো, হেসেছিলো, ভালোবেসেছিলো ?
যতো কথা একদিন বলেছিলাম
তা ফিরিয়ে নিইনি, তোমায় দিইনি, ভাসিয়ে দিলাম
তোমার জান্‌লা দিয়ে
দূর সমুদ্রে, ঝিল্‌মিলিয়ে।

চেনা যায় না।
অনেক দিনের মানুষের ছায়া একই আয়না
মাজে না। চেনা-না-চেনা, বোঝা-না-বোঝা,
আধবোজা খাপছাড়া কথা সোজা
নয়।
ভয় হয়।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

তবু অনেক রাতে
ঘরেফেরা রিক্সাওলার হঠাৎ খুসিতে, ছাতে
টিং-টিং শুনি। তখন আকাশ ময়ূরকণ্ঠী চাঁদ। অতীতের
আধবোজা কথারা শীতের
ছায়ার মত। সরু, শীর্ণ, ক্লান্ত, পরাজিত।
হানাবাড়ীতে যেন ঘুরি। ভীত।
একে একে কঙ্কালের ভীড়।
চারদিকে সিরসির।

কি করে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াই ?
ঘণ্টা শুনি, রাত্তির আড়াই।
তোমার জানলার ছেলেমানুষ হাওয়ার কথা মনে পড়ে,
আমাদের সেই হঠাৎ খুসির ঝড়ে।
আজ চেনা যায় না
মরীচিকার মর্‌চে-ম্লান সময়ের আয়না।
তবুও মনে রেখো তোমার পৃথিবীতে একদিন ছিলাম :
কত পেয়েছিলাম, কত দিয়েছিলাম।

১৩৩৬-৩৮ স্মরণে

জীবনানন্দ দাশ

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন ক'রে যেতেছিল কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে ;—কোথাও বিদ্যুৎ নেই—তবুও আগুন যেন ধীরে
জ্ব'লেছিল এই হরিতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে ;
ভোর এল ;—তারুই পাখির মত কেউ তবু হয়নিক' আকাশে উড্ডীন।

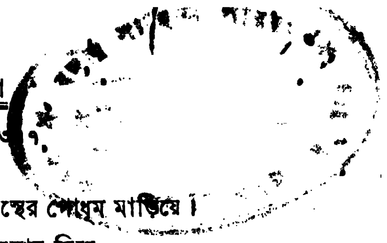
উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য্য শ্লোক খোঁজা হ'ল ভারতীয় মনীষার থেকে ;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সঙ্গীতের মত :
আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত ;—
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরুত্তর দর্পণকে দেখে।

তবু সেই অপার্থিব স্বর কেউ ভুলে যেতে পারে ?
দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাই নি যাহা মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিল সে দিন তা' জাঞ্জিবার সমুদ্রের অই পারে—কাম ;
তাহারে এড়াতে গিয়ে ক'রেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম ;—
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে।

এখানে হলুদ ঘাসে—কাঁকরের রাস্তায়—নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিল বৃশ্চিকের মতন কামড়ে।
এ পৃথিবী পাক যায়,—তবু কেউ কনুয়ের পরে রাখে ভর
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে ;—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মত ফিরে আসে ঘরে।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭



ঘরের হরিণ পারে অনায়াসে চ'লে যেতে গৃহস্থের পোধূম মাড়িয়ে।
সেই পথ থেকে তবু স'রে গিয়ে অন্য এক অহঙ্কার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী,—সমাহৃত হয়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিল ;—কার যেন স্থির মুষ্টি টের পাওয়া যায় :
যেন সব নাসপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

আজ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জ্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কি র'য়েছে এই সব নাম ছাড়া ?—সুনিপুণ ভাবনার ধারা
কে বুঝেছে সব নয় ?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায় ;—তাই ভেঙে ধ্বংসে গেল অমোঘ সমিতি ;—
অস্বীকার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?

আকাশ রেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে—
প্রকম্পিত কম্পাশের সূচীমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে ;—যদিও পাথরগুলো হয়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর ;—এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে প'ড়ে আছে নিস্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

আশ্বিন, ১৩৪৭

চীনে বুড়ো *

অমিয় চক্রবর্তী

মাটির বুকের কাছে থাকার ফল ?
বুড়োর মুখটা চাষকরা রৌদ্রপড়া শীতবসন্তের কুঞ্চিত মাঠ,
আসল যা জীবনের তারি ঘনতা ধরেচে ললাট ?
না, গাছপালার মতো সহজ, সহজাত সরল, এই ফল
উঠেচে বেড়ে, পেকেচে চুল, মুখের মহিমা
যেমন ধান, সবুজ শীষ, জলের প্রসন্ন ভঙ্গিমা ?
চীনে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ভাবি : গম্ভীর শাস্ত প্রাচীন
ছুপিয়ে দেওয়া চেহারা কালের না বহুকালের ?
ভদ্র সভ্যতার সকালের
রক্তে বয়ে-আসা আলোয় হঠাৎ এসেচে কোন্ দিন
এই চলন্ত ট্রেনে ? পোঁটলা বিছানা নিয়ে ভিড় উঠ্‌ল
রাস্তার ধারে ছোটো স্টেসনে থেমে ট্রেন ছুট্‌ল
দুপাশে চীনে পাহাড়, চীনে গাছ, অচেনা বাঁকা ছাত-
বাড়িতে আমার আবিষ্ট চোখ,
দৃশ্যে চারিয়ে গেছে সহযাত্রী চাষীর স্নিগ্ধতা—এই বৃদ্ধ লোক ॥

* অড্রে হ্যারিসের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে'।

কোথায় চলেছ পৃথিবী

অমিয় চক্রবর্তী

তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

সমস্ত সংসার
হাওয়া
উঠচে নীল ধূলোয় সবুজ অদ্ভুত ;

দিনের অগ্নিদূত,
আবার কালো চক্ষে বর্ষার নামে ধার।

কৈলাস মানস সরোবর
অচেনা কলকাতা সহর

হাঁটি ধারে ধারে
ফিরি মাটিতে মিলিয়ে।

গাছ বীজ হাড় স্বপ্ন আশ্চর্য্য জানা
এবং তোমার আহ্নিক অমোঘ অবেদন
আবর্ত্তন

নিয়ে
কোথায় চলেচ পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া॥

একটি প্রেমের কবিতা

বিষ্ণু দে

তারার দল উধাও নিজ বেগে।
পাহাড় ওড়ে নীল যেখানে সাদা।
লক্ষ হাতে প্রাণ ছড়ায় কাদা
এই পৃথিবী গতির ঢেউ লেগে।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে ;
নীলেই তার হাজারো হাতছানি।
শুশুক মাতে নীল সাগরে জানি—
প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে ?

হৃদয়, প্রিয়া, দিয়েছি দুই হাতে।
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী।
তোমাকে আমি মাত্রা বলে চিনি !
তোমাতে প্রাণ প্রাণের সমে মাতে।

চলেছি ছুটে দেশকালের নীলে,
বাইরে ঘর স্বার্থে ভয়ে মেশা,
আগুননাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা !
তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, প্রিয়া, থমকে নিজ বেগে ॥

জাতক

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

উন্মুক্ত আকাশে শুনি চমৎকৃত চিলের চীৎকার ;
দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ডেকে ওঠে শিকারী নকুল ;
গুপ্ত ছত্রকের ফুলে সমাচ্ছন্ন শোষিত বকুল ;
উদ্‌গ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার ॥

অপমৃত ভগবান ; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার ;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসার প্রতুল :
অতিদৈব বিবর্ত্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম্ম আত্মীয়সংহার ॥

অভিসার, অভিযান এ-আবহে নিতান্ত সমান :
স্বসমুখ বিসংবাদ : কুরুক্ষেত্রে অগত্যা সঙ্কেত ;
এখানে আর্ত্তের লোভ শিবাভুক্ত শবের আয়ুধে ॥

অর্দ্ধনারীশ্বর নয়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ :
মিথুন নিমিত্তমাত্র, কর্ম্মকর্ত্তা প্রতিযোগী প্রেত :
তুমি, আমি সর্ব্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে ॥

২

অথবা পিশাচ সূক্ষ্ম গৃধ্নু ইতিহাসের খাতক ;
এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্পস্বরূপ।
ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক ॥

আশ্বিন, ১৩৪৭

অর্থাৎ কৈবল্য স্বপ্ন : জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক ;
অনুবন্ধী শাস্তি-শান্তি ; একান্তর উল্কা ও খধূপ ;
নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গের মধুপ :
[illegible]আত্মারা পরকীয় দায়িত্বের সংক্রান্তিসাধক ॥

কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি
তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক :
প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত পুরস্কৃত গচ্ছিত ভূষণে ॥

সুতরাং নির্দ্বন্দ্বও নির্ব্বন্ধের বিপরীত রতি :
বরঞ্চ দ্বৈরথ ভালো, গুপ্তহত্যা শুধু সাংঘাতিক :
আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে ॥

আবর্ত্তন

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আয়ত চক্ষু অন্ধকার।
চিত্ত সঘন চমৎকার।
বায়ু বিক্ষোভে ছিন্ন ভিন্ন তারকাসূত্র নভে।
দূর বিহঙ্গ অঙ্গহীন
স্বপ্ন তাড়না রাত্রিদিন।
ভগ্ন বৃন্ত প্রাণোৎসারিত কোরকের কলরবে।
সময়ের ধারে ক্ষণগুলি
ক্ষয়ে যায়, কেটে যায়। তুলি
গুচ্ছ গুচ্ছ নিদ্রালু নীল অনুপম 'জাকারান্দা'।
মূর্চ্ছিত প্রায় অন্ধকার,
চিত্ত সঘন চমৎকার।
নীল আকাশের অঙ্গনে পাতা আত্মার এ বারান্দা॥

সহরে নেমেছি। বায়ু বিহার
সাঙ্গ হয়েছে। নভ কিনার
পটে আঁকা ক্ষীণ পক্ষের মত মিলায় ধূম্রালোকে।
অভিশাপ হানে, চক্ষুহীন
যারা পথে চলে রাত্রিদিন,
সুপ্ত যাদের দেহভোজী প্রাণ বস্তুর নির্ম্মোকে।
পদে পদে তাই উল্লাসের
প্রাণহীন বাধা,—সন্ত্রাসের
কবলে পড়েছে যেন কুরঙ্গী মৃগয়ার শিলিমুখে।
ব্যাহত চক্ষু, বন্ধ দ্বার।
চিত্তে ঘনায় অন্ধকার।
মৃত্যুর ছায়া বাদুড়ের মত পক্ষ মেলেছে বুকে॥

তিনটি কবিতা

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

থিসিস্

স্বপ্নে দেখেছি নগরের ভূমিকম্প।
প্রাসাদপ্রপাতে বাজে যেন জগঝম্প।
ছোট ছেলে যারা বেঁচে গিয়ে অভিশপ্ত,
ভাঙা ইঁট নিয়ে খেলায় হয়েছে রপ্ত।

প্রবাদ

যবে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে—
তোমার আমার নেইকো ভয়।
বুদ্ধি খাটাই সব প্রমাদে—
উলুখাগড়ার জীবন ক্ষয়।

একটি বাডিনেরি

যখনি হেসেছ তুমি উদ্বেলিত হৃদয় আমার;
হাসির ছোঁয়াচ লেগে স্নায়ুশিরা ধরে ঐকতান;
নিরুদ্ধ আবেগ যত খুলে যায় দেখেছে যে যার;
কখনো নেচেছি ক্ষিপ্র গ্যালিয়ার্ড কখনো পাভান।

রানাঘাটে

আবুল হোসেন

অবিরাম হুইসিল বাজে। ট্রেন আর ট্রেন ;
কোলাহলময় রাত্রি দিন। ট্রেন আসে, থামে, ছাড়ে। ছুটে যায়।
উড়ন্ত সময়। মেল, গুড্‌স্, শাট্‌ল্, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।
অবিশ্রান্ত গতি বাঁধা ইস্পাতের আগুনে চাকায়।

জানালায় বসে আছি। ট্রেন আসে দূর থেকে, বহু দূর থেকে।
চাপা একটানা মৃদুগান ভেসে আসে মনে। দূর-থেকে-শোনা
মলের বাজনার মতো। ট্রেন আসে আখ আর কাঠ দিয়ে। বেঁকে
রওনা হয় মাজদের পথে। এক, দুই, তিন, ষাট···সত্তোর। গোনা
শেষ হয় না তো খোকনের। ট্রেন শুধু ট্রেন।, সটসট
শব্দে ত্রাস ঢোকে প্লাটফর্ম্মে ; হাঁপায়, দম নেয় ; তারপর ছটফট
করে দৌড়তে। ট্রেন, শুধু ট্রেন।

ব্যস্ত দিন। অবিরত হুস হুস হু হু শব্দে আসে ট্রেন।
লাইন ধরে কুলি দাঁড়ায়। কিচিরমিচির সারাক্ষণ।
খাবার, চাই ভালো খাবার ; সাঁচি পান, তানসেন
ট্যাবলেট, চাই সিগারেট বিড়ি ; পাউরুটি ফিরপোর
গরম চা সোহ্‌রাবজীর তকমা-আঁটা খানসামার হাতে ট্রের ওপর।

ট্রেন আসে, থম্রকায়, ছুটে যায়। স্টেসনে আট্‌লান্টিক
সমুদ্রের ক্রুদ্ধ ঢেউ। গমগম করে প্লাটফর্ম্ম। কর্ম্মে ডোবা
দিন আর রাত। সজীব চঞ্চল দিন আর রাত। ধাবমান
সময়। ছোটে, ঘুরপাক খায়, আছড়ে পড়ে। টিক টিক টিক
ঘড়ি। বলে : ঠিক ঠিক ঠিক। ক্লান্তিহীন দিন অভিযোগহীন বোবা।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

ট্রেন ছুটেছে অবিরাম অবিশ্রান্ত। হু হু শব্দে মাটি টলে।
স্টেসন দৌড়য় ইস্পাতের চাকায়। স্টল, ঘড়ি, ব্রীজ ছুটেছে উর্দ্ধশ্বাসে।
ফুৎকারে উড়ছে দিন আর রাত্রি। চিরকেলে তীর্থযাত্রী।

ধারালো রোদ, ধাঁধানো আলো, ব্যস্ত আকাশে সময় নেই,
নেই নেই। সাদা মেঘ ছুটেছে আকাশে। চলে চলে চলে
মন, আমার মন, ক্লান্তিহীন অশেষ যাত্রায়
বেরুলো হৃদয় ট্রেনের চাকায়। কোনো আতঙ্ক কোনো উদ্বেগেই
দমে না নমে না। ঝড়ো হাওয়ার চাবুক মারা নিঃশ্বাসে
ছোটে দিন আর রাত, আমি আর আমার মন। কোথায়?
সে কথা জানি না, জানতে চাই না, জানব না; তবু

ছুটেছে পৃথিবী কতকাল কতকাল। বাসে, ট্রামে ট্রেনে,
পার্কে, সিনেমার পর্দায়, রেস্তোঁরায় কলহাস্যে গানে
চলেছি অদম্য শ্রান্তিহীন ইস্পাতের চাকায় সময়ের ধাক্কায়।

কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবী। শ্রান্তিহীন দিন। চোখে তার ঘুম নেই,
ঘুম নেই, নেই। ট্রেনগুলো শুধু ছোটে।
চলেছে চলেছে চলেছে

কালবৈশাখী

মণীন্দ্র রায়

(শেলির উদ্দেশ্যে)

মাটির সুষমা ছিল হৃদয়ে আমার :
এখন শ্মশান। স্থির শ্বাপদের চোখ লক্ষ কোটরে কী অনির্ব্বাণ !
তপ্ত অন্ধকার।
সৃষ্টির গর্ভেতে যেন হানে হাহাকার ॥

কালবৈশাখীর
স্তব। আমার শ্মশানভস্ম নরকরোটীর
হবে উদ্বোধন
এখানে এখন। স্থির
শ্বাপদের চোখে যেন বৃষ্টি ঝরে—কলরব—জীবনের স্তব—
বৃষ্টি
শ্মশানশিখার।
সৃষ্টি
হে পবন, জীমূতবাহন !
কর উদ্বোধন বৃষ্টির ধারায় ॥

ধূলিধূম্র চৈত্রমাঠজগৎ তোমার
শস্যহীন। প্রেতনৃত্য দিগন্তকম্পন।—
পিঙ্গল লেলিহজিহ্ব রৌদ্র শুষে নেয় মাটির নির্য্যাস।
তবু, তবু হে পবন!
আমারো সে : আমিও তো তোমারি সন্তান!

আমারো শ্মশান। নাই, নাই অবকাশ,
মাটির সুষমা—শস্য—হৃদয়ে আমার।
রিক্ত, মরুখিন্ন, যেন অস্থিহীন—মৃত।
সন্তান—শ্মশান—তবু আমি তোমারি তো!

তোমারি তো।
কোটি কোটি আরো যারা উদয়াস্ত এ সৌরগোলকে ম্লান
শুষ্ক আবর্ত্তিত।
তব পক্ষবিধূনন ছিল ছিল তাহাদেরো গান।
([illegible] ছায়াপিণ্ড প্রেত নয়, অমৃতের পুত্র ভালে লিখা
একদিন ছিল উহাদের, আজ অস্থিহীন—মৃত) !
তোমারি তো সেই সব নির্ব্বাপিত শিখা
জ্যোতিষ্কসন্তান ॥

হে কালবৈশাখী!
তবে আর কত বাকী? কত
কুরুবর্ষ অকর্ষিত বালুকা-প্রস্তর-গুল্ম এইসব হৃদয় শ্মশান!
জাগে শ্বাপদের নেত্রবহ্নি মদান্ধ উদ্ধত।
নাই
চিন্তা, বীর্য্য, আশা, দৃষ্টি, আদর্শ! বৃথাই
কাটে দিন অস্থিহীন ক্ষুদ্র গণ্ডী আঁকি।
ধূলির প্রচ্ছায়ে অন্ধ কীটের মতন।—
হে কালবৈশাখী!
আর কত, আর কত বাকী!

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭।

প্রভঞ্জন,

ভুবর্লোক বিধুনন মেঘপক্ষে হানো তবে বায়ব প্রহার :

দীপ্ত, বৈদ্যুতিক ;—যাক তপ্ত অন্ধকার

আমাদের বুদ্ধি, বীর্য্য, মাতৃকুক্ষি হ'তে। হে পবন!

পরজীবী শ্বাপদের প্রাসাদপ্রাকার

হোক উদ্ঘাটিত।

সৃষ্টির গর্ভেতে কর পুনঃ অঙ্কুরিত

মাটির সুষমা, শস্য বৃষ্টির ছটায়।

জীবনের—সমতার—স্তব যেন জেগে ওঠে শ্মশানশিখায়।—

হে কালবৈশাখী!

কত বাকী?

আশ্বিন, ১৩৪৭

কোনো বন্ধুর প্রতি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

স্পিডোমিটারেতে চল্লিশ থরোথরো
ক্ষুধার্ত ঠোঁট চঞ্চল আজো হোল,
হাতে এসে পড়ে নিবিড় হাতের মুঠো
নির্জন পথে চল্লিশ থরোথরো।

সামনে সোফার, সজ্ঞান হুঁসিয়ার
গালে উড়ে পড়ে ধুলোটে ধূসর চুল
হাতে আজ ওর নিবিড় হাতের মুঠো
—তাই কি তোমায় ভুলেছি আজকে ভাবো ?

অধীর অধর কপোলে পড়েছে ঝুঁকে
ক্ষুধার্ত ঠোঁট, স্তব্ধ পিচের পথ
—হয়ত বা তুমি উজ্জ্বল কোনো ঘরে
গ্রীক নাটকের পাতা ওলটাও বসে।

হয়ত তোমার পাশের চেয়ারে আছে
গাঢ় ভাবে বসে পরিচিত দেহ কোনো
(তব পরিচিত মোর পরিচিত নয়)
আমার শুধুই অন্ধ গতির নেশা—

তাই কি তোমায় ভুলেছি আজকে বলো ?
—চঞ্চল হাত, উষ্ণ নিবিড় বুক—

আশ্বিন, ১৩৪৭

তোমার স্মৃতি কি ব্যর্থ উর্ণাজাল ?
তোমার স্মৃতি কি অন্ধ সাপের মত ?

স্পিডোমিটারেতে চল্লিশ থরোথরো
(অনেক দূরের নির্জন কোনো ঘরে
গ্রীকনাটকের পাতা ওল্টাও যবে
মোর পথে শুধু অন্ধ গতির নেশা
হাতে আছে তবু নিবিড় উষ্ণ হাত
উড়ে পড়ে চোখে ধুলোটে ধূসর চুল)
তোমার স্মৃতি কি ব্যর্থ উর্ণাজাল ?
তোমার স্মৃতি কি অন্ধ সাপের মত ?

কাল রাতে, ওগো, জান না ত কাল রাতে
জান্‌লার পরে এসেছিল বারিধারা
এসেছিল সেই পুরোনো শ্রাবণ মেঘ
উষ্ণ বক্ষ এসেছিল মোর বুকে।
সমস্ত রাত আমার হাতের মাঝে
ঘুমে আর প্রেমে ছিল ওর দেহখানি
—কাল রাতে ওগো জান না ত' কাল রাতে
এসেছিল সেই পুরোনো শ্রাবণ মেঘ।

তবুও তোমার স্মৃতির ছায়ারা, জান না কাল,
মোর ঠোঁট আর ওর ঠোঁট মাঝে পড়ল ঝুঁকে,
তোমার ছায়াই, তোমার ছায়াই, জান না তুমি,
আজকের এই নির্জন পথে সঙ্গে চলে।

পুরোনো কামনা শ্রান্তি ডেকেছে শরীরে মনে,
(ভুলেছি যদিও অনেক কথাই, তোমার কথা)
আজকের এই নির্জন পথে অন্ধ বেগে ;
পুরোনো কামনা শ্রান্তি বুনেছে শরীর-মনে।

—যদিও আমার হাতে আছে ওর হাত
যদিও চোখেতে চুল ওর উড়ে পড়ে
নির্জন পথে উষ্ণ নিবিড় আলিঙ্গনে
যদিও রয়েছে চঞ্চল বুক তার—

তবুও সোফার, থামাও তোমার অন্ধ বেগ—
—শ্রান্তি ঘনায় আমার অধীর শরীর মনে ;
পুরোনো কামনা কুৎসিত রোগ সঙ্গে আনে
পুরোনো কামনা, (টুক্‌রো কথারা), অস্ত্র সম।
হয়ত বা তুমি বাতায়নে বসে অন্যমনে
গ্রীক নাটকের পাতা ওলটাও হালকা হাতে।

দুঃস্বপ্ন

অমিতাভ ঘোষ

মায়াবিনী রাত্রি এল :
চাপাকান্না পেচকের ডাক
অস্ফুট গোঙানি শব্দ
একরাশি অট্টহাসি আকাশে-বিলীয়মান
আকাশ নির্ব্বাক।
রুগ্ন চাঁদ কুয়াশা মলিন,
ফাল্গুনী বাতাসে কাঁপে বিশাল বিবর্ণ জলভূমি
দক্ষিণের তেপান্তরে।
শরবন বিষাদ মগন,
ক্ষণিক আলেয়া দীপ্তি নীলাভ উজ্জ্বল
গাঢ় করে অন্ধকার।
গলিত বিকৃত শিশুশব
শৃগালের মহাভোজ্য,
উল্কামুখী বুনোপাখি চেঁচায় সহসা,
শরীরী আতঙ্ক জাগে—
ভয়ে অনুরাগে
সবলে আঁকড়ি ধরে নায়কের দেহ
উত্তেজিতা নায়িকার বাহু,
ঘুমন্তের ঘুমভাঙা মুখে
রোমাঞ্চিত কাঁপে শয্যা ;
লোকলজ্জা মুমূর্ষু পল্লীতে।
নিভে গেছে প্রদীপের পীত-পাণ্ডুশিখা,
শিখায়িত শীতল শরীর

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

বহ্নি জ্বলে জঘনে কটিতে
ভস্মসাৎ মদনের চিতা।
বিদ্রোহী ফাল্গুন
নিঃশেষিত তূণ
মুহুর্মুহু শায়ক টঙ্কারে—
ঘর্ম্মাক্ত অবশ অঙ্গ, সুষুপ্ত শীৎকার।
চৌকিদার হাঁকে
বাতাসে মুখর বাঁশবন।

চাপাকান্না থেমে যায়,
অস্ফুট গোঙানি শব্দ
নিশাচরী প্রেমিকার ভাষা
আকাশে বিলীয়মান,
প্রতিধ্বনি বিবর্ণ জলায়,
উল্কামুখী বুনোপাখি ঝাপটিয়া ডানা
উড়ে যায় অন্ধকারে।
রুক্ষ চুল শিথিলবসনা
জন্ম দেয় মৃত শিশু, অনন্ত-যৌবনা তমস্বিনী-
সুপ্তির অরণ্যতলে
স্বপ্নাকার অপুষ্ট অলীক ?

স্তিমিত চাঁদের আলো
নিষ্কলুষ শিশির কণিকা
সৌরভ-বিহীনা চন্দ্র-মল্লিকার বুকে—
জাগে সারারাত।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

শরবন বিষাদ মগন
কামনার আলেয়া আলোয়
নামে রাত্রি, গাঢ় ঘুম, নিশ্চেতন, নীরব, নিথর !

... ...

সুষুপ্তি কালে সকলেবিলীনে
তমোঽভিভূত সুখরূপমেতি— ।

মৈনাক, সৈনিক হও

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

অজিত দত্ত

সৈনিক, tunic কোথা ? যুদ্ধোদ্যত কোথা বেয়োনেট ?
অধুনা শরণাপন্ন অন্তঃপুরে অঞ্চলের নিচে ?
রাইফেল কি ফেল বন্ধু ? ধার কোথা উগ্র সে কিরিচে ?
বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ ? আমাদেরো মাথা হেঁট।
মৈনাক যে ছিলো স্তব্ধ-জরদ্গব, পাথরে নিরেট
তারে যে হেনেছে কশা তীক্ষ্ণবাক্যে, সে কি সব মিছে ?
স্পষ্ট সত্য বলি শোনো—শৃঙ্খলার গুরুতর breachএ,
অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ সংগ্রামের নহে এটিকেট।

যখন আছিলো শুধু দীর্ঘদিন, নিরন্ন প্রহর,
অরণ্য যখন ছিলো স্বপ্নে মগ্ন, অন্ধ, অচেতন—
মৈনাকেরে সেইদিন চেয়েছিল বানাতে সৈনিক।
আজ পরিহাসলোভী পঞ্চশর প্রতিশোধ নিক্ ;
অরণ্য উঠেছে জেগে, শোনো তার মদির গুঞ্জন,
সৈনিক, মৈনাকবৎ এইবার বন্ধ করো ঘর।

চলচ্চিত্র

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রুল ব্রিটানিয়া

পার্কে দোঁহে বসেছিলাম ঘাসে
খাঁচার পাখী ছিল কাছেই বাঁধা।
নাৎসি রথ হঠাৎ দিল হানা
অগ্নিবাণ ছড়ালো চারপাশে ;
বীর হৃদয়। লাগলো তবু ধাঁধা।

প্রভু, সবই তো লীলা তোমার। তাই
আকাশে বুঝি এমন রোশনাই !

নগররক্ষা

দেশরক্ষায় অধুনা মত্ত মন,
ভাঁজি বেপরোয়া হাওয়ায় ভারী মুগুর।
শত্রু কখন আসবে, হে জনগণ,
ভেবে ভেবে ঘুম করছি না-মঞ্জুর।

নাম রটে গেছে নিধিরাম সর্দার—
বাজারে চলতি দেশসেবার এ হাল।
স্বয়ং পুলিশ কর্তা, কেয়ার কার ?
সময় আস্‌লে মিলে যাবে তরোয়াল।

কতকাল বলো অলীক আশায় মাতি
(সেই সূত্রেই ছেড়েছি চরকা, খাদি)

আশ্বিন, ১৩৪৭

নগররক্ষা পাছে হয় স্রেফ মাটি
ঝাড়ুদারদের লড়াইতে বাদ সাধি।

ইতিমধ্যেই মিলেছে কিন্তু লাঠি ॥

র‍্যাডিক্যাল

চীনের ভাগ্য শিকেয় তুলেছি। এবার
দক্ষিণা নিতে হবেই ভারতসেবার।
ইতিহাস ডাহা ভুলেছি, করছি প্রচার—
ফ্যাসিবাদবধে লেগেছো, ধর্মাবতার!
যদিচ গান্ধীবিরোধী, হে মধুসূদন,
হঠকারিতায় অভিন্ন আজ দুজন।
দলে দলে রোজ শিষ্য হচ্ছে বেহাত,
'সাধু সোভিয়েট' হাঁকতেই হয় নেহাৎ।
আগে বিপ্লব বুদ্ধির। লাল নিশান
বৃথাই ওড়ায় মূর্খ মজুর, কিষাণ।

এ অধীন আছে; ভাবনা কী, প্রভু, মাভৈঃ!
গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিছু পল্টন পাবই।
সবুরে স্বরূপ খুলবে, দিচ্ছি আভাষ—
খয়েরখাঁদের পাড়ায় শুনছি: সাবাস!

গ্রীনরুম

বিয়োগান্তক নাট্য। বিদায় সর্দার!
অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার।
দেশভক্তি আমাদের সওদাগরী চাল;
(সর্বত্র সশস্ত্র কিন্তু দলবদ্ধ লাল!)

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

ভারতবর্ষে ফুর্তি নেই। বাকি সব দেশে—
প্রজারাই মরে। বেনে ব্যাঙ্ক ভরে ঠেসে।
কেবল অভাগ্য আমরা। লড়াই পালিয়ে
দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।

প্রতীক্ষা বিফল। জানি, যা হবে হবার ;
এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার।
বাহবা! যথার্থ স্বচ্ছ তোমার প্রস্তাব—
ততক্ষণ প্রভুদের দেখি হাবভাব।

পুনশ্চ প্রার্থনা এই রাখি। অতঃপর—
আমার অহিংস ছাগে দিয়ো না নজর॥

পরিচয়

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কতো জাহাজ এলো-গেলো
তল পেলো না হায়
কারাগারে বন্দী হৃদয়
শীতল জনতায়!

বিশাল জলে বিলাস-প্রাসাদ স্পর্দ্ধিত রূপ তার
অন্তরঙ্গ স্পর্শবিধুর। নাগরদোলায় নয়
আলোকের স্ফূর্ত্তিস্রোতে প্রাণের পরিচয়
স্পন্দনশীল নির্ম্মমতার গহন পারাবার।

বুঝবো তোমায় হে সমুদ্র
সমান্তরাল পথে
ক্ষুদ্র নৌকা হ'তে,
যেমন ক'রে দেখে ভীরু জীবনলীলা রুদ্র।

কুটিল ঢেউয়ের মাঝে—
ধূসর-কালো-নীল চাঁদোয়ার তলে
তোমার সাথে রাত্রিদিন দৃষ্টিবিনিময়।
জটিল স্রোত ঘূর্ণি হাওয়া বয়
মুক্ত ঝড়; নিগূঢ় ঘুম
পলকে দেয় প্রলয়-চুম্
নিবিড় অনুষঙ্গ প্রতিপলে—
কোলের কাছে প্রকট রূপ নিত্য নব সাজে।

স্বর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অন্ধকারে যেন কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কা'র স্বর!
পাষাণে অশ্বত্থ-শাখা, হৃদয় পাথর
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
এই ঘরে অনেকেরই দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া
এ ঘর নিথর ;
অকস্মাৎ সেই কণ্ঠস্বর।

'কী ভাবচো : ভাবনার শেষ আছে নাকি!'
চুপচাপ : টিক-টিক ঘড়ির আওয়াজ
এ ঘরে গুমোট
তাস খেলে কাজ নেই আজ।
'ঐন্দ্রিলার কী খবর : সে চিঠির এসেছে উত্তর ?'
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা!
'নটুবাবু ইহলোকে নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

ছোট-ছোট কথা : ফিসফাস : চুড়ীর আওয়াজ।
'বাহিরে যে অন্ধকার! তোমার টর্চ্চটা কোথায় ?'
আকাশে যেদিকে চাও : শুধু দেখা যায়
অন্ধকার, আসন্ন মেঘের ঘটা, তাস খেলে কাজ নেই আজ।

আশ্বিন, ১৩৪৭

কামনা-পীড়িত চোখ, ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি।
আরো কাছে ঘেঁসে বসে মেদনম্র মেয়েটির কাছে ;
বলে হেসে : 'যাবে সিনেমায় ?'
সূর্য্য ঢলে অস্তাচলে অন্ধকার নামে চরাচরে
আজ তো সপ্তাহ শেষ, আজ শনিবার !
স্নায়ুকোষে সারাক্ষণ তীব্র তৃষা আনাগোনা করে,
শিকারীর নেশা যেন নয়নে আবার।

এ ঘরে গুমোট
এ ঘরে অনেক দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া :
অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
এ জীবনে স্বপ্ন নেই ব্যর্থ এই পৃথিবীর মায়া।
'নটুবাবু ইহলোকে নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

চুপচাপ : টিকটিক ঘড়ির আওয়াজ।
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।

'কালকে মিস শান্তি বোস—সে খবর রাখো ?'
বলে' দিই ; 'এ ঘটনা তারি কিন্তু জের !'
ওরা কি জানে না
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা !
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী,

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

তমালতালীবনরাজিনীলা···
'কী ভাবচো : ভাবনার শেষ আছে নাকি!'
বলিল সে : 'যাবে নাকি ওইখানে এখন বাগানে ?
দ্যাখো চেয়ে তোমার সন্ধানে
রাতের তুহিন বায়ু দ্বারে এসে করাঘাত হানে!
হয়তো মাধবী রাত হ'য়েছে উতলা,
সার্থক হ'য়েছে পথে অন্ধ, পথভোলা;
যেন কা'র প্রতীক্ষায় প্রাঙ্গণের হিম বনতল
ঈষৎ চঞ্চল ;—
যাবে ওইখানে ?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর, এ ঘর নিথর।
ধীরে ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর।

'তুমি না কুকুর পোষ : কী কুকুর, স্পেনিয়েল ?'
'রমা সেন ভাগ্যবতী, এ বছরে আই-সি-এস্ হ'লো চারু রায়!'
'সে কেসটার কিছু জানো : বর্মণের ক'দিনের জেল ?'
'হাড়ছড়াটি কতো হ'লো ? দু'শো দশ ? দ্যাখো ডলি এদিকে তাকায়!'

এই ঘরে অনেকেরই প্রেতদীর্ঘ ছায়া,
এ ঘর নিথর :
অন্ধকারে তবু কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কা'র স্বর!
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।

'জানো কাল মহিমের বিয়ে ?'
'তাই বটে! কী ক'রে যে লটারী টিকিটে
সে-ও হ'লো বড়োলোক বিধাতাকে স্রেফ ফাঁকী দিয়ে!'

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

মহিম জানে না

তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকী !

'আজকের কাগজে লিখেছে
প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী ত্রিলোচন দাস
মারা গেছে বজবজে ।'
অন্ধকারে এলোমেলো কণ্ঠস্বর কা'র
এ ঘরে গুমোট :
তাস খেলে কাজ নেই আর ।

চুপচাপ : টিক্‌টিক্ ঘড়ির আওয়াজ ।
সেই ভাঙা থলথলে স্বর :
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর ।

'ও শব্দ কিসের ?'
'বাতাসের ।'
'বাতাসের শব্দ বুঝি এতো ভারী হয় !'
'নিশ্চয় !'
'বেঁচে আছো, অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো মৃত, ভারী ?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর, এ ঘর নিথর ।
ধীরে-ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর ॥

নতুন কবিতা

সানাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। ১০৬ পাতা। দাম ১৷৷০

রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই আষাঢ়ে তাঁর নতুন কবিতার বই 'সানাই' বেরুলো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবার একটি নতুন কবিতার বই হাতে পাবো এ রকম আশাই করতে পারিনি। এ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে উৎস তা এখনো সমান সরস রয়েছে, বয়েসের অঙ্ক তাঁর স্রষ্টা মনে একটুও রেখাপাত করতে পারেনি।

'নবজাতকে'র চেয়ে 'সানাই'তে অনেক বেশী কবিতা আছে এবং এই কবিতাগুলি অন্য জাতের। প্রথমোক্ত বইএর অনেক পাতায় বলাকার ডানার ছায়া পড়েছিল, এখানে তা অদৃশ্য। সানাইতে এমন অনেক লাইন আর উপমাপ্রয়োগ চোখ পড়ে যার সাক্ষাৎ এর আগের রবীন্দ্রকাব্যেও পাওয়া যায় নি। যেমন :

আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে
(শেষ অভিসার, পৃ : ৮৩)

ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্বিগ্ন ডানার পরে।
যেন কোন্ ভেঙে-পড়া লোকান্তরে
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতায় শূন্যতল জুড়ে।
(শেষ অভিসার, ৮৪)

গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৭

ঝরা শিরীষের পেলব আভাস
ওর কাকলীতে মাথা। (অধরা, ৬৮)

নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক।
(স্মৃতির ভূমিকা, ২৯)

এই ধরণের আরো অনেক আশ্চর্য্য সুন্দর উদ্ধৃতি অতি সহজেই দেওয়া যায়। আশা করি পাঠক নিজেই তা আবিষ্কার করবেন।

'সানাই'এর বিশেষত্ব এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কবিতার সমাবেশ। এখানে আছে বিচিত্র ছবির মিছিল, প্রতিটি ছবিই কবির অনুভূতিতে উজ্জ্বল। অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিও তাঁর অতি সচেতন দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতে পারেনি :

হাটের দিনে শাক তুলে যাও ক্ষেতে
চুবড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।
(মুক্তপথে, ৫১)

দেয়ালের লেখা, "পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ চায়ের ভোজের অলস ক্ষণের হিজি-বিজি কাটা", কাঁঠালের ভুতি পচা, আমানি, মাছের আঁশ, মরা বিড়ালের দেহ—জীবনের এই সমস্ত সঙ্গতি ও অসঙ্গতির মাঝে "সানাই লাগায় তার সারঙের তান।"

"জানালায়", "সানাই", "স্মৃতির ভূমিকা", "দেওয়া নেওয়া" "অধীরা" "বাসা বদল", "মুক্তপথে", "অনসূয়া", "নামকরণ", "অপঘাত", ইত্যাদি অনেক কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগলো। এই কবিতাগুলির মধ্যে "অনসূয়া" কবিতাটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মতামত জানা যায় :

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক।

পরিশেষে "অপঘাত" কবিতাটি সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। কবিতার শেষ দুটি পংক্তির নাটকীয়ত্ব অতি চমৎকার। কিন্তু বর্তমান সময়ে এতরকমের নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে যে ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েট বোমাবর্ষণের চেয়ে অপঘাতের ভালো উদাহরণ কবি নিশ্চয়ই মনে করতে পারতেন ?

কামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বরবিতান (৪র্থ খণ্ড), ধর্মসংগীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি কালীচরণ সেন, সম্পাদনা : শৈলজারঞ্জন মজুমদার। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অদ্বিতীয় গীতকার। কোনো একজন কবি এত গান ও এত ভালো গান রচনা করেছেন, কোনো ভাষায়, কোনো সময়েই এ-রকম উদাহরণ আর পাওয়া যায় না। সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভার পরিচয় এতেই পাওয়া যায় যে তাঁর হাতে ধর্মসংগীত পর্যন্ত শিল্প-রূপের সরস উজ্জ্বলতা পেয়েছে। এই গানগুলির বেশির ভাগই গান হিসেবে শুধু নয়, কবিতা হিসেবেও উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য; এবং এদের অনেক চরণই এতদিনে বাঙালির মানসজীবনে গ্রথিত হ'য়ে গেছে।

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার এ দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।

ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়,
সে বাতাসে তরী ভাসাব না যাহা তোমা পানে নাহি বয়।
দিন যায় ওগো দিন যায় দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশ দিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয়॥

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর পাথারে হোস্‌নে দিশেহারা॥...

আশ্বিন, ১৩৪৭

রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালবাসা।

এ-সব স্তবকের অনিন্দ্য মাধুর্য বহু বছরের পরিচয়েও ম্লান হয়নি; এবং এদের সঙ্গীতযোগ্য ঋজুতা ও সরলতার সঙ্গে ভাবের গভীরতা এবং মিল ও ছন্দের কাব্য-কৌশল যে-ভাবে মেশানো হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের অনুপম কীর্তি। যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা করেন তাঁদের পক্ষে, বিশেষ ক'রে, 'স্বরবিতান' অপরিহার্য, কারণ 'স্বরবিতানে' প্রতিটি গানের সম্পূর্ণ স্বরলিপি, স্বরলিপি-পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন মতো তাল সম্বন্ধে সম্পাদকীয় টীকা আছে।

বুদ্ধদেব বসু

সাথী : হুমায়ুন কবির :—ডি এম্ লাইব্রেরি, ১৷৷৹

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে সবিনয়ে স্বীকার করাই সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আধুনিক কবির পক্ষে সংবুদ্ধির লক্ষণ। এবং এ বুদ্ধির অভাবে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যে অরাজকতা আজকাল চলেছে তাতে বাজারের অপবাদটা গ্রহণ করতে হয়েছে আধুনিক কবিতাকেই। দুর্লভ প্রতিভার কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু শ্রীযুক্ত কবিরকে দুর্লভ প্রতিভাশালী কবি বললে এ নির্লজ্জ চাটুকারিতায় তিনি নিজেই শিউরে উঠবেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া তিনি হাজার কাছের মানুষ; হয়ত মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং সিভিল্‌সার্ভিসের পড়া পড়িয়ে এ্যাসেম্লি যাবার পথে তিনি একটু বা সময় পান কবিতায় মন দেবার। কবিতায় নতুন আঙ্গিক আনতে হলে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন, দুর্লভ প্রতিভাশালীর পক্ষেও প্রয়োজন। ফলে, শ্রীযুক্ত কবির যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে নিজেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করেননি তা অত্যন্ত সুখের। তা ছাড়া তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ নয়, রবীন্দ্র-প্রভাবে স্বপ্রতিভার সুস্থ বিকাশ। তাই অনেক সময় "সাথী" পড়তে পড়তে

আশ্বিন, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের অতিপরিচিত কোনো কোনো কবিতা মনে পড়ে, তবু "সাথী'র মূল্যহানি হয় না তাতে।

মোটামুটি এই ঐতিহ্য বজায় রেখে লেখায় শ্রীযুক্ত কবিরের কবিতায় আগাগোড়া একটা সবল মেরুদণ্ডের নির্ভর থেকে গেছে। সমস্ত বইটি পড়তে-পড়তে কোথাও খুব খাপছাড়া মনে হয় না, এবং তাঁর একটা স্বতন্ত্র সুর সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

তবুও তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি নেই; হালের বাংলা কবিতায় তা থাকা সম্ভবও নয়। ভাবের দিক থেকে "সাথী"কে আশাভঙ্গের কবিতাই বলতে হয়—

"আজি মোর মনে পড়ে একদিন ভেবেছিনু মনে
রচিব এ ধরণীতে আপনার লাগি সযতনে
নিরালা বিরামকুঞ্জ।...
... ...
আজি আর সেই স্বপ্ন নাহি মম নয়নের আগে।
... ...
...আজি যবে দেখি আঁখি মেলি
তরঙ্গিত সিন্ধুসম এ জীবন উঠিছে উদ্বেলি
সংগ্রামের আবাহনে। নাহি সেথা স্নেহ প্রীতিমায়া...
(সাথী)

এ আশাভঙ্গ আজকের মধ্যবিত্ত জীবনের সরল প্রতিচ্ছবি। কথাটা অবশ্য পুরোনো। তবুও শ্রীযুক্ত কবিরের কবিতা আলোচনায় এ কথা বলার সার্থকতা এই যে বয়সে প্রাচীন না হলেও তাঁর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যথেষ্ট। তিনি চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ ব'লেই রবীন্দ্রপ্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কাব্যে সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে আস্‌তে পারেন নি।

তাই বলে এ কথা বলা নিশ্চই অসঙ্গত যে "সাথী" শুধুই আশাভঙ্গের কাহিনী। "কুণ্ঠিতা", "ভিক্ষা", "গোপন" ইত্যাদি কবিতা এ কথার বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দেবে, কারণ এগুলি প্রেমের কবিতা। তবুও, এ ধরণের কবিতার মধ্যেও একটা অদ্ভুত হতাশা কোনোক্রমেই চাপা পড়ে নি—

......"যে অতৃপ্তি, যে অশান্তি প্রতিপদে শৃঙ্খলের মত
চরণে বাজিতে থাকে, দেয় আসি বাধা সব কাজে
আপনার অন্তরের প্রকাশেরে করে প্রতিহত
সেই বাধা সেই বন্ধ রহিয়াছে তোমারো জীবনে।
তোমারো সকল ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে ফিরে শুধু আসে।"
(নরনারী।)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু: সমর সেন; ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয় —কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

আধুনিক বাংলা কবিতা

(১)

শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুব ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এঁদের যৌথ সম্পাদনায় এ সংগ্রহ গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। • প্রকাশক : কবিতা ভবন দাম ২৲ টাকা।

পত্রাবরণের পুঁথি পরিচয়ে জানা যায়, "'আধুনিক বাংলা কবিতা' ৩৫ জন কবির রচিত ১০৯টি কবিতার সংগ্রহ। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৮, এই কুড়ি বছর এর সময়, এবং স্থানে যতদূর কুলিয়েছে, এই সময়কার সব চেয়ে সার্থক কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।" দ্বিতীয় বাক্যটির পদ-বিন্যাস একটু গোলমেলে, এবং কাল-পরিমাণের আদি ও শেষ দুটি বছর ধরলে হয় একুশ, দুই-ই ছাড়লে হয় উনিশ; সম্ভব ইঙ্গ-ভারতীয় আইনের সময় মাপের কায়দায় প্রথম বছরটা ছাড়তে হবে। আর পুঁথির শেষ কবিতাটির পাশে সংখ্যা দেওয়া আছে ১০৯ নয়, ১০৮। যাক, এ সব তুচ্ছ কথা। মোটামুটি বেশ বোঝা যায় গত বছর কুড়ির মধ্যে বাঙ্গালী কবিরা যে সব কবিতা রচনা করেছেন তা থেকে বাছাই করা একশর কিছু বেশি কবিতা নিয়ে এই সংগ্রহগ্রন্থ। এতে রবীন্দ্রনাথের ৪টি গান নিয়ে মোট ১২টি কবিতা আছে। অর্থাৎ এই দুই দশকের মধ্যে ৩৫জন বাঙ্গালী কবি প্রায় একশ "সার্থক" কবিতা রচনা করেছেন! কেবল তাই নয়; এ সময়ের আরও কিছু "সার্থক" কবিতা স্থানাভাবে পুঁথির ১৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে স্থান পায় নি, সঙ্কলিত কবিতাগুলির সঙ্গে সমান "সার্থক" নয় ব'লে। বাঙ্গালীর গর্ব্বের কথা। কোন সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়ে এমনটা ঘটেছে।

কিন্তু "সার্থক" কথাটার অর্থ নিয়ে খট্‌কা লাগে। এই দুই দশকের মধ্যেই "পূরবী" ও "মহুয়া" প্রকাশ হয়েছে। তার কোনও চিহ্ন এ সংগ্রহে নেই। "যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" (১৯২৩), কি "আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে" (১৯২৮) সম্পাদকদের মতে এ সংগ্রহের ১০৯টি কবিতার কোনওটির তুল্য "সার্থক" কবিতা নয়।

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

শ্রীজীবনানন্দ দাশের

"স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।" (৩৩)

কি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের

"আজ বিকালে হঠাৎ দুপেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল
যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।" (২৬)

এর চেয়ে "সার্থক" কবিতা! প্রথমে আশ্চর্য লাগে কাব্য-বোধের "রেটিনা"য় এ রকম "ব্লাইণ্ড স্পট" কি করে জন্মে। দ্বিতীয় সম্পাদকের ভূমিকায় অনেকটা উত্তর মেলে। তিনি জানিয়েছেন, "কয়েকজন খ্যাতনামা কবিকে আমরা বাদ দিয়েছি, তাঁদের লেখায় আধুনিক ভাব বা ভঙ্গির সন্ধান পাই নি বলে।" নিশ্চয় এই কারণে কবিকে বাদ না দিলেও তার অনেক কবিতাকে বাদ দিতে হয়েছে। কবিতা হিসেবে "সার্থক" নয় বলে নয়, ভাব বা ভঙ্গীর 'আধুনিকত্বের' (তার অর্থ যাই-ই হোক) পরীক্ষায় পাশ-নম্বর পায় না ব'লে। সম্ভব সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের ৮টি কবিতার মধ্যে ৯টি গদ্য কবিতা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন কাব্যসৃষ্টির সেই একটিমাত্র ভঙ্গীকেই বড় ক'রে দেখান হয়েছে যার অনুকরণে অনেক নবীন কবি "রবীন্দ্রোত্তর" যুগের "রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত" কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। দুই দশকের "সব চেয়ে সার্থক কবিতাগুলি" সংকলনের প্রতিজ্ঞা ক'রে সেই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গীর কাব্য সৃষ্টি করেছে তার বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উপর অবিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এ সংগ্রহ থেকে বাদ দিলে সম্পাদকেরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাই বলি কেন! এ সংগ্রহের অনেক কবি ও কবিতাকে 'আধুনিকত্বের' সরু দরোজা দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে ভিতরে আনতে হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটি কবিতা আছে।

"ভুটিয়া যুবতী চলে পথ;
* * *
সহজে নাচিয়া যেথা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—

জানি নাকো তারো কি ব্যথায়

আঁখিজলে কাজল ভিজায়।" (১৩)

সার্থক কবিতা। ভাব ও ভঙ্গীর কোনও "আধুনিকত্বে" নয়, কাব্য-রসের সর্ব্ব-কালিকত্বে। মোহিতলাল মজুমদারে

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী।
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত রচনা!" (২১)

ছন্দে ও অলংকারে পুরাতন, শব্দ-প্রয়োগে অনাধুনিক—শব্দার্থের জন্য গলদ্‌বর্ম্ম হ'তে হয় না, ভাব ভর্ত্তৃহরিতেও পাওয়া যায়; কিন্তু এ নতুন।

"দৃষ্টপূর্ব্বা অপি হ্যর্থা কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ:
সর্ব্বে নবা ইবা ভান্তি মধুমাস ইবা দ্রুমাঃ॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

"প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয় রক্ত মাখা!" (২৩)

যে "মুডের" কাব্য-রূপ তা আধুনিক নয়। ভগবান বুদ্ধের জীবন ঐ "মুডের"-ই কর্ম্মরূপ। হুমায়ুন কবিরের সনেট দুইটি (৮৩) কি অর্থে আধুনিক? অজিত দত্তের ৫টি কবিতায় (৬৮—৭২) আধুনিকত্বের ছাপ কত বড়?

"কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙা! ও কেবল ভূষণ তোমার।
* *
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।" (৭১)

চটুল ব্যঙ্গের মিষ্টি কবিতা, আধুনিকত্বের একচেটে নয়। বুদ্ধদেব বসুকেও এ সংগ্রহে রাখতে হয় পাশে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে। তার কারণ প্রথম সম্পাদকের ভূমিকাতেই বলি। "পূর্বতন সমস্ত প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশান। সে-ফ্যাশানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুদ্ধদেব বসু উনিশ

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

• শতকের খেয়ালী সুরকে সাহস এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। * * * * বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও মাঝে মাঝে বিংশ শতাব্দীর আত্ম-জিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দের চিত্তকে।"

নজরুল ইসলামকে এ সংগ্রহে আনা হ'লো কেন?

"দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!" (২৯)

এ কি আধুনিক?

(১)

মোট কথা সম্পাদকেরা মনস্থির করতে পারেন নি। দ্বিতীয় সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন বটে, "যে ধরণের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে" এবং যাকে "বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এদেশে নেই" তার পরিচয় দেওয়াই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য"; কিন্তু কাজের সময় পিছিয়ে গেছেন। তাঁরা সাহস ক'রে বলতে পারেন নি যে তাঁদের সংগ্রহ উদ্দিষ্ট কালের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ নয়, significant কবিতার সংগ্রহ। অর্থাৎ কেবল সেই সব protestant কবিতা যারা পূর্বতন কাব্য-প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেদের আধুনিকত্ব বজায় রেখেছে, এবং যারা হয়ত ভবিষ্যৎ কাব্যপ্রথার সূচনা (অবশ্য ভবিষ্যতের কথা কে জানে)। সম্পাদকেরা যদি সাহস ক'রে তাঁদের সংগ্রহকে শুধু এই শ্রেণীর কবিতার ভাণ্ডার করতেন তবে "বাংলা কবিতার অত্যন্ত সাম্প্রতিক হালচালের খবর" ১৯০ পৃষ্ঠায় দিতে পারতেন অনেক বেশী। ভূমিকা দুটি দীর্ঘ ক'রে, চাই কি সংখ্যা বাড়িয়ে এই নবীন কাব্যের অভিনবত্ব ও গুণ-দোষের সম্যক আলোচনায় অনেক পাঠকের বিরুদ্ধ মন এর প্রতি অনুকূল করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের প্রধান কাজ ব্যাখ্যাতা হওয়া। শ্রেণী বিশেষের কাব্যের সাধারণ আলোচনায় প্রায় সৃষ্টি হয় কাব্য-তত্ত্বের দর্শন শাস্ত্র। এর প্রয়োজন আছে।

কিন্তু কবিতা বিশেষের রসাস্বাদনে তার সহায়তা খুব কম। সম্পাদকেরা কবিতার পাদটীকায় কি পুঁথির পরিশিষ্টে এ সব কবিতা থেকে পাঠক সাধারণের আনন্দলাভের যে সব স্বীকৃত প্রাথমিক বাধা আছে তা দূর করবার চেষ্টা করতে পারতেন। শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকার ভাষায় এ সকল কবিতার অত্যন্ত "ক্ষিপ্রগতির জন্য" নানা দেশের সাহিত্যের যে "বিস্তৃত" "উল্লেখ ও উদ্ধৃতির" নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী কাব্য-পাঠকের যা অপরিজ্ঞাত, সম্পাদকেরা প্রয়োজন মত তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিলে অনেক পাঠকেরই কবিতার মর্ম্মে প্রবেশের পথ অনেকটা সুগম হতো,—যদিও এটা সাহিত্যের প্রশ্নপত্রের সেই মামুলী 'explain the allusion'। যেখানে কবিতার কোনও ভাব আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় কবির অনিয়ন্ত্রিত মনের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অপরিস্ফুট খেয়াল, তার "বাসনা" যে বহুজনের মগ্নচৈতন্যে রয়েছে তা টেনে তুলে দেখালে কাব্য-পাঠের আনন্দের সঙ্গে পাঠক শ্বেতকেতুদের মনে 'তত্ত্বমসির" পরম বিস্ময় মিশে কাব্যের রসকে প্রগাঢ় ক'রে তুলতো। কবিতাকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও মিতবাক রাখার জন্য উপমা-উৎপ্রেক্ষা যেখানে নিতান্ত সংক্ষেপ ও অত্যন্ত ঠাসা, ব্যাখ্যায় তারা একটু বিস্তৃত ও ঢিলে হ'লে অনেক পাঠক উপকৃত হতেন। এমন কি শব্দের প্রয়োগ যেখানে চরম রকম খামখেয়ালি এবং ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাত আভিধানিক অপপ্রয়োগ, কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার যে কতদূর প্রয়োজন ছিল তার ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন নয়। এবং নিতান্ত অসম্ভব বোধ না করলে কবিতা যেখানে অতিরিক্ত রকম "অর্থঘন" সেখানে একটু ব্যাখ্যার জল মিশিয়ে তরল করলে অনেক পাঠক গলাধঃকরণ করতে পারতেন, এবং ক্রমে neat অভ্যাস হয়ে আসতো। এ সব প্রাথমিক বাধার ক্যাটালগ আমার মনগড়া নয়। একখানা ইংরেজি আধুনিক কবিতা সংগ্রহের গুণগ্রাহী সম্পাদকের ভূমিকা থেকে মোটামুটি নিয়েছি (১)। আর আমাদের সম্পাদকেরা ত স্পষ্টই জানিয়েছেন

(১) *The Faber Book of modern Verse :* Edited by Michael Roberts. 1936. "There is the intellectual difficulty which arises from the poets' use of some little-known fact, or some idea hard to grasp ; there is the difficulty which comes from the unusual use of metaphor ; and there is the difficulty which arises when the poet is making a deliberately fantastic use of words." ইত্যাদি।

এই সব কবিতার প্রদীপেই আমাদের অত্যাধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যের দীপ জ্বালাচ্ছেন।

কিন্তু সম্পাদকেরা এ পথে চলেন নি। অবশ্য কারণ আছে, হয়ত একাধিক কারণ। ফলে তাঁরা যে পাঁচ-মিশেলী সংকলন করেছেন তার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠার দ্বিতীয় সম্পাদকের যে আশঙ্কা তা একেবারে অমূলক নয়।

(৩)

আধুনিক বাংলা কবিদের, এমন কি তাদের প্রধানদেব কাব্যেরও রীতি-রূপ-মর্ম্মের বিশেষ কিছু আলোচনা সম্পাদকের ভূমিকা দুইটিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি ত সরাসরি বাদ দিতে হবে। "মার্কস্‌পন্থা", "গণশক্তি", "আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজুরদের ধর্ম্মঘট", "বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গতি" ইত্যাদি গরম বস্তু নিয়ে তিনি এত মেতে আছেন যে কাব্য-কৌশলের মত কবোষ্ণ বিষয়ের আলোচনা তাঁর কাছে আশা করা অন্যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে বিষয়-বস্তু কাব্য নয়, তা সে বিষয় যতই গুরুতর ও উৎকট হোক না কেন। বস্তুকে ধ্বনি ও রূপে গ'ড়ে তোলাই কবিকর্ম্ম। আর তার কৌশলের আলোচনাই সমালোচনা। শ্রীযুক্ত আইয়ুবের ভূমিকা থেকে কিছু আলো পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিমের 'প্রতীকী' অর্থাৎ symbolist কবিদের কাব্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা অল্প যা বলেছেন অনুমান হয় তাঁর মতে অল্পবিস্তর সেগুলিই বাংলার আধুনিক কবিদের কাব্য-প্রথার বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি সেগুলি হচ্ছে এই। "এঁদের শব্দ-চয়ন নিখুঁত ও বাক্যনির্ম্মাণ অত্যন্ত ঘন, এবং ভাষা ব্যবহারে রয়েছে অভূতপূর্ব্ব নির্বাহুল্য"। "কাব্যের প্রকাশ ক্ষমতা তাঁরা অনেক বাড়িয়েছেন ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ করে, শুঁড়িখানার কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালঙ্কার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে", অর্থাৎ চলতি গ্রাম্য কথা ও পূর্বতন সাহিত্যিক অলংকৃত ভাষা এক সঙ্গে ব্যবহার ক'রে। অল্প পরিসরে অনেকটা কাব্য-রস সৃষ্টির জন্য তাঁদের কবিতা নানা সাহিত্যের allusion এ ঠাসা,

যার "ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত' তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত"। বাহুল্য বর্জনের জন্য এঁরা "সিনেমাপ্রযোজকদের cutting পদ্ধতি অনুসরণ" করেন : অর্থাৎ কবিতার আদি-মধ্য-অন্তের দৃশ্যত যোগরক্ষার দায় ঘাড়ে নিয়ে কথা বাড়ান না, সে যোগসূত্র পাঠকের নিজের আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে। এ হলো বহিরঙ্গ। মর্ম্মের দিক থেকে এঁরা "অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী"। "অনেক সময় এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে"। "কোনও অনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ-প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদের বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তি-সঙ্গত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সঙ্কুচিত করা হয়।"

এ বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা আধুনিক কবিতায় কি রূপ নিয়েছে না নিয়েছে অল্প পরীক্ষা করা যাক্।

(৪)

এ সংগ্রহে সংকলনের সংখ্যা-প্রমাণে আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে প্রথম তিনজন হচ্ছেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসমর সেন ও শ্রীবিষ্ণু দে। এঁদের সংকলিত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৯, ৮, ও ৭। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সংখ্যাও ৭। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি সম্পাদকীয় মতে তিনি বিশুদ্ধ আধুনিক নন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কবিতা "হৈমন্তী" (৩১)

"বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশির সন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি।
অস্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেলো রজনীগন্ধায়।"

অত্যন্ত প্রকট অনুপ্রাসে কবির আসক্তি অসাধারণ। বাংলায় অপ্রচলিত বৈকাল

অর্থে "সন্ধ্যা" শব্দের প্রয়োগের আর কোনও সার্থকতা নেই। "মাঙ্গলিক" কথায় যে ব্যঞ্জনা তা এখানে মোটেই উদ্দিষ্ট নয়, তবে ওর আরম্ভে 'ম' আছে। হেমন্তের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি আকাশে আলোর রং-এর আশু-বিলীয়মানত্ব রেখে গেল রজনীগন্ধার গন্ধে—অত্যন্ত thin, বিশেষ হেমন্তের সন্ধ্যায় কি প্রভাতে রজনীগন্ধা যখন সুলভ নয়! অথচ কথা খরচ হয়েছে অনেক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক শব্দ ব্যয়ে অল্প কথা বলায় সুধীন্দ্রনাথের আনন্দ। তেমনি আনন্দ অপ্রচলিত গালভরা শব্দ অভিধান থেকে নিয়ে বা নিজে গ'ড়ে একত্র জমা করতে, যাতে পাঠকেরা বেশ একটু দিশেহারা হয়। "অধরার অহেতু আকুতি" সামান্য একটা নমুনা।

> "দিবো না স্মারক অঙ্গুরীয়
> ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ।"
>
> (মহাসত্য, ৪২)
>
> "গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
> অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্ম্মোকে।"
>
> (নাম, ৪৩)
>
> "রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
> অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
> অনুর্ব্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
> জোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে॥"
>
> (নরক ৪৬)

এর সব কথার অর্থ বা সার্থকতা বুঝেছি এমন গর্ব্ব নেই, আর কবি ছাড়া অন্য কারও কাছে সব কথার অর্থ ও সার্থকতা আছে তাও স্বীকার করছি নে। তবে ভাষা ব্যবহারে "নির্বাহুল্য" যদি আধুনিকতার একটা লক্ষণ হয় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে বন্ধন থেকে আশ্চর্য্যরকমে মুক্ত। কি সে ভাব এই ভাষা যার প্রকাশের স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক উপায়!

এ সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন আধুনিক কবি সহজে নুইয়ে পড়া বাংলা কবিতার ভাষাকে সোজা হয়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। তাকে দিতে

চাচ্ছেন একটা ঋজু কাঠিন্য। ভবিষ্যতের কবিপ্রতিভা হয়ত এ আরম্ভকে কাজে লাগাবে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় উপকরণ অনেক,—"অভিধান", 'অন্বীক্ষা', "রসশাস্ত্র", "গভীর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা", "স্বভাবজ সমাজবিমুখতা", "যদিদং কিঞ্চ সর্বং" সবেতে দারুণ বিতৃষ্ণার ভঙ্গী,—কিন্তু এ সব মিশে কবিতা কাব্য হয়ে ওঠে নি। হামানদিস্তায় চূর্ণ হয়েছে অনেক জিনিষ কিন্তু যে উত্তাপে সব গ'লে রক্তবর্ণ মকরধ্বজ দানা বাঁধে তার অভাবে কজ্জলীই রয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের মনে এ উত্তাপের অস্তিত্বে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্যাসানের ঠাণ্ডা বাতাসে সে তাপ উবে যাচ্ছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন "আধুনিকত্বের" সর্ব্ব-লক্ষণ যুক্ত কবিতা ছাড়া তিনি লিখবেন না। পাছে সমস্ত কবিতাটার আবছায়া গোছ ছাড়া একটা স্পষ্ট অর্থই দাঁড়িয়ে যায় সেই ভয়ে কবিতার এক অংশ থেকে অন্য অংশকে খাপছাড়া করেই তাঁর মনে শান্তি নেই, প্রতি শ্লোকের এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের যথাসম্ভব অসংলগ্ন অসঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলেছেন।

> "ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
> স্বয়ম্বর ধর্ম বৃথা, ওরে নষ্টনীড় !"
>
> (চতুর্দশপদী, ৮৪)

রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার চরণ বা চরণাংশ আচমকা এনে ফেলা এ অসঙ্গতি রক্ষার একটা প্রধান উপায়।

> "জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
> শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
> তোমার পোষ্টকার্ড
> আর এলো তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।
> সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ করে' চলে'
> যাক্।
> বাসের একি শিং-ভাঙা গোঁ ?
> যন্ত্রের এই খামখেয়াল !

এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।"

(টপ্পা-ঠুংরি, ৮৪)

"হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেব দেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে' গেছে রজনীগন্ধা-বনে।"

(ক্রেসিডা, ৮৭)

উদ্দেশ্য যা-ই হোক শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। এ অসংলগ্নের আনন্দ বিষ্ণু দের একচেটে নয়।

"ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার-ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারীদের
করকবলেই ভবলীলা শেষ।"

(সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'পদাতিক', ১০৭)

"এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।
গাত্রদাহ শুধু নিষ্ফল আক্রোশ।
সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাবো।"

(সমর সেন, 'বকধার্মিক', ১০২)

সমাজ সংসারের সব জায়গায় খাপছাড়া অসঙ্গতি ও অর্থহীনতা,—কাব্যে তার প্রতিরূপ ফোটাবার যদি এই পন্থা হয় তবে দু একটা কবিতাই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ প্রতি কবিতায় এর আমদানী প্রত্যেক কবিতাকে করে Waste Land এর reductio ad absurdum। সেটা Waste Landএর কাব্য হয় না, হয় কাব্যের Waste Land।

শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁর ভূমিকায় অনেক আধুনিক কবির কবিতার অর্থ-বিমুখতা সম্বন্ধে Eliotএর বচন তুলেছেন। "Some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient

of this 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities, of intensity through its elimination" । Eliot পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন ছিল না। এ সংগ্রহের ২০ নং কবিতাতেই ওর তত্ত্ব আছে।

"আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।"

নমুনাও আছে,—

"আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার!
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।"

(সুকুমার রায়, 'আবোল তাবোল'।)

কিন্তু বাংলার আধুনিক কবিরা ৺সুকুমার রায় নন। তাঁরা 'সিরিয়াস' কবি। "সমরোত্তর যুগের" প্রশ্ন ও নিরাশায় ভারাক্রান্ত।

বেশ কল্পনা করা যায় যদি এমন দিন আসে যখন মানুষের সমস্ত কাজ ও চিন্তা রাষ্ট্রের নিখুঁত ও নিফাঁক নিয়ন্ত্রণে বীজগণিতের 'ফরমুলা' হয়ে উঠবে তখন মন এমনিধারা অর্থহীন অসংলগ্নের মধ্যেই মুক্তি ও কাব্যের আনন্দ পাবে। সে যুগের জন্য এখন থেকেই কাব্য-রচনায় হয় ত লাভ নেই। তখন হয় ত এর চেয়ে অন্য ভঙ্গীর অসঙ্গতির আদর হবে।

সম্পাদকীয় ভূমিকা প'ড়ে জানা যায় যে "সাম্যবাদী দলে" শ্রীযুক্ত সমর সেন "নিঃসন্দিগ্ধ কবি", এবং ইতিমধ্যেই তাঁর "রীতিমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে"।

এ সাম্যবাদ ও নিঃসন্দিগ্ধ কবিত্বে অন্ধতা স্বীকার করছি। চেষ্টা না করেছি তা নয়, কিন্তু নিরুপায়। এ ছানি নয়, 'অপটিক্ নার্ভ'।

(৫)

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কয়টি আবার প'ড়ে আবার আনন্দ পেয়েছি,—তা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি। কারণ অবশ্য "উনিশ শতকের খেয়ালী সুরের" মোহ। তাঁর "প্রেমিক" (১৩) 'বাহু যদি তেমন ক'রে জড়ায় বাহুবন্ধের' কটুপাক। কিন্তু রস জমেছে। "আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি",—সেই নিরলংকার "নির্বাহুল্য", কাব্যে যার শক্তি অসীম। যা "the multitudinous seas incarnadine"এর মধ্যে নেই, আছে, "making the green one red"-এর মধ্যে। "ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা" (১৭) সশস্ত্র বণিক-সভ্যতার নিষ্ঠুর বীভৎসতার আশ্চর্য্য শক্তিশালী কাব্যরূপ। "ম্যাল্-এ"র (১৯)

"শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইসারা,
ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া!
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!"

ব্যঙ্গের কৌতুক হাসি ; প'ড়ে হাঁপ ছাড়া যায়। কেবল তীক্ষ্ণ দাঁত দেখান নয়।

(৬)

শ্রীযুক্ত আইয়ুব আধুনিক কবিদের outlook on lifeএর কথা বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকেন্দ্রিকত্ব ও সমাজবিমুখতা এবং "পলায়নী" মনোবৃত্তি ; বিষ্ণু দের নেতিবাচক সমাজবোধ, ও গভীর বিরক্তি ও বিষাদ। এবং তাঁদের উভয়ের চিত্তের উপর সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের প্রভাবের কথাও বলেছেন। এ সব আলোচনায় বিশেষ কোনও ফল নেই। কবির outlook on life হয় ত কাব্যের বড় ছোট নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু কাব্যত্বকে মারে বাঁচায় না। Absolute outlook ব'লে ত কিছু নেই! কবি তাঁর কাব্যের যাদুতে যে outlook পাঠকের মনে ঘনিয়ে তুলতে পারেন তখন তাই সত্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের

"আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।" ('আমি কবি,' ৫৮)

যেমন সত্য, যতীন্দ্র সেনগুপ্তের

"সরে পড়ি যদি ক্ষমা কো'রো দাদা
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই; চাষ'র ব্যারিষ্টার।"
('দেশোদ্ধার', ২৪)

তেমনি সত্য।

শ্রীযুক্ত আইয়ুব অনুমান করেছেন বিষ্ণু দের "লেখনীর মধ্যে যে-মহৎ কবিতার শুধু প্রতিশ্রুতি নয় অঙ্গীকার রয়েছে, তা তাঁকে অনেকাংশে এড়িয়েই চলেছে, সম্ভবত এই জন্য যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এখনো কোনও অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দানা বাঁধেনি"। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর দায় তত্ত্বজ্ঞানের, কাব্যের নয়। যে কবির দৃষ্টিভঙ্গী অখণ্ড সে বাজায় একতারা, অর্কেষ্ট্রা নয়। আশা করছি বিষ্ণু দের কাব্য যখন আধুনিক ছাড়িয়ে উঠবে ততদিনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অখণ্ড হয়ে জ'মে যাবে না।

তবে বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে ঐ "সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের" প্রভাবটা একবারে নকল সুতরাং বাজে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ঐ কথাটা অক্ষমতার সাফাই। এই জরা-মরণ-গ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কি নূতন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতেও পূর্ব্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না? তবে ইউরোপীয় লেখকদের কথাটা কতক বোঝা যায়। Conscript army-তে ভর্তি হ'য়ে তাঁদের অনেককেই যে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে হয়েছে, তার দুঃখ ও ভয় ভোগ করতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের অনেকের চিত্তকে একান্ত অধিকার করেছিল। বাংলা আধুনিক কবি-সমাজে কোথায় সে অভিজ্ঞতা! এক বাঙালী হিন্দুর চাকরীর সংখ্যা ও বেতন কমা ছাড়া কোন সামাজিক উপপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন! যদি কবির কল্পনার কথা ধরা যায় তবে উনিশ শতকের

বাতিল কবির "still sad music of humanity"র কথাই তাঁদের কাব্যে বাজতো, যুদ্ধের আকস্মিক আর্ত্তনাদ নয়।

আর আজকের বণিক-সভ্যতার যে অত্যাচার, বদল-চেহারায় তা সকল যুগেই ছিল। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "রাজকুমার" কবিতায় এ সরল সত্যটা কাব্যের রূপ পেয়েছে। আধুনিকত্বে ভেসে না গেলে তাঁর কাছে আশা আছে। যদি আজকের দিনের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমস্যাকে কাব্য না এড়াতে পারে, কি এড়ান অনুচিত হয় তবে আমাদের প্রাচ্যের বড় সমস্যা কি ইউরোপীয় সভ্যতাব আসন্ন প্রলয়, না আমাদের বুকে সে সভ্যতার লোভ গর্ব্বের জগদ্দল পাথর? কিন্তু কোথায়। এক বুদ্ধদেবের "আফ্রিকা" কবিতা ছাড়া এ সংগ্রহে ত আর কোনও আধুনিক কবিকে এ দুঃখ উদ্বুদ্ধ করেছে দেখলাম না। পশ্চিমের কবিরা সে গান গাচ্ছেন না বলে কি?

(৭)

অনেক কটুভাষণ করেছি। কবিরা ক্ষমা করবেন। তাঁদের অবশ্য ক্ষোভ নেই; পৃথ্বি বিপুলা, কাল নিরবধি। ভবিষ্যতের বিচার ভবিষ্যৎ অবশ্য করবে, কিন্তু বর্তমানের বিচার বর্তমানকেই করতে হবে, ভুলের যত আশঙ্কাই থাক। বর্তমানের অবিচার ভবিষ্যতের আপীল আদালত রদ করেছে এর কত নজীর সাহিত্যের দপ্তরে আছে। কেবল নেই নজীরগুলি নেই যেখানে বর্তমানের বিরুদ্ধ রায় ভবিষ্যৎ বহাল রেখেছে। কোন পাল্লা ভারী?

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'সোনার তরী' আর 'চিত্রা' রবীন্দ্র-প্রতিভার একই প্রেরণার যুগ্ম মঞ্জরী। একদিকে উদার, অবারিত বিশ্ব-প্রকৃতি, অন্যদিকে বাস্তবজীবনের বিচিত্র লীলা, এ দুয়ে মিলে 'নির্জন-সজনের যে নিত্য সঙ্গম' কবির মনে অফুরন্ত ছন্দের ঢেউ তুলছিলো, তা থেকেই প্রথমে 'সোনার তরী'র ও তার অনতিপরে 'চিত্রা'র জন্ম। রবীন্দ্রনাথের অসাবধান পাঠকেরও এটা নজরে পড়ে যে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেরই একটি অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য আছে: 'মানসী' থেকে 'শেষ সপ্তক' পর্যন্ত কোনোটিই ঠিক অন্য কোনোটির মতো নয়, আঙ্গিকে ও প্রসঙ্গে প্রতি গ্রন্থই তার অগ্রজ থেকে পৃথক। এ পার্থক্য শুধু কালানুক্রমিক পরিণতির ফল নয় (তাহ'লে এটা উল্লেখযোগ্যই হ'তো না); ব্যাপারটা এইরকম যে প্রতিটি গ্রন্থের উপাদানও স্বতন্ত্র, আর সে-উপাদান রূপে ফোটাবার কলকব্জাও আলাদা। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' এ-বিষয়ে, আমার মনে হয়, ব্যতিক্রম। এ দুই গ্রন্থের সদৃশতা লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। এদের উপাদান নিশ্চয়ই এক, আর আঙ্গিকের দিক থেকেও 'চিত্রা'য় এমন কোনো অভিনবত্ব নেই, 'সোনার তরী'তে (কি 'মানসী'তে) যার প্রথম পরিচয় না পেয়েছি। তবু এ-কথা বললে নিতান্ত অন্যায় হবে যে 'চিত্রা' 'সোনার তরী'রই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বরং এ-সত্য খুব সহজেই ধরা পড়ে যে ভাবের দিক থেকে 'চিত্রা' আরো গাঢ়, আরো সংহত; 'সোনার তরী'তে যে-কথা কবি আগাগোড়াই বলেছেন কিন্তু কোথাও স্পষ্ট ক'রে বলেননি, সে-কথা 'চিত্রা'র প্রথম কবিতাতেই অনবদ্য বাণীতে বেজে উঠলো:

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী!

রবীন্দ্র-রচনাবলী: চতুর্থ খণ্ড: বিশ্বভারতী। এই খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—নদী, চিত্রা; নাটক ও প্রহসন—বিদায়-অভিশাপ; মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা; উপন্যাস ও গল্প—প্রজাপতির নির্বন্ধ, প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা।

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

'সোনার তরী'র সহজ জীবনানন্দ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপভোগের চেতনা, মানব-মনের সাধারণ সুখদুঃখের আন্দোলন, আবার তা থেকে প্রকৃতির বুকে নিভৃত মুক্তি, এ-সমস্তর ভিতরেই সেই অস্পষ্টতা ছিলো যা গীতিকবিতার প্রাণ। কিন্তু এই সমস্তই 'চিত্রা'য় নিয়েছে কঠিন, স্পর্শসহ রূপ, 'চিত্রা' বড়োই স্পষ্ট, কবির জীবনধর্মের একটি বিস্তৃত ও অভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

বহুকাল পরে 'সোনার তরী' আর 'চিত্রা' পাশাপাশি প'ড়ে আবিষ্কার করলুম যে এ দুয়ের মধ্যে 'সোনার তরী'র 'পরেই আমার পক্ষপাত। এ-পক্ষপাত ব্যক্তিগত হ'লেও উল্লেখ করলুম এই কারণে যে যদিও 'চিত্রা' কবির কয়েকটি বিখ্যাততম ও সর্বাধিক প্রচলিত কবিতার ভাণ্ডার, তবু এ-কথা মানতেই হয় যে 'সোনার তরী' খুললেই গীতিকবিতার যে-মদির সৌরভে মন আচ্ছন্ন হয়, যে-সৌরভের চরম উন্মাদনীশক্তি 'ক্ষণিকা'য়, ও শেষ মৃদু নিঃশ্বাস 'পূরবী'-'মহুয়া'র কোনো-কোনো কবিতায়, যে সৌরভ কবির সহস্রাধিক সংগীতে পরিব্যাপ্ত, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-সত্তার নির্যাস, 'চিত্রা'য় বিক্ষিপ্ত পংক্তিতে কি স্তবকে, কিংবা অপ্রধান কোনো-কোনো কবিতায় ছাড়া, তা অনুপস্থিত। 'সোনার তরী'তে যে-আবেগ বিশুদ্ধ, সুতরাং অনির্দিষ্ট, 'চিত্রা'য় তার মানচিত্র আঁকা হয়েছে চিন্তার নানা রঙে; 'সোনার তরী'তে আত্ম-উন্মেষের পরিপূর্ণতা, 'চিত্রা'য় আত্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। এই কারণে 'সোনার তরী' সর্বদাই সরল ও সানন্দ, 'চিত্রা' সমারোহময় ও গম্ভীর। এখন আর নিছক অনুভূতি নিয়ে কবি তৃপ্ত নন, অনুভূতির সঙ্গে মননশক্তির বিবাহে তিনি উদ্যোগী। 'সোনার তরী'র সঙ্গে নাড়ির বন্ধনে যুক্ত হ'য়েও 'চিত্রা', তাই, পরবর্তী 'কল্পনা' ও 'খেয়া'র প্রতি চিন্তার জ্বলন্ত অঙ্গুলিনির্দেশ করছে।

কবির পক্ষে দীর্ঘজীবন লাভ করা, তাঁর একলার নয়, তাঁর স্বভাষী সকলেরই মহা সৌভাগ্য, কিন্তু কবির নিজের দিক থেকে এ-সৌভাগ্যে ক্ষুদ্র একটু খুঁত আছে। সেটা এই যে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর রচনা 'ক্লাসিক' শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে ইস্কুল-কলেজে পাঠ্য হয়, এবং তার চেয়েও যা নির্মম, ক্লাশ-পড়ানো ব্যাখ্যা কবির



স্বকর্ণে না-শুনে উপায় থাকে না? কেননা বাংলাদেশে এ তো সর্বদাই দেখা যায় যে যে-মুহূর্তে একটি কবিতা কালেজি পাঠ্য হ'লো সে-মুহূর্তে ছাত্ররা এবং অনেক সময় অধ্যাপকেরা স্বয়ং তার স্পষ্ট মানেটার প্রতি দৃকপাতমাত্র না ক'রে নোট ও অনুরূপ কাব্যাংশে কণ্টকিত পথ ধ'রে বেরোন গূঢ় অর্থের সন্ধানে। কবিতাটি প'ড়েই যে-মানে মনে জাগে, পরীক্ষা পাশের পক্ষেও যে সেটুকুই যথেষ্ট এ-কথা প্রায় কোনো ছাত্রেরই বিশ্বাস হয় না (তাছাড়া আমাদের গোটা শিক্ষা-পদ্ধতিই এমন পরাশ্রয়ী যে ছাত্রেরা নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করতে প্রায় ভুলেই যায়, যা অত্যন্ত সরল তার ব্যাখ্যা খোঁজে মাষ্টারমশাইর বক্তৃতায় ও তারও বেশি ভাষ্যপুস্তিকায়), এবং কোনো-কোনো অধ্যাপকও তাদের এই অর্বাচীন পাণ্ডিত্য-লিপ্সাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের কল্পিত মর্যাদা বজায় রাখেন। ফল এই দাঁড়ায় যে সরলকে সরলতর করতে গিয়ে উপদেষ্টা নিজেই খেই হারিয়ে ফেলেন, মূল যদি বা বোঝা যায়, ব্যাখ্যা হ'য়ে পড়ে নিতান্ত দুর্বোধ, এবং এ-অবস্থায় (অবস্থাটি এতই গুরুতর যে আনন্দবাজারের ভাষা চুরি ক'রে প্রায় 'পরিস্থিতি' বলা যায়) খোদ কবি হাতের কাছেই আছেন ব'লে তাঁকেই কুতর্কের বিচারক মানা হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ-ঘটনা বহুবারই ঘটেছে, এবং প্রতিবারই তিনি ধৈর্যের আদর্শ হ'য়ে নিজের কবিতার টীকা করেছেন: 'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখাই সমালোচন' এ-কথা একই জন্মে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হ'লো। 'সোনার তরী', 'উর্বশী' ও অন্যান্য কবিতার যে-সব ভাষ্য চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অধ্যাপক-জীবনে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পত্রাকারে সংগ্রহ করে-ছিলেন, যেগুলো 'রচনাবলী'র 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে স্থান পাচ্ছে, সেগুলো প'ড়ে শুধু এ-কথাই মনে হয় যে কবির জীবদ্দশায় তাঁর কাব্য কালেজপাঠ্য না-হওয়াই ভালো। কেননা 'উর্বশী' সংক্রান্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুধু এ-কথাই বুঝিয়েছেন যে উর্বশী শেলির ইন্‌টেলেকচুয়াল বিউটি নয়, পুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মীও নয়, 'সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়,' সে উর্বশী! উর্বশী যে উর্বশীই, বিশ্বজগতের অন্য কোনো বস্তু নয়, এ-কথাও যে বুঝিয়ে বলতে হয়

তাতে এটাই শুধু বোঝা যায় যে খুব বেশি বোঝবার চেষ্টা করলে কবিতা পড়াই হয় ব্যর্থ। 'উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি-উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তা হলে ধিককারের যোগ্য হতুম।' 'উর্বশী' ও রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক কবিতার গূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণে যাঁরা এখনো গলদ্ঘর্ম, কবির এই প্রচ্ছন্ন ভৎ'সনা তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন এমন আশা আমার নেই ; কিন্তু যাঁরা কবিতা ভালো লাগে ব'লেই কবিতা পড়েন (আশা করি বাংলা দেশেও এমন লোক কিছু আছেন) তাঁদের পক্ষে ও-বাক্য সর্বদাই স্মরণীয়।

'উর্বশী'র চেয়েও, এমনকি 'তাজমহলে'র চেয়েও, বেশি কুতর্কের সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। 'জীবনদেবতা' ও 'অন্তর্যামী' এ দুটি কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ভক্তিরই নিদর্শন, এ-মত বাংলাদেশে অনেকদিন ধ'রেই প্রচলিত, এতদিনে এই দূষিত মত সমূলে উচ্ছেদ ক'রে কবি তাঁর নিজের ও তাঁর সকল পাঠকের মহৎ উপকার করেছেন। 'রচনাবলী'তে 'চিত্রা'র সূচনায় তিনি বলেছেন :

> 'চিত্রা' কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল।...... পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই ; নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে নি এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে

> যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ **ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।** (বড়ো অক্ষর আমার)

এ ছাড়া ১৩১১ সালে সংকলিত 'বঙ্গভাষা ও লেখক' গ্রন্থে কবি এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন তাও উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি ;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি সে ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—
>
> এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
> ওগো কৌতুকময়ী,
> আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
> বলিতে দিতেছে কই।...
>
> * * *
>
> বলিতেছিলাম বসি একধারে
> আপনার কথা আপন জনারে,
> শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
> ঘরের কাহিনী যত ;
> তুমি সে-ভাষারে দহিয়া অনলে,
> ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটির মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা,—সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা আরো বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না?…

শুধু কি কবিতালেখার এক জন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখে, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।…এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি।…আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনীশক্তি…আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই "জীবন-দেবতা" নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।…

* * *

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের

উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কালমহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন. সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

জীবনদেবতার এর চেয়ে প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা অসম্ভব।

নিজের মধ্যে এই দ্বিত্বের অনুভূতি কবিদের মধ্যে বিরল নয়। যে-মানস-রসায়নে ব্যক্তিগত কথা রচয়িতার অজ্ঞাতেই, এমনকি তাঁর অনভিপ্রেত হ'য়েও বিশ্বের কথা হ'য়ে ওঠে, সমস্ত শিল্পকলার মূল কথা সেটাই, এই রসায়নী প্রক্রিয়া যার মধ্যে নেই, কবি কি শিল্পী সে কখনোই হবে না। অথচ কোনো কবিই সব সময় কবি নন্; তাঁর কবি-সত্তা ও দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সত্তার মধ্যে একটি বিরোধ, অন্তত বিসদৃশতা, অনেক কবিই অনুভব করেন। এই বিরোধের চেতনার প্রতিক্রিয়া সকলের উপরে সমান হয় না; কেউ, রবীন্দ্রনাথের মতো, দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবার সাধনা করেন, কেউ বা, ফরাসী প্রতীকীদের মতো, কাব্য-সত্তাকেই সম্পূর্ণ জীবন সঁপে দিয়ে সংসারকে উপেক্ষা ক'রে ভাবলোকেই শুধু বাঁচেন। প্রতীকীদের মতো অন্তিমপন্থী না হ'য়েও কোনো-কোনো কবি একটি বা একাধিক প্রতীকে নিজের কবি-সত্তার মূর্তি গড়েন, তারপর সেই মূর্তি পূজা তাঁর কাব্যসাধনারই নামান্তর হয়। দানব কি মিনার, গোলাপ কি মুখোস কি কোনো কাল্পনিক পশু কি পাখি, তার নাম ও বর্ণনা বিভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু মূলত সে একই, কবি-সত্তার প্রতীক, এবং এর প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই প্রতি সৎকবি স্বধর্ম বলে জানেন। নিজের এই দ্বিত্ব-বোধ সমসাময়িক বিদেশী কবিদের মধ্যে খুবই স্পষ্ট; এখানে দু' একজনের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বীয় কাব্যসংগ্রহের একটি বর্জিত ভূমিকায় ডি. এইচ. লরেন্স বলছেন যে প্রথম যৌবনে তিনি যখন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, '...I used to feel myself at times haunted by something, and a little guilty about it, as if it were an abnormality. Then the haunting would get the better of me, and the ghost would suddenly appear, in the shape of a usually rather incoherent

poem. Nearly always I shunned the apparition once it had appeared. From the first, I was a little afraid of my real poems--not my "compositions", but the poems that had the ghost in them. They seemed to come from somewhere, I didn't quite know where, out of a man whom I didn't know and didn't want to know, and to say things I would much rather not have said : for choice.···To this day, I still have the uneasy haunted feeling, and would rather not write most of the things I do write....Only now I know my demon better, and, after bitter years, respect him more than my other, milder and nicer self.' ইএট্‌স্‌, যাঁর কাব্যপ্রতিভা এ যুগের ইওরোপে প্রায় অতুলনীয়, তিনিও নিজের সঙ্গে অফুরন্ত সংগ্রামের ফলেই মহাকবি হ'তে পেরেছিলেন ; তাঁর কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন সমালোচক এডমণ্ড উইলসন বলেছেন যে ইএট্‌স্‌ গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন যে যে-ইচ্ছাশক্তি ছাড়া ব্যবহারিক জগতে আমাদের চলে না, সে-ইচ্ছাশক্তি কবিত্বের শত্রু, নিজেরই কবি-সত্তার কাছে নিঃশেষ ও নিঃসর্ত আত্মসমর্পণই কবির প্রকৃত ধর্ম। ইএটস্‌, তাই পুরোপুরি প্রতীকী না হ'লেও প্রতীকে আস্থাবান ; তিনি বলেছেন যে কবির গোপন জীবনের প্রতীক যে-একটি দৃশ্য বা চিত্র, তিনি যদি সংসারের জোয়ার-ভাটা থেকে স'রে দাঁড়িয়ে সারা জীবন সেই একটি প্রতীকের ধ্যান ক'রেই কাটান, ভাষান্তরে, তাঁর Mask বা Anti-self-কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন ও রাখেন, তাহ'লেই তিনি সেই সুদূর গৃহাঙ্গনে পৌঁছতে পারবেন, যেখানে মৃত্যুহীন দেবতারা অপেক্ষমান। (···'this one image, if he would but brood over it his whole life long, would lead his soul, disentangled from unmeaning circumstance and the ebb and flow of the world, into that far household, where the undying gods await all whose souls have become simple as flame, whose bodies have become quiet as an agate lamp.') ইএট্‌স্‌ যাকে বলেছেন Mask বা Anti-self, লরেন্স যাকে বলেছেন ghost বা demon, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী কি জীবনদেবতাও তা-ই।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ তাঁর কবি-সত্তার সঙ্গে সাধারণ, সাংসারিক সত্তার ঠিক নয়, তাঁর যুগ্মসত্তা কবিজীবন আর কর্মজীবন নিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাগ্যবান আর কোনো কবিই বোধ হয় পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি: এর মানে এমন নয় যে কোনো দুঃখ তাঁকে সইতে হয়নি, জড়িত হ'তে হয়নি ঘটনার সঙ্গে কোনো সংগ্রামে; এর মানে শুধু এই যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেও তাঁর কবিপ্রকৃতির সম্পূর্ণ আনুকূল্যে রচনা করতে তিনি পেরেছিলেন। ভাগ্য শত্রুতা করেছে, কিন্তু পরিবেশ করেনি। এ-কথা আমার মন-গড়া নয়, রবীন্দ্রনাথের অজস্র গদ্যরচনায় এর সমর্থন মিলবে, অন্তরের সঙ্গে বাইরের একান্ত সদ্ভাবপ্রসূত প্রশান্তিতে তাঁর জীবন আগাগোড়াই উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের অবাধ, উন্মুক্ত কবিজীবনে বাইরে থেকে প্রথম ধাক্কা লাগলো, যখন পরিণত বয়সে এলো কর্মের আহ্বান। তখনই তাঁর দুই সত্তা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন, 'এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তাঁর প্রকাশ।' কবিত্বের আকর্ষণ অতি তীব্র, কিন্তু কর্মের আহ্বানও ফেরানো যায় না। একদিকে কল্পনার নিভৃত অন্তঃপুর, অন্যদিকে কর্মকল্লোলিত বাস্তব জীবন, দুয়েরই প্রতি তিনি নিজের দায়িত্ব অনুভব করতে লাগলেন। 'চিত্রা'য় এই দুই সুর স্পষ্ট; এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম দলিল 'চিত্রা'।

এ-কথা কবি নিজেই আমাদের ব'লে দিয়েছেন 'চিত্রা'র 'সূচনা'য়। 'চিত্রা' কবিতাটিই দ্বিত্বের বর্ণনা। যাকে তিনি দেখছেন বহির্জগতের বিচিত্রতায়—

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী

তাকেই আবার অনুভব করছেন চির নিঃসঙ্গতায়—

> অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তরব্যাপিনী।

এ ছাড়া, কবি 'সূচনা'য় এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

'এবারে ফিরাও মোরে' আর 'আবেদন' এ দুটি কবিতা পরস্পরের হুবহু বিপরীত, প্রথমটিতে তিনি নিজেকে কল্পনাবিলাসী অলস বালক ব'লে ভৎর্সনা ক'রে বিপুল কর্মের আহ্বানে মত্ত হ'য়ে উঠেছেন, অন্যটিতে তিনি পৃথিবী-পলাতক, কর্মত্যাগী, কল্পনাজীবী, শুধুই মালঞ্চের মালাকর, শুধুই কারুকর্মী।

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।' অন্তরের আদর্শলোক তিনি রচনা করেছেন 'মানস সুন্দরী'তে, নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক গড়েছেন 'উর্বশী'তে, কিন্তু সেই 'উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে' আবার তাঁর অবরোহণ 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' 'যেতে নাহি দিব,' 'প্রেমের অভিষেক' ইত্যাদিতে। বাস্তব জীবনের চিত্র তাঁর কাব্যে বিরল, এই প্রচলিত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে কবি বলছেন: 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।' এবং তাঁর এই উক্তির অন্যতম সাক্ষ্যস্বরূপ তিনি 'প্রেমের অভিষেকে'র বর্জিত অংশের উল্লেখ করেছেন। '"প্রেমের অভিষেক" এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম; "যেতে নাহি দিব" কবিতায় বাঙালি-ঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হইনি, হয়তো দু চারটে লাইন বাদ পড়ছে।'

'প্রেমের অভিষেকে'র বর্জিত অংশগুলি ('রচনাবলী'র 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে মুদ্রিত) প'ড়ে পাঠকের মনে বিচিত্রভাবের উদয় হয়। প্রচলিত পাঠের সঙ্গে বর্জিত অংশ ভালো ক'রে মিলিয়ে প'ড়লে এ-সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে 'যেতে নাহি দিব' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রবৃত্তি নির্ভুল হলেও 'প্রেমের অভিষেক' লোকেন পালিতের নির্মম বিচারে লাভবানই হয়েছে। বর্জিত অংশ থেকে একটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি দিলে আমার বক্তব্য সরল হবে:

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

ক্ষুদ্র আমি

কর্মচারী, বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী,
কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ নাহি মানে, —রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে সৌভাগ্য-গরবে
উড়ায়ে অজস্র ধূলি,—মোর গৃহ কভু'
চিনিতে না পারে !

জীবনে যে-অবসর, যে-চমৎকারিত্ব থাকলে প্রেমের এমন চরম উপলব্ধি সম্ভব যাতে প্রেমিক বিহ্বলস্বরে ব'লে উঠতে পারে, 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট।' তা দারিদ্র্য-পিষ্ট কেরানির জীবনে সম্ভবই নয়, এ-জড়বাদী আপত্তি অনেকের হয়তো অগ্রাহ্য ঠেকবে, কিন্তু অন্তত এ-কথা বলতে আমি কুণ্ঠাবোধ করবো না যে 'প্রেমের অভিষেক' প্রেমের যে-আদর্শলোকের বর্ণনা, সেখানে এই পার্থিব বাস্তব সত্যই অপ্রাসঙ্গিক। লোকেন পালিত নিশ্চয়ই এটাই চেয়েছিলেন যে কবিতাটি সম্পূর্ণই প্রেমের অমরাবতীর ব্যঞ্জনা হোক, আর 'কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি'র সঙ্গে সেই স্বর্গের তো কোনো প্রতিতুলনাই হয় না, অযথা সুর কাটে। কবিতাটিতে যে-জ্যোতির্ময় ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমাদের এমনভাবেই আবিষ্ট করে যে নায়ক-নায়িকা সমাজের কোন শ্রেণীর তা জানবার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করি না, তারা আসলে ব্যক্তিত্বহীন ও বিশ্বজনীন, তারা চিরকালের স্ত্রী ও পুরুষ। এর মধ্যে হঠাৎ যদি নায়ককে দেশ, কাল ও উপজীবিকার সাহায্যে সনাক্ত করা হয়, তাহ'লে কবিতাটি তার বিশ্বব্যাপী দ্যোতনা হারিয়ে ফেলে। এ-কবিতায়, সত্যি বলতে, বাস্তবই অলীক, বড়ো সাহেবের চোখ-রাঙানিও তা-ই, কেননা এ-অমরাবতীতে বড়ো সাহেবও প্রেমিক। 'হেথা আমি কেহ নহি, সহস্রের মাঝে একজন—' এই উক্তিতে 'প্রেমের অমরাবতী'র যে-অংশ আরম্ভ, কেরানি-জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা তারও কোনো সহায়তা করে না, বরং তার ইঙ্গিতকে সংকীর্ণ করে। সার্থক প্রেম প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার

নিজের মধ্যে যে-গৌরব, যে-বিশেষ একটি মর্যাদা দেয়, যার ফলে নিজেকেই সে নতুন ও পারিপার্শ্বিক জনতা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে আবিষ্কার করে, এ-অংশে তারই কথা বলা হচ্ছে, এ-রকম মনে করলেই সমগ্র রচনাটির গূঢ়তম ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হয়; 'বাস্তব জীবনে আমি তুচ্ছ কেরানি, তোমার কাছেই আমি মহীয়ান', এ-অংশের এইরকম মানে করলে তার বিরাট অভিপ্রায় থেকে তাকে ভ্রষ্ট করা হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ সে-কথাই বলেছেন, যে-কথা অনেক বছর পরে আবার তিনি বলেছিলেন 'পূরবী'তে—

নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্ম-বিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হ'তে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।
তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি, আমি আছি।"

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সাহিত্যে 'কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার' করেননি, তার প্রমাণস্বরূপ 'প্রেমের অভিষেকে'র বর্জিত অংশগুলির উল্লেখ করবার দরকার ছিল না; তার প্রচুর প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে তাঁর অন্যান্য গদ্য পদ্য রচনায়।

'প্রেমের অভিষেকে'র বর্জিত অংশ পড়তে-পড়তে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাতা খুললে যে-অবিরল বাণীবর্ষণে আমরা সম্মোহিত হই, সেই অজস্রতা, ভাষার সে-প্রবল বন্যাই মাঝে-মাঝে চরম সিদ্ধির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। 'মানস সুন্দরী' কি 'অন্তর্যামী'র মতো কবিতা পড়তে-পড়তে মনে হয় এমন-এক বিশাল উদ্যম কবিকে অধিকার করেছে যে যত-কিছু কথা বলবার আছে, সমস্ত নিঃশেষে না-ব'লে তিনি ক্লান্ত হবেন না; মনে হয় রাশি-রাশি কথার আক্রমণে কবি নিজেই মূর্ছিতপ্রায়; তখনকার মতো, তিনিই যেন যন্ত্র, আর কবিতাটিই যন্ত্রী। আর ছন্দের সে উন্মাদনায় আত্মহারা হ'তে-হতেও আমাদের মনে '১৪০০ সাল' কি 'প্রেমের অভিষেক' কি 'নিরুদ্দেশ

যাত্রা'র স্থমিত স্থষমার স্মৃতি লুপ্ত হয় না, কেননা উদ্দামতা আমাদের যতই অভিভূত করুক, শিল্পকলায় আমরা শেষ পর্যন্ত নিখুঁত রূপকল্পই খুঁজি। অথচ আশ্চর্য এই যে উদ্দামতা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বার-বার দখল করলেও তাঁর নাটক বা নাটকীয় কবিতাকে প্রায় সর্বদাই পথ ছেড়ে দিয়েছে; 'বিদায়-অভিশাপ' পরিমিতি ও সঙ্গতির অনবদ্য দৃষ্টান্ত, আর 'মালিনী'র সংহত শক্তি ও স্বল্পভাষী কাঠিন্য তো বাংলা সাহিত্যেই অতুলনীয়। বোধ হয় সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পদ্য-নাটকের মধ্যে এটিই সাধারণ পাঠকসমাজে সব চেয়ে অল্প পরিচিত। আমি এ-পর্যন্ত শুনিনি যে কোনো সৌখিন নাট্যক দল 'মালিনী' অভিনয় করেছেন, যদিও এর অভিনেয়তায় কোনো খুঁতই নেই। মনে হয় এর সংযত দৃঢ়তা আর নিদারুণ শোকাবহ পরিসমাপ্তিই এর প্রচার বিশেষজ্ঞ-সমাজে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। 'রচনাবলী'তে 'মালিনী'র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন যে ট্রেভেলিয়ান এই নাটকে 'গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ' দেখেছিলেন। 'তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি কারণ যদিও কিছু-কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে'। কিন্তু গ্রীক নাটক সম্বন্ধে যার জ্ঞান আমার মতোও অকিঞ্চিৎকর, সে-পাঠকেরও 'মালিনী' পড়তে-পড়তে অনিবার্যভাবেই গ্রীক ট্র্যাজিডির কথা মনে পড়বে—এর ভাষা এমনই স্বচ্ছ অথচ গম্ভীর, ঘটনার স্রোত এমন দ্রুত ও অবিচ্ছিন্নভাবে অন্তিম সর্বনাশের দিকে ধাবমান, এর শেষ দৃশ্যের কাটাসট্রফি সমস্ত সুখের আশাকে এমনই নির্মমভাবে ধ্বংস করে। 'মালিনী'র কাহিনী সরল, চরিত্রসংখ্যা স্বল্প, আর এর চালটাও খাঁটি ধ্রুপদী। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানবহৃদয়ের একটি তন্ত্রীর উপরেই আঘাত ক'রে যাচ্ছে, এখানে শেক্স্পিরীয় বৈচিত্র্য নেই, পাঠকের (কি দর্শকের) পুঞ্জীভূত বেদনা মাঝে-মাঝে হাল্কা ক'রে দেবার কোনো চেষ্টাই নেই। শেষ দৃশ্যের শেষের দিকে ক্ষেমংকর যখন এই ভয়ংকর কথা উচ্চারণ করে:

> সব চেয়ে বড়ো আজি মনে কর যারে
> তাহারে রাখিয়া দেপে. মৃত্যুর সম্মুখে;

তখন তার দারুণ আঘাতে সুপ্রিয়র শুধু নয়, আমাদেরও বুক ফেটে যায়, আর সুপ্রিয়র মুখ থেকে 'বন্ধু, তাই হ'ক' এ কথা শোনবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা

বুঝি যে আর উপায় নেই, এবার সর্বনাশ। ক্ষেমংকরের শৃঙ্খলের আঘাতে সুপ্রিয়র মৃত্যুর পরে ক্ষেমংকের, রাজা ও মালিনী উচ্চারিত যে তিনটি মাত্র হ্রস্ব বাক্যে নাটকটির সমাপ্তি, সেই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে সমস্ত বিশ্বজগতের সর্বনাশের দুঃখ কবি আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত ক'রে দেন : রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে প্রলয়ের লীলা সহজে থামে না।

রবীন্দ্রনাথের পদ্য-নাটকগুলির মধ্যে 'মালিনী'ই সব চেয়ে নাটকীয়, 'লিরিকের বাড়াবাড়ি' দূরের কথা, লিরিকের অংশ এতে সামান্যই। প্রতিটি দৃশ্যেরই আরম্ভ আকস্মিক, যেন প্রকৃত দৃশ্যটির মাঝখান থেকে, আমাদের শ্রুতিগম্য হবার অনেক আগে থেকেই পাত্র-পাত্রীদের আলাপ চলছে যেন। এ-নাটকের অভিনয়কালে শ্রোতাকে অত্যন্ত অবহিত হ'তে হবে, কারণ শ্রোতার মনঃসংযোগের অপেক্ষায় দৃশ্যের গোড়ায় কিছু বাজে কথা ঢোকাবার রীতি এখানে রক্ষিত হয়নি, কিন্তু তার বদলে আছে বেশ একটু চড়া সুরের নাটকীয় উক্তি, যার উদ্দেশ্য হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রোতার শিথিল মনকে নাটকে আবদ্ধ করা। 'ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো, সুখ-আশা দুঃখভয়,' কিংবা 'নির্বাসন, নির্বাসন, রাজদুহিতার নির্বাসন, যবনিকা উত্তোলিত হ'তে-হ'তেই এ-রকম কথা কানে পৌঁছলে যে-কোনো শ্রোতা তক্ষুনি অবশিষ্টের জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠবেন। 'মালিনী'র নিবিড় নাটকীয়তার আর-একটি কারণ এই যে এ-নাটকে সমিল ও প্রবহমান পয়ার যেরকম মুক্তিতে লীলায়িত সে-রকম ইতিপূর্বে অন্য কোথাও হয়নি। সাধারণ গদ্য কথোপকথনের নির্ভার স্বাচ্ছন্দ্য কবি প্রয়োজনমতো অনায়াসে এনেছেন :

> মা গো মা, কী করি তোরে লয়ে ! ওরে বাছা,
> এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা
> নবীন বয়সে?
>
> * * *
>
> ওগো, আপন বাপের গর্বে
> আমার বাপেরে দাও খোঁটা ? তাই গর্ভে

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

ধরেছিনু তোরে, ওরে অহংকারী মেয়ে?
জানিস, আমার পিতা তোর পিতা চেয়ে
শতগুণে ধনী, তাই ধনরত্নমানে
এত তাঁর হেলা।

রবীন্দ্রনাথের অন্য-কোনো পদ্য-নাটকের ভাষা প্রাকৃতজনের মৌখিক আলাপের এত কাছাকাছি এসেছে কিনা সন্দেহ।

পদ্যের তুলনায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পরিণতি অনেক মন্থর। 'মানসী'; 'সোনার তরী', 'চিত্রা' এ তিনটি কাব্যগ্রন্থের লেখক যে বঙ্গের একজন প্রধান কবি, যাঁর সমকক্ষ স্বদেশে একমাত্র মধুসূদন, এ-কথা যদি উনিশ শতকের শেষভাগের বাঙালি উপলব্ধি না ক'রে থাকে সেটা আমাদেরই দুরপনেয় লজ্জা। কিন্তু কাব্যে দুঃসাহসী ও দ্রুত-প্রগতিশীল হ'লেও, গদ্যে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত, নাটক ও পত্রগুচ্ছে ছাড়া, রক্ষণশীলতার পথ ধ'রেই চলেছেন। অবশ্য এরই মধ্যে তাঁর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যের দেখা পাওয়া গেলো 'গল্পগুচ্ছে', যা বাংলাভাষায় প্রথম ছোটো গল্পের সম্ভার নিয়ে এলো; তারপর 'গোরা', যা, আমার বিশ্বাস, এখন পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর মহত্ত্ব ও সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভার সার্বভৌমতা ঘোষণা করলে। আধুনিক বাংলা গদ্য সেদিন থেকেই তিনি সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন যেদিন তাঁর সাহিত্যজীবনে 'সবুজপত্র' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব হ'লো। এখন বাংলা গদ্যের যে-সুঠাম, উজ্জ্বল মূর্তিতে আমরা অত্যন্তই অভ্যস্ত, তার ভিত্তিস্থাপন করতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অর্ধ-শতাব্দী কেটে গিয়েছিলো।

অবশ্য, নিজস্ব কবিতা প্রায় বালক বয়সেই লেখা যায়, কিন্তু বিশিষ্ট গদ্য পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে, এ-কথা প্রায় সর্বজনীন। কিন্তু 'চিত্রা' ও 'চিত্রা'র দশ বছর পরে প্রকাশিত (ও মোটামুটি ৮-১০ বছর পরে লেখা) প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এত বেশি ব্যবধান একটু যেন অপ্রত্যাশিতই। এ-কথা ভেবে অবাক লাগে যে 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধগুলি শুধু 'চিত্রা'রই নয়, 'কথা' 'কাহিনী', এমন কি 'কল্পনা, 'ক্ষণিকা', নৈবেদ্যে'রও পরবর্তী। অবাক লাগে

এই কারণে যে এই দুটি সমসাময়িক এবং প্রসঙ্গ ও রচনাভঙ্গির দিক দিয়েও সমগোত্রীয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্কিম-অঙ্কিত পথ মাড়িয়েই তৃপ্ত ছিলেন, শুধু ভাষার দিকে নয়, চিন্তার দিকেও। 'আত্মশক্তি' সম্বন্ধে গতবারে বলেছি, 'ভারতবর্ষে'রও সেই একই বিষয়: অর্থাৎ, প্রাচীন, সামন্ততন্ত্রী, জাতিভেদে-স্থাপিত, ফলিত বিজ্ঞানের আশিস-বঞ্চিত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মহিমা প্রচার। ভারতে ইওরোপের প্রথম আবির্ভাব একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তিরূপে, আর যাঁরা সমসাময়িক সমাজের অন্ধ প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য ক'রে সেই বিপ্লবের নায়কত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের পরেই রবীন্দ্রনাথকেই আমরা প্রধান ব'লে জানি। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে 'বিদ্যাসাগরচরিতে' রবীন্দ্রনাথই বলেছেন যে বিদ্যাসাগর যে 'রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।··· একদিকে যেমন তাঁহারা (রামমোহন ও বিদ্যাসাগর) ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে।' কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বিদ্যাসাগরচরিতে'র (কিংবা পরবর্তী 'শিক্ষার মিলনে'র) লেখককে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে-রবীন্দ্রনাথ গান্ধি-প্রবর্তিত নৈযুদ্ধনীতি শুদ্ধ এই কারণে গ্রহণ করতে পারেননি যে তা বৃহত্তর সংস্কৃতির অন্তরায়, তাঁর চিহ্নমাত্রও এখানে নেই। এ-প্রবন্ধগুলি এখন যাঁরা প্রথমবার পড়বেন তাঁরা বিস্মিত কৌতূহলে আবিষ্কার করবেন যে জীবনের কোনো-এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ অতি বড়ো হিন্দু ছিলেন; প্রাচীন ভারতের জীবনযাপনের আদর্শ তাঁর চিত্তকে এমন প্রবলভাবে দখল করেছিলো যে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্প ও বিদ্যুতের যুগে বেঁচে আছেন, এবং এ-যুগে অতীত ভারতে ফিরে যেতে চাওয়া মানেই ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা উল্টিয়ে দিতে চাওয়া। বস্তুত আজকাল যে-শ্রেণীর হিন্দুকে 'সনাতনী' বলা হয়, তাঁরা ইচ্ছে করলেই এই প্রবন্ধগুলিকে স্বপক্ষীয় নজির হিসেবে দাখিল করিতে পারেন; কেননা বিশ্বসভ্যতার পটভূমিকায় হিন্দুর, এমনকি ব্রাহ্মণজাতির, শ্রেষ্ঠতায় এখানে তিনি আস্থাবান, এবং এই হিন্দুত্বের, তথা

ব্রাহ্মণত্বের, পুনরুজ্জীবনেই ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম হবে, এ-ভবিষ্যৎবাণী বারবার তিনি করেছেন।

না-বললেও চলে, এ ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়েছে, এবং ব্যর্থ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বোধ হয় সব চেয়ে খুসি হয়েছেন। যদিও এ-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টায় এও প্রমাণ করেছেন যে আসলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এ তিন জাতিই অর্থাৎ সমগ্র আর্যসমাজই দ্বিজ, শূদ্র শুধু সাঁওতাল-ভিল কোল-ধাঙড় অর্থাৎ ভারতের আদিম অধিবাসীরা, এবং পুনর্জাত দ্বিজসমাজ ছাড়া ভারতের চলতেই পারে না, এ-বিশ্বাস দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছেন, তবু আজ দেখা যাচ্ছে যে গত অর্ধ-শতাব্দীর নানা তোলপাড় ভাঙচুরে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদরহিত, এমন কি আর্যত্বের শেষ, ক্ষীণ ধারণাটি পর্যন্ত লুপ্ত, নতুন অর্থনীতি ইওরোপের মতোই এই প্রাচীন ভারতেও মানুষে-মানুষে কাঁচা টাকার সম্বন্ধ ছাড়া আর-কোনো সম্বন্ধই রাখেনি, তাছাড়া সম্প্রতি শূদ্র ও অহিন্দুর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে রবীন্দ্রনাথেরই এই মহান বাণী সফল হ'তে চলেছে—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান
> অপমান হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

সমস্ত শাস্ত্র, আচার ও অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে যে মনুষ্যধর্ম, যার লক্ষ্য শুধু সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল, রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মেরই দূত হ'য়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য নানাদেশে ঘুরেছেন, আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের সঙ্গে এই তাঁর আত্মীয়তার সূত্র। কিন্তু এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে স্বধর্মচ্যুত মনে হয়, কেননা ভারতবর্ষের যে-ধারণা তিনি আমাদের মনে বদ্ধমূল করতে চান তা ব্রাহ্মণশাসিত, 'আর্য' ভারত, সেখানে দ্রাবিড়ের স্থান কোথায়, মুসলমানের স্থান কোথায়, কোল-ভিল-সাঁওতালের স্থান কোথায় তা তিনি নির্দেশ করেননি। তাছাড়া তিনি এটা ধ'রেই নিয়েছেন যে প্রাচ্যভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে, এমনকি তিনি এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে প্রাচীন প্রাচ্যভাবে মরাও বরং ভালো, কারণ 'মরা-বাঁচাই সার্থকতার চরম পরীক্ষা নয়।' কিন্তু মনে-প্রাণে ভারতীয় থেকেও যে-শক্তিতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর মুমূর্ষু ভারতকে নবজীবন দিলেন, সে-শক্তি যে পাশ্চাত্ত্য

সভ্যতার সংঘাতেই তাঁদের ভিতর জেগেছিলো, তা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই উপলব্ধি করেন। ভারতের পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত এই দুই মহাপুরুষের জীবনে ও কর্মেই রয়েছে। প্রাচীন হিন্দুর অনাসক্তি, বৈরাগ্য ও আত্মিক মুক্তির কামনা সর্বস্ব ক'রে যে কোটি-কোটি নরনারীকে দারিদ্র্য, অপমৃত্যু, অপমান ও নিরক্ষরতা থেকে উদ্ধার করা যায় না, প্রাচীন ভারতেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

অবশ্য জনসাধারণের জীবন ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাও এখন পর্যন্ত মনোহর করতে পারেনি, উপরন্তু যন্ত্রোৎপাদন-প্রণালীর সমীকরণের চাপে তারা প্রায় মনুষ্যত্বরহিত, যা প্রাচ্যে সম্ভবত কখনো হয়নি। কিন্তু এ-দুর্দশা এড়াতে গিয়ে যদি সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকেই আমরা ত্যাগ করতে যাই, তবে সে-বাণপ্রস্থে দু'চারজন মহাত্মার মুক্তিলাভ হ'তে পারে, জনগণকে মৃত্যুর যূপেই বলি দিতে হয়। ইওরোপীয় শ্রমবিপ্লবের পর যে নবসভ্যতার জয়যাত্রা আরম্ভ, তার প্রাণ-ঘাতী রূপ উনিশ শতকের মধ্যভাগেই অতি নির্মমভাবে দু' একজন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরই চোখে পড়ে, এবং এ-অমঙ্গলের মূল তাঁরা খুঁজে পান ধনতন্ত্রে, সাম্রাজ্যনীতিতে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে, একের দ্বারা বহুর, ও শ্বেতাঙ্গ দ্বারা বর্ণিলের শোষণে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এই দুর্মানুষিক রূপের নিপাত কামনা না করেন, বিশ্বব্যবস্থার আত্মনিযুক্ত নায়ক এইচ. জি. ওএল্‌স্-এর মতো দু'একজন ধুরন্ধর বাদ দিলে এমন ইওরোপীয় ভাবুকও আজকের দিনে বেশি পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাঁরা সকলেই বুঝেছেন যে এই দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাণিজ্যমন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য দায়ী যে-শয়তান সে যন্ত্র নয়, ফলিত বিজ্ঞান নয়, মানুষেরই কূট স্বার্থবুদ্ধি। যন্ত্রের দৌলতে যে-বিরাট উৎপাদনীশক্তি মানুষের হাতে এসেছে, সে-শক্তি বিশেষ-এক শ্রেণীর হাতে আবদ্ধ না রেখে জনগণেরই হাতে বদলি করলে এই দুরবস্থার মূল উচ্ছেদ করা হয়, কারণ তাহ'লে লাভের বদলে প্রজা-পালনই হয় উৎপাদনের লক্ষ্য, বিতরণে সাম্য আসে, বিদেশী হাটের জন্য কাড়াকাড়ির দরকার থাকে না, জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ মনীষীই যে আজ এই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত তার কারণ এই যে এ ছাড়া সভ্যতার টিঁকে থাকবার, এমনকি মনুষ্যজাতির বেঁচে থাকবার উপায় নেই।

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যত ধিক্কার দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটিই সঙ্গত; কিন্তু এই সভ্যতার যা প্রধান দান, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিরাট উৎপাদনীশক্তি, তা যে মনুষ্যজাতি কিছুতেই পরিহার করতে পারে না, প্রাচীন ভারতের প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন র'য়ে গেছেন। আধুনিক ইওরোপীয় সমাজব্যবস্থায় মানুষের যত অবমাননা তার জন্য দায়ী এই উৎপাদনীশক্তি নয়, তার অপব্যবহার : এবং সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে এই শক্তিকে প্রয়োগ করাতেই এ-সভ্যতার পরিণতি—কারণ সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের ক্ষমতা এ-শক্তিতেই—এবং শুধু এ-শক্তিতেই—নিহিত আছে। সত্যি বলতে, ধর্ম, কর্ম ও গাত্রবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার সাধনা পৃথিবীতে এই প্রথম, এবং এ-সাধনায় মানুষ যেদিন সিদ্ধ হবে সেদিন হয়তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যই থাকবে না, বিশ্বব্যাপী এক নবীন সভ্যতা স্থাপিত হবে।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধ 'নববর্ষ' থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি যার সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের শুধু নয়, প্রায় প্রত্যেক আধুনিক পাঠকের পক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন না-করা অসম্ভব :

> (১) ভারতবর্ষ ছোটো বড়ো, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মর্যাদা দান করিয়াছে।
>
> (২) পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে—বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।
>
> (৩) য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই।
>
> (৪) পৃথিবীতে যদি ছোটোবড়োর অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি সর্বত্রই সকলপ্রকার ছোটোর সংখ্যাই অধিক ও বড়োর সংখ্যাই স্বল্প

> হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আসলে পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্র ও বণিকপ্রধান সমাজের রূঢ় কুশ্রীতা রবীন্দ্রনাথের চোখে বরাবরই অসহ্য ঠেকেছিলো, কিন্তু এ থেকে তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন শ্রেণীহীন সমাজে নয়, সামন্ততন্ত্রী ভারতের জাতি-বিভক্ত সমাজে, যেখানে প্রতি মানুষ পৈতৃক কর্মে আবদ্ধ ও উচ্চ কি নীচ অবস্থা জন্মান্তরের পুণ্যফল কি পাপের শাস্তি। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে বণিকের আধিপত্যের ফলে 'সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিসদৃশ অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে।' পরোক্ষে তিনি এঙ্গেল্‌স্‌-এর কথাই মেনে নিচ্ছেন যে স্টেট শ্রেণীস্বার্থরক্ষার যন্ত্র মাত্র, রাষ্ট্রশক্তি লুপ্ত ক'রে দিয়ে সমাজকেই সর্বেসর্বা করাতে মানুষের কল্যাণ এ-মত তিনি বার-বার অকুণ্ঠে প্রচার করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর আদিম মনুষ্যসমাজ ছাড়া সকল সমাজেই তো রাষ্ট্রশক্তিই চরম, প্রাচীন ভারতে কি চীনেও তা-ই ছিলো, এমনকি ব্রাহ্মণের শক্তিও যে তাঁর জ্ঞানে কি ধর্মপালনে নয়, রাষ্ট্রশক্তিতে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতিকে হাতের মুঠোয় রাখবার কূটনীতিতে এ-বিষয়ে মহাভারত পড়লে সন্দেহ থাকে না। মানুষে-মানুষে অবস্থার অসাম্য দূর হ'লে তবেই যে রাষ্ট্রশক্তি 'শুকিয়ে' যাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সেদিক দিয়ে না গিয়ে বরং অবস্থার অসাম্যকেই যে 'অবশ্যম্ভাবী' ব'লে গ্রহণ করলো, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে তাঁর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের নয়, খেয়ালি শিল্পীর। "জন চীনেম্যান"র মতো তিনিও ধনতন্ত্রের অরাজকতা সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হ'য়েও তা থেকে মুক্তি খুঁজলেন যে-পথে তা ইতিহাসের প্রতিকূল যখন তিনি বলেন, 'ইংলণ্ডকে যখন আমরা ধনী বলি তখন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। য়ুরোপকে যখন আমরা স্বাধীন বলি, তখন তাহার বিপুল জনসাধারণের দুঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেখানে উপরের কয়েকজন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েকজন লোকই পাশবিকতা হইতে মুক্ত,' তখন

তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু তার পরেই তিনি যখন বলেন, 'এই উপরের কয়েকজন লোক যতক্ষণ নিম্নের বহুতর লোককে সুখস্বাস্থ্য জ্ঞানধর্ম দিবার জন্য সর্বদা নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ ও নিজের সুখকে নিয়মিত করে, ততক্ষণ সেই সভ্যসমাজের কোনো ভয় নাই', তখনই গান্ধির বাণী 'the rich are the trustees of the poor,' মনে প'ড়ে গিয়ে মন মুষড়ে পড়ে। ধনী-দরিদ্রের ভেদ যদি থাকেই তাহ'লে হয়তো এ-ব্যবস্থাই মন্দের ভালো, কিন্তু ধনী-দরিদ্রের ভেদ অবশ্যম্ভাবী, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ এত সহজে মেনে নিলেন কেমন ক'রে? এ ভেদ তো প্রকৃতির কোনো নিয়ম নয়। সব মানুষ গুণে, বুদ্ধিতে কি ক্ষমতায় সমান না হ'লেও হাবা কি পাগল ছাড়া সকলেই সমাজের কোনো-না-কোনো কাজে লাগতে পারে, আর সেই কাজের বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে মনুষ্যোচিত ভরনপোষণে অধিকার সকলেরই সমান। আর তা'ছাড়া, সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে সমান সুযোগ পেলে তবেই বোঝা যাবে সত্যি-সত্যি কার কতখানি গুণ, বুদ্ধি কি ক্ষমতা। উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী প্রভৃতি কথাগুলিও এই কারণে কৃত্রিম। প্রকৃত যোগ্যতার বিচারে কে উচ্চ কে নীচ সুযোগের সমতা না থাকলে তা জানবারই উপায় নেই। আর শ্রেণীবিভক্ত--কি জাতিবিভক্ত—সমাজে সুযোগের সমতা অসম্ভব।

মনে হয়, এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের ঠিক স্বাভাবিক রচনা নয়। একদিকে তখনকার নব্য বঙ্গযুবক, যে বিলেতি বাঁদর সাজাই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করতো, অন্যদিকে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের একটি অংশের গোঁড়ামি, এ দুয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় এই অবৈবিক প্রবন্ধগুলির জন্ম দিয়েছিলো। প্রতিক্রিয়া-প্রসূত রচনায় যে একটি অস্থির বলশালিতা থাকে, এ-প্রবন্ধগুলির ছত্রে-ছত্রেই তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক একটি অংশই জুড়ে রয়েছে। মানুষের মর্যাদা, মানুষের মুক্তির দাবি কত বিচিত্র সুরে ও কী তেজস্বী ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ফুটেছে তা আমরা সকলেই জানি; আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে তাঁর জ্বলন্ত বাণীই বঙ্গভাষীর পক্ষে মনুষ্যধর্মে প্রথম দীক্ষা।

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

'প্রজাপতির নির্বন্ধে' কাহিনীর অংশ অতি ক্ষীণ, এর আগাগোড়াই প্রায় কথোপকথন, সুতরাং একে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমেই কেন একে পুরোপুরি নাটকাকারে লেখেননি তা বোঝা শক্ত, প্রায় সম্পূর্ণ নাটক-টিই তো তাঁর মগজে তৈরি ছিলো, গানগুলি পর্যন্ত। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' আর 'চিরকুমার সভা' যখন বস্তুত একই, তখন এর সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ নাট্যরূপ-প্রাপ্ত 'চিরকুমার সভা' প্রসঙ্গেই করবো।

বুদ্ধদেব বসু

ঝর্না-ছন্দের কাব্য

গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা :—সমর সেন (কবিতা ভবন।
দাম : এক টাকা)

"মাথার উপর আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য-সংস্কৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।" (পৃঃ ১১)

নিয়তিচক্রের আবর্ত্তনধ্বনি সমর সেন-এর কবিতায় শোনা যায়। উদ্ধৃতপদে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত যে তিনি কবি। গ্রহণ লেগেচে। সংসারের ছায়া নাক্ষত্রিক বিশ্বলোক ঘুরে তাঁর কবিতায় এসে ঠেকল। বোঝা যাচ্চে আধুনিক মানস-মুহূর্ত্তের ঘেরে তাঁর রচনা আবিষ্ট। কবি সহজে গ্রহণ করতে পারচেন না। অতৃপ্ত জীবনের মাননিকতা লেখকগোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়, সমস্ত মানবসভ্যতায় আজ বিচিত্র সম্ভবপরতার অন্তরে শান্তি নেই। লোকালয় এবং বৃহৎ সৃষ্টির আকাশ একই সত্তার অন্তর্গত অথচ জোড় মিল্‌চে না—উদ্ধৃত অংশে "তবু" কথাটার মধ্যে দ্বন্দ্ব র'য়ে গেল। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই "গ্রহণে"র কাব্য।

"শান্তি নেই
লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য :ড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন।" (পৃঃ ১৭)

ছায়া করচে "নিঃশব্দ শকুনের দল," নখাগ্রে চিরচে প্রাণকে—এরা কারা? ধনীর লোভ, বুদ্ধিজীবীর ক্ষুদ্র শাণিত ভ্রষ্টতা, বণিকের চক্রান্ত, বাসনার আন্দোলন। বাহিরে ভিতরে কোনো প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। যুগের অভিশাপকে নিষ্পলক চোখে দেখানোর উৎসাহে জীবনের অজেয় শিবিরগুলিকে সমরবাবু ভুলেচেন অথবা যথেষ্ট জায়গা দেন নি। প্রাণের সহজ আনন্দে সেই শক্তির দুর্গ। সেখানে শুধু বিচিত্র আশ্রয় নয়, ঝল্‌মলে অস্ত্র সাজানো; অভাবনীয় অক্ষৌহিনী বেরিয়ে আসচে বাজনা বাজিয়ে। বিচারনিষ্ঠ মনের সঙ্গে প্রাত্যহিক আনন্দ-ক্ষমতাকে কল্পনায় মিলিয়ে দেখানোর কাজ শিল্পীরও। কলকাতার ধোঁয়া-ধরা

বাড়ির ভাড়াটে হয়েও আমরা কবিজনোচিত মুহূর্তের সন্ধান জানি। পাশে ঘেয়ো কুকুরের আর্ত্তনাদ, কর্কশ রাষ্ট্রশক্তির ঔদাসীন্যে পুষ্ট নিরন্ন ভিক্ষুকের দল, চাকরিহীন বাঙালিত্বের পরিবেষ্টন জুড়ে দেওয়া ভালো। অদ্ভুত অসঙ্গতির সংসারকে ব্যক্ত করবার একটা সদুপায় দুটো দিক হাজির করা, তাত্ত্বিক কাঠ-গড়ায় নয়, নিপুণ তুলির ব্যঞ্জনায়। অনুভূতির সূক্ষ্ম মানরক্ষা হয় কী উপায়ে জানি না। কালো-শাদা ছবিগুলিতে আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় আছে কিন্তু শাদার অভাবে কালোর জোর কমেছে "গ্রহণে"র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে এই আমার অনুযোগ। দর্শকের দিক থেকে ক্লান্তির কথা বলছি, সামাজিক কণ্ঠে বলতাম কালো কেন্দ্রকে হানবার সুবিধে হত ম্যাপের রেখা ফুটিয়ে তুললে।

শুধুমাত্র জয়াশা কীর্ত্তন করা মূঢ়তা যেখানে সহুরে এবং গ্রাম্য সংসার দিকে দিকে অচলপক্ষের করায়ত্ত। তুচ্ছ জীবনের দৃশ্য ব্যথিত ঔদাসীন্যে নয়তো সাংঘাতিক রসিকতায় সমরবাবু দেখিয়েছেন। আবর্ত্তনক্ষুব্ধ ইতরতা এবং অন্যায়-মানা আরামে তিনি অভিভূত হননি কিম্বা বাহিরে ব'সে কবিত্ব করেননি। কয়েকটি মূল সুরের অভাব লক্ষ্য করেছি কিন্তু সমরবাবুর "গ্রহণ" কাব্যকে যাঁরা হারের আখ্যা দিয়ে সরিয়ে রেখে অভ্রান্ত বাসিফুলের বন্দনাকে বাহবা দেবেন তাঁরা ভ্রান্ত। রুগ্ন আত্মঘাতী মানুষের ক্ষয় এবং ক্ষতির চরম দশায় "আসন্ন পৃথিবীর" একটা ঘনিমা দেখা দিল। মেঘের গর্জ্জনটা কি নৈতিক পাণ্ডাদের মনঃপূত? কাব্যের পক্ষে জীর্ণ সমাজের বুকে বিদ্যুৎচেরা বিপ্লবের উদয় শুভলক্ষণ।

> "গম্ভীর পাহাড় থেকেদুরন্ত ঝড়এলো:
> প্রবাসী নাবিক নরকে এখনো ঘোরে।" (পৃঃ ১১)

"এখনো" কথাটির মধ্যে অনেকখানি অর্থ গোঁজা রয়েছে। দ্রুত ব্যঞ্জনায় সমর সেন সিদ্ধহস্ত।

> "অন্তিম দূর, খর শব্দ সুর,
> চক্রপথে পৃথিবী ঘোরে আকাশমণ্ডলে,
> মুখে মুখে কী গান কালো হাওয়ায় আসে।" (পৃঃ ১৮)

সৌরসঙ্গীত মানুষ কানে শুনতে চেয়েচে এবং "কালো" হাওয়ার মধ্যে বাস ক'রেই উত্তরের গান বেঁধেচে। "কালো" কথাটা অসতর্ক পাঠককে এড়িয়ে যাবে। অথচ গ্রন্থি বাঁধা ঐখানে। ছন্দ-বিশেষে কয়লা বা চিম্‌নির ধোঁয়াকে আনা যেত, অতি প্রকট বাক্য দূরে রেখেই, যদিচ আন্তর্নাক্ষত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে চিম্‌নির প্রসঙ্গ-মানা আধুনিকতা অনেকের কাছে রসিকতার সামিল। মজার কবিতায় বা প্যারডিতে চলে, খাঁটি কবিতার জাত নষ্ট হবে। তন্ময় মুহূর্ত্তের ঘোরে চৈত্রের স্বচ্ছ আকাশ এবং পাটকল চটকলের কীর্ত্তি, বস্তির শব্দ এবং তারার অশ্রুত নিক্কণ ঘনিষ্ঠ কাব্যরূপে দেখা দিতে পারে তার প্রমাণ পেয়েও অনেকে গ্রহণ করেন না। সমর সেন-এর কবিতায় নমুনা মিলবে।

আধুনিক কাব্যের আভিজাত্য নিহিতার্থের গভীরতায়। আবেগের বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত উক্তি আত্মশ্রদ্ধার পরিচয় না হতেও পারে। যাঁরা সংহত, এমন কি যেন অনিচ্ছিত প্রকাশকে হৃদয়বৃত্তির অভাব ব'লে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করব না। যুদ্ধ মর্ম্মান্তিক সংবাদ রিপোর্টিং-এর মতো শোনাতে পারে কিন্তু শুষ্ক কথার ঈষৎ আভাসে সমগ্র জাতির বুক ফাটে। প্রাত্যহিক জীবনেও কথার মূল্য দিয়ে থাকি পরিমাণ ওজন ক'রে নয় এবং ঝঙ্কার না গুণেই—এমন কি, হৃদয়-সংঘটিত ব্যাপারে। চরম উপলব্ধির বাহন হয়েচে মন্ত্র, মহাকাব্যের চেয়ে তার জোর কম নয়। অন্যরকমের। আধুনিক কাব্যে বৈজ্ঞানিক সঙ্কেত, মন্ত্রের ইঙ্গিত, একান্ত ক্ষণের দুটো কথা দিয়ে বল্‌বার চেষ্টা কৌশলের জন্যেই নয়, নিবিড়তার তাগিদে। সব জায়গায় আধুনিকেরা পেরেচেন তা নয়, অনেকস্থলেই পারেন নি, কিন্তু কুণ্ঠিত বাক্য যেখানে বিদীর্ণ বুকের সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে অতি-সংগতিকেও পাঠক ক্ষমা করবেন। মর্ম্মান্তিক ঠাট্টার হাসিও এই পর্য্যায়ে পড়ে—গীতিকবিতায় তার পরিচয় পাওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করলে কাব্যরসিক ঠকবেন।

বলা বাহুল্য কাব্য একরকম নয়। অলঙ্করণ প্রসাধনের চমকে ললিতকলার বিকাশ আমরা দেখেচি। কথার ইন্দ্রজাল বুনে আসল কথার ঔৎসুক্য বাড়ানো কাব্যরীতির অন্তর্গত। সযত্নরচিত এলোমেলো চিঠির ছাঁদে গীতিকবিতা রচ্‌তে

বাধা কী? এখানে কাব্যের বিশেষ একটি উৎকর্ষধারাই আলোচাবিষয়। একথাও বল্‌ব মনের এবং আঙ্গিকের ধরণ বদ্‌লায়—একালে হয়তো আমরা পরিচ্ছন্ন স্বল্পভাষের পক্ষপাতী। হিতাহিতের কথা উঠচে না : জীবনযাত্রার পদক্ষেপ দ্রুততর, ট্রেন ধরতে হয় মিনিট গুণে, বাড়ি গাড়ির স্ট্রীম-লাইন খরচও কমায় চোখেও ভালো লাগে, ইত্যাদি। রেডিয়ো-টেলিফোনের যুগে কথার দায়িত্ব বেড়েচে—রক্ষা হয়েচে কিনা বল্‌চি না—কাগজী লেখারও শ্রেষ্ঠত্ব দুকথায় দশ কথার কাজ সারা। সাহিত্যশিল্প চতুর্দ্দিকের প্রভাবমুক্ত নয়। সংহতির তাগিদে বিনোদনপর্ব্ব যদি শেষ হয়ে থাকে সেটা সাংঘাতিক খবর, আশা করা যাক্ পত্রে পল্লবে ঝিনুকের গায়ে মানুষের কথায়—এবং কবিতায়—দস্তুরমতো দরবারী সুরটা এমনকি প্রলাপের বর্ণচ্ছটাও থেকে যাবে। মনোরঞ্জনের নূতন সুরও দেখা দেয়—সাম্প্রতিক কাব্যে যাদের মন ভুলেচে তারাই জানে।

ঝর্নাছন্দের বিপদ সহজেই কথা এলিয়ে পড়ে। এইখানে তার ইমান নষ্ট কেননা দৃঢ়তার বিশেষ দাবী তার আঙ্গিকে। প্রচলিত ছন্দ এবং মিল পরিহার ক'রে তার ঝোঁকটা পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। ঝর্নাকাব্য বিচিত্ররূপী—রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখি দুরকম নয় বহুশ্রেণীয় উৎকর্ষের চূড়ান্ত—কিন্তু সাধারণভাবে বলা চলে ঝর্নাছন্দে স্মরণীয়তা এবং পরিমিতির মাধুর্য্য আন্‌তে হয় সুযৌক্তিক সুঠাম বাক্যের গাঁথুনিতে। কারিগরির বিশেষ আইন এই জাতীয় শিল্পকে মান্‌তে হবে। পরিমাণের স্বল্পতা এবং উপমা অলঙ্কারের ঘনিষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ নিয়ে ঝর্নাছান্দসিক কাব্যের একটি মহল গ'ড়ে উঠল। বাংলা কবিতায় তার পরিচয় পাই—সমর বাবুর "গ্রহণ" তার অন্তর্গত।

আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে ঝর্নাছন্দ এসেছিল হুইটম্যান্ প্রবর্ত্তিত বন্যাছন্দের প্রতিক্রিয়ারূপে—যদিও মার্কিন কবিকে প্রেরণার মূল্য আধুনিকেরা দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রধান আপত্তি ছিল ছন্দে-গাঁথা মিলান্ত ভিক্টোরীয় বাক্‌বাহুল্যের প্রচলনে। ছন্দের মিলের এবং ভিড়-করা উপমার ক্ষুধা মেটাতে বিস্তর জায়গা লাগ্‌ত। কাব্যিক সংস্কারের দাবী নিয়ে বক্তব্যের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত—প্রথাগত ছন্দ-বংশীয়ের দল। ঝঙ্কৃত বাচনিকতায় ফাঁপা ভাবকে অনন্তের

রূপ দেবার বিদ্যা সংসারে পাকা হয়েছিল, আচ্ছন্ন পাঠকের মন সম্ভ্রমে অসতর্ক হয়ে থাকৃত। ঘননিবিষ্ট পরিসরের মধ্যে কেন্দ্রিক তন্ময়তা জাগানোর শিল্প অন্য পর্য্যায়ের, পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে, কিন্তু গত বড়ো যুদ্ধের আগেই ইংরেজ কাব্যে তার দিকে মন ঝুঁকল। ঝর্নাছন্দের লীরিকে এই টেক্‌নীকের সাধনা চলেচে। ওঁরা ভাবলেন সাহিত্যিক আসর হতে কথা-ছাঁটাই আইন জারি ক'রে অন্ততপক্ষে কাঁচা লেখকগুলিকে চেতিয়ে তুল্‌বেন। পদের অন্তস্থ মিল বর্জ্জন ক'রে মিলের বিন্যাস দেখাও। স্রোতবৃদ্ধির জন্যে টেম্‌স্‌-এর জল না ঢেলে স্রোতটাকেই বেগবান করো। যেমন, যেন, মতো, সেইমতো, মনে হয় যেন, তেমনই ইত্যাদি কথা (এর ইংরেজি প্রতিশব্দ) যথাসম্ভব কমিয়ে, এমন কি, বর্জ্জন ক'রে উপমার অব্যবহিতা রক্ষা হোক্‌। যেখানে জোরালো একটি উপমায় চলে, একই স্থানে হৃদয়কে অরণ্য সমুদ্র এবং মরুভূমি বল্‌লে পাঠকের হৃদয়ের দিক থেকে লাভ নেই। লাইন বিভাগ সম্বন্ধে কানের সূক্ষ্ম মাত্রাবোধই শ্রেষ্ঠ বিচারক, অভ্যাসমুক্ত কান। উপক্রমণিকা এবং পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে সোজা আরম্ভ করো এবং নির্ভয়ে থামো। "আমি" ব্যক্তিটিকে আড়ালে রাখা ভালো; খুসি হয়েচি কি হইনি না ব'লে অবস্থাটার ভিতর থেকে বলো, আমরা বুঝে নেব। চাঁদের আলোর ছবিতে চাঁদা মামাকে প্রকাণ্ড ক'রে না-ই দেখালে, এতটুকু দৃশ্যে জ্যোৎস্না গাঢ় হোক্‌। সংস্কারের প্রতিষ্ঠা রইল বাক্যের আবহাওয়ায়—প্রচ্ছন্ন সংস্কারে—দলিলসুদ্ধ উপস্থিত করা পণ্ডশ্রম। উল্লেখ, ব্যঞ্জনা, প্রাসঙ্গিক শব্দের ইঙ্গিত রচনা করো। সায়ান্স যেখানে বিশ্বরহস্য জাগাবার কথা জুগিয়েচে, নূতন প্রতিষ্ঠিত শব্দ ব্যবহার্য্য। অনুভূতি এবং আঙ্গিকের যুগসম্মত নবীনতা পরিত্যাজ্য নয়, গ্রহণীয়। মনে পড়চে না আরো কত অনুশাসন ছিল, ভাবার্থ দেওয়া গেল। দেখা যাচ্চে আধুনিক সংহতির আদর্শ শুধু কায়িক নয়, মনোধর্ম্মী।

আইন-জারি ক'রে কাব্য হয় না। কারুকৌশল্য হারিয়ে ঝর্নাছান্দসিকের দল শিথিলবাক্যে ফিরে এলেন। মিল-বর্জ্জনটাই রইল সঙ্কল্পের চিহ্নস্বরূপ; চার পাতা ধ'রে পা ছড়িয়ে এলোমেলো কথা বল্‌বার বিলাস আধুনিক সংস্করণে দেখা

দিল। উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন, দন্ত সম্বন্ধে হাল ছেড়েও নিজেরা ছাড়লেন না। নূতন সচেতনার ফলে যাঁরা টিকে গেলেন তাঁদের দুএকজন আজ য়ুরোপীয় সাহিত্যে অগ্রণী। য়েট্‌স্ ঝর্নাছন্দে নামেন নি, ছন্দমিলের মধ্যেই রচনা সংস্কৃত করলেন। আশ্চর্য্য ঘন দৃঢ়তা তাঁর শেষ লেখায় দেখা দিল।

সমরবাবুর লেখায় পরিচ্ছন্নতার আদর্শ লক্ষ্য করেছি। অনন্যতার সাধনায় ভাবের মূল সূত্র অদৃশ্যপ্রায় হয়েচে, সংশ্লিষ্ট বাক্যের তির্য্যকভঙ্গী ইসারায় কথা না ব'লে জটিলতার সৃষ্টি করেচে তারও প্রমাণ আছে। উগ্র উপমা যেখানে মনকে প্রতিহত করেচে, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে মেলেনি তাকে মানব কেন—অবশ্য পাঠকের মনেও ব্যক্তিগত বাধা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বিচারকের আসনে ব'সে ত্রুটির তালিকা বার করবার অধিকার বা শক্তি আমাদের অনেকেরই নেই যেহেতু দেশ এবং কালের দ্রুত ধারায় আবর্ত্তিত হয়ে কূলের সন্ধান পাইনি। সমসাময়িক কবিত্বের সন্ধান পেলে সেইটে পরম লাভ। সেই পরম লাভের খোরাক "গ্রহণ" এ ছড়ানো।

> "জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন,
> আশেপাশে ব্যর্থতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।" (পৃঃ ৬)

এতে প্রায় কেউ আপত্তি করবেন না। এমন কি, "জীবিকা" কথাটায় কবিত্বের স্বাদই পাবেন।

> "আজ বহুদিনের তৃষার স্তব্ধতার পর
> পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।
> তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
> বর্ষার সিক্ত পশুর মত স্তব্ধ বসে
> বক্রদেহ নায়কের দল।" (পৃঃ ১৬)

ঠিক উৎরেচে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু ইঙ্গিতগুলি ভঙ্গীকে অতিক্রম ক'রে, কখনো বা ভঙ্গীকে বাহন করেই, পৌঁচেচে। উল্লেখের নিপুণতা উপভোগ্য—আধুনিক কাব্যে উল্লেখের পনেরো আনাই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কেননা তাঁর সৃষ্টি আমাদের মানসিক, এমন কি যেন দৈবিক সত্তার অন্তর্গত।

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৭

"সহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য,
বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শৃগাল, কোকিল ডাকে।" (পৃঃ ৭)

এই ছবিতে কারো বাধবে না, শেয়াল-কোকিলের সমবায় লাল সন্ধ্যায় মিলেচে।

"দীর্ঘদিনে কঙ্কালরে রুদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ির ছায়ার পিছনে
স্খলিতগতি ক্লান্ত কুকুর ঘোরে।" (পৃঃ ৭)

এটাও বাধা উচিত নয়, ছায়া আলোর সংঘাতে শুকনো কঙ্কালের রস আছে, যেমন খেজুর গাছে।

"ধাবমান কাল
ট্রেনের লৌহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ।" (পৃঃ ৮)

আধুনিক কাব্যে এর চেয়ে নিবিড় এবং নিখুঁত উপমার ব্যবহার জানিনা। অনেকগুলি ভাব এবং ছবি একীভূত হয়েছে সন্ধিক্ষণে—জ্বলে উঠেচে। চলন্ত মহাকালের প্রসঙ্গ আনল লোহিত-হলুদ চাঁদ; তাতে প্রাচীন অথচ শঙ্কিত আশার ভাব জড়ানো; পৃথিবীর অন্ধকারে জ্বলচে ইস্পাতী রেখা মর্ত্ত্য লোচনের। "আজো আনে" কথা দুটিতে কালের নির্ব্যক্তিকতা অথচ ঔদাসীন্য ছাপিয়ে সংসার সম্বন্ধে একটি প্রতীক্ষা রয়ে গেল। আসন্নতার ইসারায় রেলোয়ে লাইন মিশেচে—যে-কোনো মুহূর্ত্তে ট্রেন আসতে পারে। অথচ এক আঁচড়ের টান।

"বসন্ত" নামক পাঁচ লাইনের কবিতাটি উদ্ধৃত করি :—

"বসন্তের বজ্রধ্বনি অশ্রুত পাহাড়ে
আজ বর্ষশেষে
নির্জন মরুভূমির প্রান্ত হ'তে
ক্লান্ত চোখে ধানের সবুজ স্বপ্নরেখা দেখি
সুদূর প্রান্তরে।" (পৃঃ ১৬)

সুন্দর ছবি কিন্তু শুধু জাপানী অর্থে নয়। "বসন্তের বজ্রধ্বনি" এবং "অদৃশ্য পাহাড়ে"র মর্মে ঢুকলে ছবিটা গভীরতর সুন্দর হয়ে দেখা দেবে। একদিকে "পিঙ্গল মরুভূমি" "ক্লান্ত চোখ" "বর্ষশেষ", অন্যদিকে "ধানের সবুজ অগ্নিরেখা" "বসন্তের বজ্রধ্বনি"—সংক্ষিপ্ত কটি কথায় এতখানি ধরল। ধরা সম্ভব হল তার একটি কারণ রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" এবং অন্য কবিতার সংস্কার আমাদের মনে-জমা আছে—বেশি বলার দরকার ছিল না। (অন্য কবিতায় একটি লাইন আছে "নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা"—কালীপ্রসন্ন সিংহের লাইনটা মনে পড়বে। তা ছাড়া "তাজমহল" কবিতা পড়া থাকলে এর মধ্যে পাঠক আরো অনেকখানি পাবেন। সমরবাবু জানেন আমরা "তাজমহল" পড়েছি, না পড়ে থাকলে দায়িত্ব আমাদের। "শুধু" কথাটা স্মারক।)

> "গম্ভীর শব্দে সহরের উপরে আকাশ কাঁপে
> নিচে বিবর্ণ বস্তি
> আর হলুদ ঘাসের মাঠ
>
> *   *   *
>
> মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।" (পৃঃ ১)

অথবা

> "নরকের ধিক্কারের পর
> দিনশেষের নিমেষের সোনার ঝঙ্কারে
> নীল প্রশান্তি শূন্যে ডানা মেলে
> রক্তসন্ধ্যায়।" (পৃঃ ৩৩)

ছবির পরে ছবি। ধরণটায় নূতন চেতনা আছে এবং নিজস্ব খনির সন্ধান। "যাত্রা" নামক কবিতাটি চার লাইনের—

> "একচর সূর্য গেল চলে
> রাত্রে মরুভূমিতে শিশির ঝরে,
> পৃথিবীর সীমান্তে দেখি যাযাবর নক্ষত্রের
> এক রাত্রির নীড়।" (পৃঃ ৩১)

স্নিগ্ধ রাত্রে মরুভূমির বক্ষে নয় ঊর্দ্ধে আকাশযাত্রীর কারাভান।

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

মিলের বিন্যাসের কথা বলেচি : কিছু পরিচয় মিলবে "গ্রহণ" নামক কবিতায়।

"দীর্ঘ দিন গ্রীষ্মের পিচে কেঁপে
সন্ধ্যায় শূন্যগর্ভ, খাদ্যহীন।
কিসের আগ্রহে আদিম আকাশ
নিঃশব্দে নেমে আসে
শ্বাসরোধ করে"………(পৃঃ ২৯)

উপভোগ্য। মিলের পাশে এসে ছেড়ে দেওয়া শক্ত। কলম ধরলেই আজ ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি মিল আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছামতো তাদের রাখা ঢাকা এবং প্রচ্ছন্ন পরিচয় দেবার সজাগ কারিগরি দরকার হয়েচে। তৎসত্ত্বেও আশা করচি সমরবাবু লাইনের শেষে মিল বা অর্দ্ধমিল পরীক্ষা করে দেখবেন।

সূক্ষ্ম বুদ্ধিজাত রসিকতাকে কবিত্বে পরিণত করার শক্তি সমরবাবু নানা জায়গায় দেখিয়েচেন। পশ্চিমী গীতিকাব্যে তার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দিয়েচে।

(ক) "ছিন্নভিন্ন সময়ের জালে
বন্যার জলে মাছধরা।" (পৃঃ ৩১)

(খ) "বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা।"(পৃঃ ১০)

(ক) রসাত্মক এবং (খ) শ্লেষাত্মক নমুনা। অথচ কবিত্বে গ্রথিত। এরকম দৃষ্টান্ত "গ্রহণ"-এ খুব বেশি নেই, কেননা রসিকতার মাত্রা রেখে গীতিকাব্য রচনা করা সহজ নয়। বিদ্রূপের প্রহরণ ব্যবহার করতে গিয়ে সমরবাবু শেষটায় গদা-হাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নেমেচেন তার প্রমাণ আছে, ফ্যাসিজম্-কে মারতে গিয়ে যেমন ফ্যাসিস্ট হয়। কিন্তু সমস্ত ভাঙ্-চুর ঘৃণ্যতা অতিক্রম ক'রে "গ্রহণ"-এর শাঁখ বেজেচে, সেখানে গদা বা প্রহরণের কথাই ওঠে না।

"তবু জানি
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।" (পৃঃ ৫)

সাধারণভাবে কথাটা বলেই সমরবাবু ছাড়েন নি। তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টি পড়ল মর্ত্ত্য সম্ভাবনায় ; দেখা দেবে

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

> "হয়ত অনেক যন্ত্রণার প'র
> নগর স্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
> এক শ্রেণীহীন সাম্যরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী" (পৃঃ২৪)

বলা বাহুল্য এটা গ্রহণের পরবর্ত্তী অবস্থা। ছায়ার সংগ্রাম কেটেচে, কিম্বা আর্মিস্টিস্, কেননা

> "তবু কিছুদূরে প্রখর রৌদ্রে ঘোরে
> মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত..." (পৃঃ ৪)

আধুনিক কাব্য কী বলতে চেষ্টা করচে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের বক্তব্য যদি ফুরিয়ে থাকে তাহলে আরম্ভ করেচি কেন? সৃষ্টিরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিন্তু ভাবের এবং টেক্‌নীকের বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলার নূতন সাহিত্যে একটি বিচিত্রমুখী উদ্যম দেখা দিয়েচে না স্বীকার ক'রে উপায় কী?

> "আবার দিকে দিকে যুগান্তরের ডম্বরু বাজায়
> উদ্যত জীবন্ত পৃথিবী।" (পৃঃ ২)

নূতন কবি এই ব'লেই আরম্ভ করেন।

অমিয় চক্রবর্ত্তী

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

অনেকদিন পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরুল: সেজন্য কবির কাছে বাঙ্গালী পাঠকরা কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি লেখেন কম এবং বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে তাঁর কবিতা. চোখে পড়ে। "প্রথমা"র অনুরাগীরা অনেকদিন ধরে এই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলির সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। "প্রথমা"র অনুরাগী বলতে অবশ্য বাঙ্গালী পাঠকদের একটা বিশেষ গোষ্ঠী বোঝায় না, যেটা হয়ত আধুনিক কবির কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সহজেই বোঝাতে পারে। কারণ, আধুনিক কবিতার অনুরাগীদের সংখ্যা যদিও নগণ্য, তবুও তাঁদের কাব্যানুমোদন প্রায়ই গোষ্ঠীগত—এবং এক গোষ্ঠীর কাছে আর এক গোষ্ঠীর কবিতা অনেক সময় শুধু বিজাতীয় নয়, বর্বর। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বোধ হয় এ মনোভাবের একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি "আধুনিক" অথচ তাঁর ভক্ত সংখ্যা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর কবিতা সর্বজনপ্রিয়। এমন কি ভাবের বা কালের দিক থেকে যাঁদের "আধুনিক". আখ্যা দেওয়া হয় না, তাঁরাও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি বিদ্বেষী ত' ননই, অনেকেই পক্ষপাতী। ফলে আধুনিকদের মধ্যে বরাবর তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে এসেছেন; অন্যান্য আধুনিকদের মত তিনি বহু পাঠক ও সমালোচকের বিরাগ বা কটুব্যঙ্গভাজন হন নি।

ভাবের দিক থেকে এর কারণ বোধ হয় পীড়িতদের সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবজ সহানুভূতি এবং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর নিজস্ব কমনীয় ও ভাবালু ছন্দ—যা পুরাতনকে অস্বীকারও করে না, মানেও না পুরোপুরি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রথমা" সম্বন্ধে এ মন্তব্য খুবই স্পষ্ট। "প্রথমা" মোটের উপরে রবীন্দ্রঐতিহ্য সরল অথচ নিজস্বভাবে বহন করে। রবীন্দ্রনাথে যে মানবধর্মে বিশ্বাস পাওয়া যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র "প্রথমা"য় তার যোগসূত্র মেনে চলেছেন যেন।

* সম্রাট: প্রেমেন্দ্র মিত্র। ডি, এম, লাইব্রেরি, ১।৹

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

অগ্নিআখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই!
দুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই!
পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে আকাশের সীমা নাই
ঘরের দেয়াল তাই কেটে চৌচির;
প্রভঞ্জনের বিজলী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।

(প্রথমা)

পীড়িতদের সম্বন্ধে তাঁর সরল সহানুভূতি আরও স্পষ্ট হয়েছে—

আমি কবি কত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি কত ইতরের।"

(প্রথমা)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মানব ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল বণিক সভ্যতার সূত্রপাতের ছায়া তাতে চোখে পড়ে, কারণ এ মানবধর্ম্ম আভিজাতিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর—ফ্রান্সিস্ বেকনের মত। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর পারিপার্শ্বিকে ক্ষয়ের সূচনা দেখেছেন, তাই প্রশান্ত আভিজাতিক ভাব তাঁর মানবধর্ম্মে খোঁজা নিষ্ফল। তাছাড়া, "প্রথমা" প্রকাশিত হয় ১৯৩২এ—অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন যখন চরমে পৌঁচেছে, এবং ক্রমশ: জনআন্দোলনে রূপ নেবার চেষ্টা করছে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেকেও পীড়িতদের মধ্যে একজন বলে জানালেন; এবং "প্রথমা"য় নজরুল-এর ঢং আসবারও কারণ বোধ হয় এই।

"মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়!
মাল বয়ে বয়ে খাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির

কবিতা
বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৩

আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়।"

(প্রথমা)

*　*　*

এ পর্য্যন্ত "প্রথমার" আলোচনাই হ'ল। তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশিত হ'ল আজ আট বছর পরে। এবং ইতিমধ্যের বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস মনে না রাখলে "প্রথমা" ও "সম্রাটে"র ব্যবধান খুবই অদ্ভুত মনে হবে—প্রসঙ্গ ও ভঙ্গি দু'দিক থেকেই। কারণ বলিষ্ঠ ও ব্যক্ত মানবধর্ম্মে যে বিশ্বাস "প্রথমা"য় পাওয়া গিয়েছিল এবং ছন্দের যে নজরুলী ঢং ছিল সেখানে, "সম্রাটে"র পৃষ্ঠায় তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র আছে। "সম্রাটে"র কবি পলাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিতন্ত্র্যবিশ্বাসী এবং ছন্দের দিকে অনেক সময় তিনি পথ খুঁজলেন কথার নিপুণ কারুকার্য্যে, অনেক সময়েই প্রচলিত পথ দিয়ে চলতে চাইলেন না।

"প্রথমা" প্রকাশিত হয় ১৯৩২এ: বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ এটা। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্তে পৌঁচেছে এবং তার গণআন্দোলনে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর সহসা-নির্দ্দেশে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, অন্তত তার পেছন থেকে জনশক্তি সরিয়ে নেওয়া হ'ল। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ সরে আসতে সম্মত হ'ল না এবং যে সন্ত্রাসবাদের বীজ ছিল দেশে, হঠাৎ তা যেন আবার চারদিকে ফেটে পড়ল। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক না, এটা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মোটের উপর জনগণের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাজনীতিতে এল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও এই দৃষ্টিপরিবর্ত্তনের লক্ষণ চোখে পড়ে। অবশ্য

তিনি হয়ত সন্ত্রাসবাদকে স্বীকার করেন না, বা করলেও তার রাজনৈতিক মূল্যে অনুপ্রাণিত হ'তে পারেন নি। তাই তাঁর দৃষ্টিপরিবর্ত্তন রূপ নিল "প্রথমা"য় মানবধর্মের বিকাশ থেকে "সম্রাটে"র পলাতক মনোভাবে এবং ছন্দেরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটল যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ। এবং মানবধর্ম্মের যে প্রতিধ্বনি রয়ে গেল তা অনেকটাই শিথিল। অত বড় একটা আন্দোলন হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যে কবির ভাব ও আবেগ সেই আন্দোলনপ্রসূত তাঁর প্রথম প্রেরণা ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়া বিস্ময়ের নয়—"প্রথমা"র সাবলীল শক্তি "সম্রাটে"র অধিকাংশ কবিতাতেই অনুপস্থিত।

"তারপর মন্বন্তর শেষে
জ্যোতিষ্মান অবতার
দেখা দেবে কি নতুন বেশে,
—তারই ছবি,
ভাবে বসে অভিশপ্ত মানুষের কবি।" (সম্রাট।)

অবশ্য প্রত্যেক কবিরই কাব্যশক্তিতে সাময়িকভাবে ভাঁটা আসে। তাতে শঙ্কিত হবার বিশেষ কারণ নেই, কিন্তু "সম্রাট" পড়ার পর উপরোক্ত সাময়িক কারণ ছাড়াও কয়েকটি কথা পাঠকের মনে আসে। এ ক'বছরের মধ্যে বাঙালী সমাজমনের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে গেল; তার রাজনৈতিক মূল্যে বাঙালী বিশ্বাস হারাল। যে সহজ মানবধর্ম্মী বিশ্বাস প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায় ছিল তা আজ যথেষ্ট বলে বিবেচিত নয়। মানবধর্ম্মে বিশ্বাস আজ বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও নানাবিধ বিড়ম্বনায় মধ্যবিত্ত কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে, কাব্যে ও জীবনে মুক্তি ও প্রগতির পন্থা তাঁদের কাছে অন্যরকম।

অথচ প্রেমেন্দ্রবাবু কবিতায় বাধাপ্রাপ্ত বিরাট জনআন্দোলনের ও তৎপ্রসূত ব্যষ্টিভাবাপন্ন সন্ত্রাসবাদের ভাবধারা কাটিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁর কবিতায় তাই দেখা দিল চূড়ান্ত পলাতকভাব। তাঁর পারিপার্শ্বিক মূল্যহীন, তিনি তা

বোঝেন—সেখানে আশা নেই, উপায় নেই। তাই কখনো তাঁর তৃপ্তি নিছক নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনতে: টুকরো এলোমেলো বস্তুর যে কল্পিত আনন্দ তাতেই তিনি চাইলেন সান্ত্বনা। এবং এই সংকীর্ণ পরিস্থিতি যখন শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে তখনি তিনি আশা ও আনন্দ খোঁজেন কল্পনার বিস্তীর্ণ পক্ষবিস্তারে। উক্ত দুই মনোভাবের প্রথমটির উদাহরণ নেওয়া যায়—

"কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকুটি;
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ"
(সম্রাট: তামাসা)

কিম্বা,

"জানালা রুধিয়া দাও,
জাহাজ ডাকিয়া যাক
সুদূর বন্দরে।
দিগন্ত পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এস খুঁজি দুজনার চোখে।
(সম্রাট: জাহাজের ডাক)

কিম্বা.

ছাদে বেও নাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়
সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

কবিতা
বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জান্‌লা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘ'সে,
শুনি নগরের মৃদুগুঞ্জন, লাগিবে ভালো।
(সম্রাট : ছাদে বেওয়াক।)

এবং দ্বিতীয় মনোভাবের উদাহরণ :

"স্বপ্ন দেখি সে পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামীকালের পানে :—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি।"
(সম্রাট : পথ)

কিম্বা,

"হে-ইডি, হাইডি, হাই।
অরণ্য ডাকে ওই, যাই।
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!
হে-ইডি, হাইডি, যাই!
বনপথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরো বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহ ত মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হেইডি হাইডি হাই!"
(সম্রাট : নীলকণ্ঠ)

এ কথা ঠিক যে আধুনিক সমাজবোধসম্পন্ন পাঠকের কাছে প্রেমেন্দ্র বাবুর মনোভাবের সমর্থন পাওয়া কঠিন। তাঁদের কাছে "সম্রাটে"র হতাশা কিম্বা আশা কেমন যেন ভাসা-ভাসা, শূন্যজীবী বলে ঠেকবে। মনে হবে কোনো

বিশিষ্ট কেন্দ্রে তাঁর ব্যর্থতাবোধ দানা বাঁধে নি। আইন-অমান্যের মধ্যে যে জনআন্দোলনএর আভাস ছিল তা অবশ্য আর নেই, এবং যে কবি তখন সে আন্দোলনে আশা পেয়েছিলেন তাঁর পক্ষে হতাশা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের সমাজে প্রকৃত জনআন্দোলন দেখা দিচ্ছে—অনেক বলিষ্ঠ ও অনেক তীব্র তার রূপ। ফলে হতাশা এবং আনুষঙ্গিক ব্যষ্টিকেন্দ্রে বা পলাতক-ভাবে সান্ত্বনা কবির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ত নয়ই।

অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা বলতে চাইনে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ ধরণের কবিতাগুলির সার্থকতা কম। বস্তুত "তামাসা", "নীলকণ্ঠ" ইত্যাদি কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। যদিও "সঞ্চারীরসে"র সৃষ্টিতে এগুলির পরিসমাপ্তি, এবং যদিও ভবিষ্যতের কর্ম্মঠ যুবক হয়ত কল্পনাকে বাদ দেবার চেষ্টা করবে, তবুও এ রস প্রেমেন্দ্রবাবুর হাতে এত ঘন উপাদেয় হয়ে উঠেছে যে আধুনিক পাঠকমাত্রই তা থেকে প্রচুর আনন্দ পাবেন। তাছাড়া একদিক থেকে ত সব রসই সঞ্চারী রস, কারণ সব রসই সমসাময়িক সমাজ প্রসূত।

প্রেমেন্দ্রবাবুর কল্পনার স্বচ্ছন্দ গতি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। খোরাসান, বাদক্‌সার্নের হারান পথ থেকে আফ্রিকার "অরণ্য-চোঁয়ান ঝাপসা আলো" আমাদের সামনে যেন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এবং এসব কবিতাতে স্থানীয় রং দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

"সম্রাটে"র শেষাংশে লরেন্সএর কয়েকটি অনুবাদ আছে। লরেন্সের গদ্য কবিতায় সংহতি ছিল না। সেজন্য বাংলা অনুবাদে আরো কেন্দ্রচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। ও বিপদ বর্ত্তমান সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্রবাবু দুয়েকটি কবিতার অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সমর সেন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নতুন বই

ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ১॥০, ২৲।

মহৎ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কৌতূহল রবীন্দ্রনাথের সমর্থন কখনোই পায়নি। 'চারিত্রপূজা' থেকে 'যাত্রী' পর্যন্ত নানা জায়গায় এই ঝোঁকটিকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, গোর্কী-প্রণীত টলস্টয়ের জীবনচরিত তাঁর ভালো লাগেনি। নিজে তিনি 'ছিন্নপত্র', 'জীবনস্মৃতি' লিখেছেন, যখন পৃথিবীর যে-অংশে গিয়েছেন, লিখেছেন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কিন্তু তাঁর মতে প্রগল্‌ভ এই কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেননি কোনোদিন। তাঁর এই গদ্যগ্রন্থগুলি সাহিত্যশিল্পের অপরূপ নিদর্শন, তাছাড়া এতে তাঁর মানসজীবনের ইতিহাস দরাজ হাতেই তিনি আমাদের বিলিয়েছেন, রাবীন্দ্রিক সমালোচকের পক্ষে যা অমূল্য। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি যতদূর সম্ভব নীরব; মনের ও মনীষার ক্রমপরিণতির প্রসঙ্গে যেটুকু না বললেই নয়, ঠিক সেটুকুই তিনি বলেছেন, তার বেশি না। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনচরিতকারকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, কবির নিজের বইগুলি সাহায্য করবে অল্পই।

'ছেলেবেলা' বইটি এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। 'জীবনস্মৃতি' লেখবার আটাশ বছর পরে কবি আবার পিছনে ফিরে তাকালেন। দু'-ঘণ্টায়-পড়বার মতো, আশ্চর্য সরল বাংলায় লেখা এই বইটিতে তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবনের কাহিনী আবার আমাদের শোনালেন। বস্তুর দিক দিয়ে 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে কিছু মিলবেই, কিন্তু এর স্বাদ, এর সৌরভ, এর সমস্ত আবহাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা। কবি 'ভূমিকা'য় বলছেন তফাতটা যেন 'সরোবরের সঙ্গে ঝরনার'। 'সে হোলো কাহিনী এ হোলো কাকলী, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।' এ 'জীবনস্মৃতি'র মতো নৈর্ব্যক্তিক নয়, প্রথম কথাটি থেকেই—'আমি জন্ম নিয়ে-

ছিলুম সেকেলে কলকাতায়'—পাঠকের সঙ্গে বন্ধুতা পাতায়, কখনো-কখনো অন্তরঙ্গতার দিকে পর্যন্ত ঝোঁকে। বইটি কোনো প্ল্যানে বাঁধা নয়, এলোমেলো চলন, যখন যেখানে খুসি দেরি করা, পরের কথা আগে এসে গেলো তো গেলোই, অবারিত ছুটির হাওয়া আগাগোড়া বইছে। এতে আছে গল্পের রস, রূপকথার জাদু, আছে তথ্য-তারিখের ভারমুক্ত ইতিহাসের আত্মা। অপূর্ব বই, 'ছেলেবেলা'।

আবার বলছি, বইখানা অপূর্ব। রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যেও এ-বইটি বিশেষ জায়গা পাবে তিনটি কারণে। প্রথম কারণ অবশ্য এই যে কবি এতে ক্ষণকালের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপরকার পরদা আধেক সরিয়ে আমাদের উঁকি দিতে দিয়েছেন—হ'লোই বা তা বালকবয়সের জীবন। দ্বিতীয়ত, বাংলা দেশের নবাবি আমল থেকে ইংরেজ আমলে, কিংবা সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রী বাণিজ্যের যুগে, বদলি হবার উজ্জ্বল ইতিহাস এ-বই। এ-বিষয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এর একমাত্র তুলনা, যদিও রচনাভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথে ও কালীপ্রসন্ন সিংহে কোনোই মিল নেই। তৃতীয় কারণ বইটির ভাষা। ভূমিকায় কবি লিখেছেন যে বইটি ছেলেদের জন্যে 'বালভাষিত গদ্যে' লেখা। তিন বছর আগে প্রকাশিত 'ছড়ার ছবি' এর সঙ্গী, তাতে 'এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে।' 'ছড়ার ছবি' প'ড়ে শিশুরা খুসি হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'ছেলেবেলা'কে শিশুপাঠ্য বই বললে মস্ত ভুল করা হবে। এমন অদ্ভুত সহজ গদ্য বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় এর আগে আর দেখাই যায়নি, কিন্তু এ-গদ্য ঠিক 'বালভাষিত' নয়, বরং বলা যেতে পারে যে এখানে রবীন্দ্রনাথ basic বাংলার প্রবর্ত্তন করেছেন। শক্ত কথা একেবারেই নেই, শক্ত কথার বদলে আছে রবীন্দ্র-প্রতিভার মৌলিক আভা, যা চোখ ধাঁধায়, বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস করে। 'মানে-মুখস্থর বুকধড়াস সন্ধেবেলা', 'ওয়াক-ধরানো ওষুধ'—আর কার কলম থেকে বেরুতে পারতো! কিন্তু এর রস কি শিশুভোগ্য? কথাগুলি সোজা হ'লেও বাক্যবিন্যাসের তির্যক ভঙ্গিতে যে আলো বিচ্ছুরিত, ছেলেদের চোখে তা লাগবে না, বরং বাঁকা কথাগুলোয় পদে-পদে তারা বাধা পাবে। তাছাড়া বইটির উপাদান তো আগা-

গোড়াই সাবালক। এ শিশুর শৈশব নয়, সত্তর বছরের ব্যবধান থেকে দেখা ছেলেবেলা; বয়স্ক মানুষের মনে অতীত চিরকাল যে-রূপকথা রচনা করে, এ তারই একটি উজ্জ্বল পাতা।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম এমন সময়ে ও এমন পরিবারে যে তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন কেটেছে নবাবি আমলের সূর্যাস্তের সোনায়। ইংরেজ ভারতে আনলে নতুন অর্থনীতি, জমিদারের ক্ষমতা কেড়ে নিলো সওদাগর, বর্ণভেদের বদলে এলো শ্রেণীভেদ। ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণের বর্ণনা কালীপ্রসন্নর পাতায়-পাতায় জ্বলন্ত; 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সেই বছরই প্রকাশিত হয়, যে-বছর রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

> 'পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড়-বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌সি, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।'
>
> (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা)

নবযুগে বেনেই হ'লো রাজা, কর্মজগতে লাগলো বিপ্লব, কত বংশগত পেশা বরবাদ হ'য়ে গেলো, ফেঁপে উঠলো কত নতুন পেশা। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর ঠাকুরমার আমলের পাল্কিবেহারারা যাদের 'হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মেরজাই,' তারা 'সূর্য ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে।' 'হুকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।' যে-বুড়ো চুড়িওয়ালা বাড়ির বৌদের 'কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমতো বেলোয়ারি চুড়ি,' আজ সে হয়তো 'সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শা ঠেলে', আর 'সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌ-এর পদ পায়নি, সেকেণ্ড ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে।'

কবিতা

বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭

আধুনিক এই যুগ রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেন না, চিরকালের মতো হারিয়ে-যাওয়া সেকালেই তাঁর মন-প্রাণ বাঁধা। সেকেলে সবই ভালো, একেলে সবই খারাপ, তাঁর এই মনের কথাটি 'ছেলেবেলা'য় লুকোনো থাকেনি; স্পষ্টই বলেছেন, একালের চাল-চলন মোটেও তাঁর পছন্দ নয়। এমন কি যে ইলেকট্রিসিটি পৃথিবীর নব-জন্ম ঘটালো তাকেও তিনি ভালো নজরে দেখেননি।

সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিলো সত্যি,
দিন-ভাঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি। ('ছড়ার ছবি')

'ছেলেবেলা'য় সেই সেকালেই তিনি ফিরেছেন। তিনি যখন ছোটো, তখনো শেয়ালডাকা রাত কলকাতার কোনো-কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নিচে ফুকরে উঠত।...তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালের সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলী আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু বিশ্রাম নেই।'

ছাদের রোমান্স গিয়েছে ঘুচে :

'তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ ঘটেছে একথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা না আছে ভূতপ্রেতের।...অত্যন্ত বেশি লেখা-পড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়।...এদিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নিচের তলায় চারকোণা দেয়ালের প্যাকবাক্সে।'

এখানে বলা দরকার যে ছাদ থাকলে তবে ছাদে ওঠবার কথা ওঠে। একালের কলকাতায় বেশির ভাগ মানুষের বাসা ফ্ল্যাটে কি বাড়ির অংশে—তাদের জীবনে ছাদের অস্তিত্বই নেই।

সুন্দরীরা শুনুন :

'এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রং সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে ক'রে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন

নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরো কত কী...'

সাজের কথাও আছে। উমেশ নামে এক চতুর রেশমের ফালি, নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে বানাতো মেয়েদের জামা,

'মেলে ধরতো মেয়েদের চোখে, বলতো এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারিনে।...আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রংকরা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের শেলাই-করা ঢাকনি-পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।'

মোটের উপর,

'আগেকার কাল ছিল যেন রাজপুত্তুর।...এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর।'

এই এক কথাই লাখ কথার সমান।

তবু মনে রাখতে হবে যে এই ঠাকুরবাড়িই বাঙালির একেলিয়ানার উৎস। বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতিতে যা-কিছু ভালো তা ঐ একটি বাড়ি থেকেই একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সে-বিপ্লবের নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী দাদারা। অন্দর মহলের পরদা তাঁরাই প্রথম ঘোচালেন, মেয়েদের প্রথম শিক্ষা দিলেন তাঁরা, সত্যেন্দ্রনাথ রাস্তা-ভরা হাঁ-করা লোকের চোখের সামনে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন বোম্বাই; হেমেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাকে ক'রে তুললেন বিলিতি গানে পাকা, এদিকে খেয়ালে ওস্তাদ; বেথুন ইস্কুলের প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী; জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতেন

চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে; তাছাড়া 'এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারি প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন।'

এ থেকে বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যেমন বিরাট, তাঁর বাড়ির আবহাওয়াতে তেমনি ছিলো অসীম আনুকূল্য; তাঁর প্রতিভাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করবার সমস্ত উপাদান ছিলো তাঁর বাড়িতেই। এই ইস্কুল-পালানো, লাজুক বালকের শিক্ষায় কোথাও যাতে ত্রুটি না থাকে, সে-উদ্দেশ্যে গুরুজনেরা যা করেছেন আমাদের কানে তা অসম্ভব শোনায়; বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি, দেহতত্ত্ব গণিত, সঙ্গীত চিত্রকলা কাব্য, কুস্তি জিমনাস্টিক্স্ সাঁতার শিকার, কিছুই বাদ যায়নি, জ্যোতিদাদার সংসর্গে ফুটলো কবিতার ও গানের ফোয়ারা, ষোলো বছরের মুখে দেখা দিল 'ভারতী', তারপর ছেলে যখন সতেরোয় পড়লো ঠিক হ'লো তাকে বিলেতে পাঠাতে হবে। 'সেই সঙ্গে পরামর্শ হোলো জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে।' আমেদাবাদে 'কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।' সেখানে দেখা হলো একটি মেয়ের সঙ্গে যিনি দিয়ে গেলেন 'বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম বাড়িয়ে'। তারপর বিলেত, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে তিন মাস পড়া। 'জীবন গঠনে আরম্ভ হোলো বিদিশি কারিগরি।' এলেন ইংরেজের হৃদয়ের সংস্পর্শে, তারই ভিতর দিয়ে হ'লো ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। 'ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হ'য়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলাম, বারিস্টর হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাইনি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।'

বিশেষ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৭

এ-বইতে যে-যে মানুষের উল্লেখ আছে তাঁরা সকলেই বহুদিন মৃত, সেই সোনার সেকালও আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, কিন্তু আজ যারা বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যারা জন্মাবে এ-বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তারা পাবে একসঙ্গে সাহিত্যের রস ও উনিশ শতকের শেষভাগের বাঙালি সমাজের জীবন্ত ইতিহাস।

বুদ্ধদেব বসু

বাংলায় ভ্রমণ : ১ম ও ২য় খণ্ড। সম্পাদক : অমিয় বসু। প্রকাশক : পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচারবিভাগ। দাম দু' খণ্ড একসঙ্গে দেড়টাকা।

বাংলাদেশে ভ্রমণের বিস্তৃত ও সচিত্র গাইড-বুক। বইখানা ভ্রাম্যমাণের কাজে তো লাগবেই, সাধারণ পাঠকও এ থেকে অনেক ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক খবর পাবেন। প্রকাশক যদিও ই. বি. আর, তবু বাংলাদেশের যে-সব অংশ ই. আই. আর, বি. এন্. আর, ও এ. বি. আর-এ পড়েছে, তাও বাদ যায়নি, সুতরাং সমগ্র বঙ্গদেশেরই পরিচয় আছে। মস্ত বই, অনেক ছবি, ছাপা-কাগজ চমৎকার; দাম নামমাত্রই ধরা হয়েছে।

ভ্রম-সংশোধন

'কবিতা'র গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অজিত দত্তের কবিতাটির নাম ভ্রমক্রমে 'মৈনাক, সৈনিক হও' ছাপা হয়েছে। কবিতাটির নাম 'সৈনিক, মৈনাক হও'।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন; ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয় —কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা পৌষ, ১৩৪৭ ক্রমিক সংখ্যা ২৫

এই মহাবিশ্বতলে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত—
দিক্‌-বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে—
প্রলয় দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝঙ্কৃত,
কোথা ক্ষত রক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয় সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কি লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবী চক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লবিত।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহ দুঃখ হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি
সাথে সাথে পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।

রোগশয্যায়
জোড়াসাঁকো
৪।১১।৪০

পৌষ, ১৩৪৭

অর্থনীতি

অমিয় চক্রবর্ত্তী

আত্মার বাজার দর এক নয় :
মদীয় মাসিক পনেরো মুদ্রা।
উঠ্‌চে দর বেশি কম
স্তর মাখনলালের দম
আধ্যাত্মিক টাকায় তিন হাজার,
সেই অনুপাতে তোমাদের মহিমা ক্ষুদ্রা।
— ভবের বংশীধারী
শুন, ভাই ব্রজবিহারী
কলিকাতার নরনারী।

স্কুল-টিচারের সঙ্গে তুলনা বৈঁচির রাজার ?
মানীর উঁচু ডালে বস্‌বে গাছে ?
টিকি, চটি, ছেঁড়া ছাতা ছাড়া কিছু আছে
ও-বেটা বাজাবে সংসারে আত্মার ঢাক ?
থাকুক্ দেখি নয়া দিল্লীর টগলক্ রোডের ফ্ল্যাটে
গিনি ভরুক্ গ্যাঁটে ?
যদুমোহনবাবু ভালো ? আগে যথেষ্ট ভারি চেক্ পাক
চম্‌কানো মস্ত মোটার, লাল-সোনা সিপাই, এবং,
ছুটিতে যাক্ ঘোড়া ছোটাতে পুনা, লেবং
—দেখব কত বুক চওড়া। বাহাদুর আমাদের রায় বাহাদুর
বাড়ি বটে তার একখানা ! প্যালিস্, দেখেচ মার্বল্ প্যালিস্, দূর দূর
থাকে বটে চুনোপুটি লেকের সাবেক পাড়ায়
তবু কার আত্মার সাধ্যি সেখানে পা বাড়ায়
গুর্খা গার্ডের তাড়ায়।—

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

পইসাবালা
কলকাত্তাওয়ালা
গোকুলকে বাজাও বাবা বেয়ালা।

বাজার নিয়ে বিশ্ব এবং বিশ্ববিদ্যার ব্যবসায়,
কার পদার্থ কতটা, কিসে হয় পায়া ভারি
বুঝেচ এতক্ষণে, হে পিয়ারী—
বইয়ের আল্‌মারির দামে জ্ঞানের ওজন পয়সায়।
বিলেতফের্তা বটে—তা বটে—সুনীত সেন, তবু কেন প্রফেসারির
গ্রেডে ওঠেনি ?
বাস্‌-এ চ'ড়ে আসে কলেজে !
আমাদের নীতেন গুহ (বিলেতই যায় নি !) ব্যারিস্টর নয়, মোক্তার
টিনের কৌটো ওর দোক্তার !
বলা বাহুল্য এদের মুরুব্বি জোটেনি।
নৈতিক বিজ্ঞান তাই বলে, যে,
চাকরির মোড়লের পদে আত্মার মূল্য বাড়বে
নতুবা ফতুর প্রাণে বিদ্যে নিয়ে শুকনো পেটে লেজ নাড়বে,
কেউ জানবে না নামও
বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক তোমার দামও।
ওরেরে লক্ষ—ণ
এ কী কুলক্ষ——ণ
বিপদ ঘটেচে বিলক্ষ————ণ ॥

ঘাস

বুদ্ধদেব বসু

ট্র্যামের রাস্তায় ঘাস
বালিগঞ্জে :
নির্জন কল্পনা ফোটে মনের মালঞ্চে,
মাস-পয়লার বিল্‌গুলো
কবিতার পাতা হ'য়ে মেতে ওঠে রঙ্গে।

চার দিকে
ইস্পাত অ্যাস্‌ফল্ট ইঁটে
টেড়ি শাড়ি ঢ'লে পড়ে এ ওর পিঠের 'পরে
দোলে যেন পাতাহারা কঙ্কাল-গাছেরা
পাতালের অলক্ষ্য হাওয়ায়।

এদিকে গুমোট,
শ্রাবণের ঘাম। শ্রাবণের স্নান ঝরে ঘাসে—শুধু ঘাসে
ট্র্যাম-লাইনের পাশে
বালিগঞ্জে।

ছাতা-ঢাকা মাথা, বর্ষাতিতে অস্পৃশ্য শরীর,
ক্লান্ত, ব্যস্ত, জুতো-বদ্ধ পা,
আড়াই ইঞ্চির হীলে মহিলারা
ফুটপাথে পাথরেরে লাবণ্য বিলোন।

এ কোন্ শ্রাবণ ?

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

ধূসর মসৃণ
দু'দিকে অ্যাসফল্ট চলে
মসৃণ বিচিত্র স্রোত।
টেড়ি টলে, খোঁপা কাঁপে, হৃৎপিণ্ড দোলে
কড়া-ইস্ত্রি কামিজের তলে
স্ফীতশিরা ক্ষয়িষ্ণু স্নায়ুর আঁকেবাঁকে
মৃত্যু দোলে;
আপন জরারে কোলে ক'রে
ট্রামের জানালা আলো করে
কলেজের ছাত্রী;
দিন রাত্রি
মোটারের উদ্ধত ধমকে
গণতন্ত্রী বাস্‌-এর গমকে
ট্র্যামের কম্পিত তারে বিদ্যুৎ-চমকে
আসে যায়।

বৃষ্টি পড়ে ঘাসে
ট্র্যামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।
এই তো শ্রাবণ।

ট্র্যাম থেকে নেমে
ক্লান্ত, ভারি, জুতো-আঁটা,
নিঃসাড়, মাড়াই।
ঐ তো আমার বাড়ি, রাস্তাটুকু হাঁটা।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭



ঘাস ছেড়ে অ্যাস্‌ফল্টে, নকল পাথরে,
সিঁড়ির কংক্রীটে আর বারান্দার ইঁটে
চাপা, ফাঁপা, চড়া শব্দে জুতো
মগজেরে প্রভেদ জানায়।

মগজেই ঘাস।

এদিকে আকাশ
মেঘে মাখা
চাপা সূর্যে সেঁকা
ঝরায় শ্রাবণ-দিন
ধূসর মসৃণ।

কোথায় শ্রাবণ?

স্পর্শে গন্ধে, সবুজ আনন্দে, ঘাসে
ট্র্যামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।

স্পর্শময় এ-বিশ্বেরে

রেখেছে আড়াল ক'রে বাটা। ব্যর্থ হাঁটা।

পৌষ, ১৩৪৭

সাফাই

সমর সেন

দিবানিদ্রায় কেটে গেল দারুণ গ্রীষ্ম ;
হাওয়ায় মেঘদূতী লাস্যে
আবার আষাঢ় এলো ;
ছিন্নভিন্ন গুমোট আকাশ, বৃষ্টিঝড়ে
মেঘ্‌লা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান।

সাঁওতালী পাহাড়ে সূর্য ফেলেছে লাল রঙ,
একদা শালবনে কেটেছে রোমাণ্টিক দিন,
সাপের ভয় স্বল্প ছিল।

আজ সব লণ্ড ভণ্ড। সাধু ব্যক্তিরা বলেন,
এর কারণ ঘোর কলি, দানোয় পেয়েছে পৃথিবীকে।
সে যাই হোক্‌,
শাস্ত্রে পড়েছি, যৌবন নাকি বেশিদিন টেঁকে না,
কালো মেঘ অবিলম্বে ঘেরে চারিধার,
নরলোক নরকমাত্র।
তাই বুঝেছি : দুধ আর আম ভালো,
দিবানিদ্রা ভালো, কালো চোখ ভালো,
হাতে হাত মেলানো ভালো ;
শুনেছি বিশ্বে বিবাহ মৃত্যুহীন,
অমর বাসরঘর।

আমি : যখন

মনীন্দ্র রায়

রোমান্টিক

কখনো কুকুরতন্দ্রা-ভাঙা
আমার চৈতন্য যেন ট্রেন এক, রাত্রির টানেলে।
অভিভূত জাগরণ নিমজ্জিত স্নানার্থীর পায়ে তবু আনে যেন ডাঙা।
গ্রহান্তরস্বাদ পাই অতিক্রান্ত মানস পা-ফেলে।
রক্তসার মদ ঝরে গতির ফানেলে॥

সৌখীন বিপ্লবী

অস্তস্বর্ণ প্রতীকের উজ্জীবন হবে ব্যর্থ ডিম
হেমন্ত ঘুঘুর : নীল, মৃতকোষ, হিম !
তাই
উদয়শৈলের দিকে দুই বাহু প্রসারিতে চাই।
রূপান্তর নয়, সৃষ্টি। সহসা পা'ব না জানি খুঁজে,
যতদিন সুপরিক্ত এ সভ্যতা না ডোবে ডেল্যুজে॥

যুক্তিবাদী

'দীঘিতে প্লাবন আসা প্রাকৃতিক নয়',
দিয়েছে কী গূঢ় বাণী বৈদান্তিক নেতা মহোদয়।
'দীঘিও শাশ্বত নয়, সেদিনের কাটা',—
সভার ও পাশ থেকে হঠাৎ বলেছি উঠে, অবিশ্বাসী তার্কিক ছোঁড়াটা।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪১

আধুনিক

সরীসৃপ রাত্রি যায়।
আলোড়িত সম্ভাবনা আঁকে পূর্ব্বাকাশ।
রক্তাক্ত অতীত যেন নিভে আসে দগ্ধলাল মশাল-শিখায়।
যুগান্তের প্রতীক্ষিত চেতনের মিলেছে আভাস,
দিগন্ত কাঁপিছে সপ্ততুরঙ্গহ্রেষায়।
ওই আসে—কী উজ্জ্বল!—হৃদ্‌পিণ্ডে রথের চাকা উঠিয়াছে ঘুরি'।
গলিত সোনার রঙে জ্বলিতেছে আমাদের ম্রিয়মাণ কাস্তে ও হাতুড়ি।

মিশ্র-রাগিণী (১)

অমিতাভ ঘোষ

কোন মহাদেশে কোন সহর, রুধিছে নিত্য প্রাণ লহর
কোথা বণিকের নৌ-বহর, স্পর্দ্ধিত রণ-সজ্জাতে?
কোথা শকুনের কালো ডানা, সোজা পথে যেতে করে মানা
কোথা কারাগার কারখানা উদ্গারে ধুম লজ্জাতে?

—

হাড় হিম্‌সিম্ মাথা ঝিম্ ঝিম্ দু'চোখে শর্ষে ফুল
বেড়েছে অম্লশূল
উমেদারী ক'রে বোকা বনে গেছি সারাদিন ব'কে ব'কে
এক পয়সার ফুলুরী গিলেছি দারুণ ক্ষিধের ঝোঁকে।

—

প্রহরে প্রহরে বাজে ঘণ্টা
আফিসের লেট হ'বে বাঁচাতে,
আনচান করে ওঠে মনটা
খালি পেটে উঠে যাই আঁচাতে।

—

সূর্য্যালোকের পীত আলো মহিষে বিকট মিশ্‌কালো;
ঢালো রে তীব্র বিষ ঢালো নিরাশা জীর্ণ কঙ্কালে
কে করে স্বর্ণ বীজ বপন জীবনক্ষেত্রে কোন তপন
হারায় নিত্য কার স্বপন রুক্ষ মরুভূ জঞ্জালে।

—

উটমুখো হয়ে পথ চলা ভালো নয়
পদে পদে হয় নিদারুণ সংঘর্ষ,

পৌষ, ১৩৪৭

একে ক্ষীণ প্রাণ সহজেই আয়ুক্ষয়
অশ্লেষামঘা জুড়ে আছে সারা বর্ষ,
পাঁজীর হিসাব নয় পাজীদের তৈরী,
দীনের ভাগ্যে বিধাতা স্বয়ং বৈরী।

—

মাইনে বাড়ার মানৎ করে গিন্নি মানেন সিন্নি,
লণ্ঠনে তেল ফুরিয়ে গেছে ভূসোয় কালো চিম্‌নী।

—

আসে পাশে যত স্বর্গীয় 'প'-য়ে পঞ্চম বর্গীয়
কহে আমাদের অর্ঘ্যিও শঙ্খ ঘণ্টা কাংসেতে।
অশরীরী মোরা রয়েছি সব, যদিও অতীতে হয়েছি শব
লোভ নেই আর বিষয়াসব মদ্য কিম্বা মাংসেতে।

—

দিনরাত থম থম ঝম ঝম বৃষ্টি
অসময়ে ছানিপড়া সূর্য্যের নয়নে
অরুচিতে হাইতোলা সবই অনাসৃষ্টি
একলাটি শুয়ে থাকা স্যাঁৎসেঁতে শয়নে।

—

দুর্য্যোগময়ী অমাবস্যার অন্ধকারে
মৃতের স্বপ্নে দুর্ব্বল দেহ রোমাঞ্চিত
বিভীষিকাময় শুনি করাঘাত বন্ধ দ্বারে
নিশির ভয়াল আহ্বান চির অবাঞ্ছিত;
ডাকে দাঁড়কাক কুক্কুর কাঁদে বিকট স্বরে,
কালো বিড়ালের ছায়ায় মরণ নৃত্য করে॥

—

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

অন্ধ তামসী বন্ধদ্বার উঠিছে ছন্দ বন্দনার
রজনীগন্ধা গন্ধভার ছড়ায় মৌন-মন্থরে,
আশার স্বর্ণলঙ্কাতে কী এক অজানা শঙ্কাতে
মূর্ছিয়া পড়ি তন্দ্রাতে জাগে শিহরণ অন্তরে।

—

অঙ্গনে মোর আম্রশাখায় শ্বেত উলুকের ডাক
শুনি মনে হয় ভাগ্যলক্ষ্মী বাজায় স্বর্ণ শাঁখ।
প্রাচীন প্রবাদ যুক্তি তর্ক বিচারের কথা নয়—
লোকে বলে নাকি ঘটিবেই শুভ-দিনের অভ্যুদয়!

ভুমিকা

সৌরীন্দ্র মিত্র

সোনালি পাতারা পেয়ে গেছে পরোয়ানা
অপেক্ষা শুধু—বাউল হাওয়ার মীড়।
আকাশে-আকাশে মেল্‌ল নিশানি ডানা
বাদুড়েরা দিল হানা।
তারারা উধাও। অনেক স্মৃতির ভিড়
ছড়ালো শ্লথ চরণ
স্বর্গে-মর্ত্যে। পলাতক বলাকারা,
শিশিরে হলুদ রজনীগন্ধা-বন।

আসে, আসে শীত। পৃথিবীর মজ্জায়
এই কথা কাঁপে শির-শির, হিম্‌-হিম্‌।
সম্ভাবনায় ঘরে-ঘরে যতো ছায়ারা সঙ্কুচিত
আলোহীন চোখে এই কথা চম্‌কায়॥

বসন্ত

সৌরীন্দ্র মিত্র

ওয়ারশ-র মাঠে পপিরা ফুটেছে লাল
প্রজাপতি কাঁপে তোবড়ানো হেল্‌মেটে
চীনে নগরীর ইঁটের পাঁজার 'পরে
চন্দ্রমল্লী ঝরে।
বসন্ত-ঋতু নিষ্ঠুর পরিহাসে
লম্পট হাতে দেহেরে সাজায় পৃথিবীর। উল্লাসে
কাঁচা বয়েসের প্রগল্‌ভতায় মাতে সে লজ্জাহীনা
গতযৌবনা সকল দৈন্য ভুলে,
পুরাতন ক্ষতচিহ্নগুলিরে মুছে দেয় ফুলে ফুলে॥

মেলা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নয়নে মলিন বিবাহ বাসর ছায়া
দূর সূর্য্যের চক্‌মকি শুধু জ্বলে
আষাঢ়ের মেঘে বিহ্বরী মন্থরতা
সহরে সন্ধ্যা : উনুনের ধোঁয়া ঘোরে।

উনুনের ধোঁয়া : কয়লারা পোড়ে—কত বসন্ত আগে
ঘন নীল বন আষাঢ়কে ছুঁয়েছিল।
হঠাৎ বিকট পৃথিবীর গ্রাসে পৃথিবীতে ডুব দিল।
ঘন নীল বন উনুনের বুকে পোড়ে,
চোখ জ্বালা করে। সূর্য্যের চক্‌মকি।
হাতল ঘোরাও চেনা সিঁড়ি ভেঙে উঠে।
পরিচিত দিন ; তারা ফাঁকি ? শুধু ফাঁকি ?—
ফ্ল্যাটে ছাঁট আসে, আষাঢ়ের গলা মেঘ।
তোমাকে খুঁজেছি, তোমাকেই মনে পড়ে।

অরণ্যস্বাদ গত হয়েছিল। বিসম্বাদ
ছিল না প্রহরে—পলকে মদির দিনে।
তুমি ছিলে। তুমি : পরিচিত, সুনিবিড়।
তোমাকেই খুঁজি।
তারার উল্কি-রাতে
একা জেগে-জেগে পরিচিত দিন,
ফেরি ক'রে ঘুরে মরি।
শূন্য আকাশ, বিকট পাংশু, ক্রেতাহীন মেলা বসে।

করুণা

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

একদা করুণা হৃদয়েতে
বেঁধেছিল এই ত্রিভুবন ;
মন জানাজানি পথে যেতে
অবাধে করেছে জনগণ।

স্বপ্ন তোমার দূর কালে
ডাক দিয়ে যায় ঘরে ঘরে ;
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা ভালে
দেখেছি তোমায় চিরতরে।

কল্পতরুর আয়তন
গোপনে সবার মন হরে।
বিষবৃক্ষের রসায়ন
জানি প্রাচুর্যে ফল ধরে।

আহা, কবে কোন ভোরবেলা
হে ঋতুচক্র! দ্রুত রথে
(করুণা আমার পায় হেলা)
ফেলে তারে তুমি গেলে পথে।

প্রেমের মধ্যে মহামারী
দেশ ও বিদেশে দিলা দেখা ?
হৃদয়ে হৃদয় অনাচারী।
হায়রে ভাগ্যে ছিল লেখা !

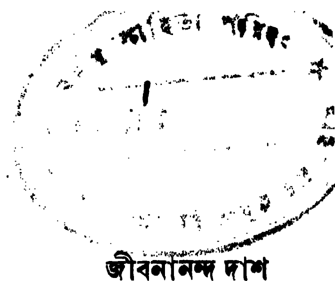
কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

প্রেতের রাজ্যে তবু খুঁজি।
দেখেছি মত্ত পাপীগণ।
এ ব্যূহচক্রে কোথা যুঝি!
বলেছি, 'কিরিএ লেইসন'।

তুমি ছিলে মোর বাঞ্ছিত;
সর্বগুণের দীপাধার;
তোমা বিনা আজ লাঞ্ছিত
অতীত ভদ্র ব্যবহার।

একদা বন্ধু ছিল যারা
পরস্পরের সান্ত্বনা;
বিপক্ষে আজ গেছে তারা
ইতিহাসেরই মন্ত্রণা।



রাত্রি

জীবনানন্দ দাশ

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মত জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক্ স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে ;
চীনেবাদামের মত বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রৎ পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

পৌষ, ১৩৪৭

নিতান্ত নিজের স্বরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস'দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব্ব,—অতিবৈতনিক ;
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

শানাই-এর স্থর

হেমচন্দ্র বাগচী

অনেকদিনের কথা মনে পড়ে ;—
আব্ছায়ার মত।
হুস্-হুস্ শব্দে ট্রেন যায়।
রৌদ্রে আর রাত্রির অন্ধকারে-মেশা দিনের মালা—
সে মালা যেন শৈশবে-শোনা অস্পষ্ট শানাইএর স্থরের সঙ্গে
জড়িয়ে আছে।
তা'রই স্থর অনেকদিনের স্মৃতি নিয়ে আসে মনে।
বর্ষণ-শেষ শরতের দিন—
ঐ স্থর আনে চমৎকার একটা শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ—
লঘু খণ্ড মেঘ,
শিউলি ফুলের রাশ,
পূজোর স্থচনার স্থর!
শানাই কোন্ দেশের বাজনা ?
আমার মনে হয়, ও বাংলারই ;
কীর্ত্তনের মত একটা নিজস্ব জিনিষ—
কর্কশ অথচ করুণ ;
অনেক সময় হঠাৎ শানাইএর স্থর শুন্‌লে মনে হয়,
কে যেন কাঁদছে ;
একটা দারিদ্র্যের ছবিও নিয়ে আসে শানাই।
পড়ো ভিটে আর দুঃস্থ পল্লীপরিবারের চিত্র—
পল্লীর যে কোনো উৎসবে চাই ঢোল আর শানাই।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

বাঁশবন আর পানাপুকুরে ভরা পল্লীতে
কোনো এক নির্জ্জন বটতলে হয়ত কোনো পূজো হচ্ছে,
সেখানকার গালফুলো শানাই-বাজিয়ের ছবি মনে পড়ে!
চারিদিকে আস্‌সেওড়ার বন,
মেয়েরা যা'রা জোট বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে,
তা'দের পাণ্ডুর রোগক্লিষ্ট মুখ,
গরীব তা'রা।
তা'দেরই পূজো হচ্ছে।
সেখানে শানাই বাজ্‌ছে করুণ একটানা স্বরে,
ছোট ছোট অজস্র ছেলেমেয়ে জড়ো হ'য়েছে সেই বটতলায়!
সেখানকার সেই গরীব শানাইএর স্বর মনে পড়ে!
সহরে শানাই বাজে,
অনেক রকম সুরের কারুকাজ—
উচ্চাঙ্গের ব্যাপার!
কিন্তু শানাই বল্‌লেই
আমার মন ছুটে যায়
বালককালের পল্লীর ছায়ালোকে,
যেখানে কেবলি,
রোগ, অশান্তি, নিবিড় বনজঙ্গল, মশা, ম্যালেরিয়া,—
অবাধিত সূর্য্যালোক, উদার মাঠ,
সেখানে শানাই বাজে আমার মনে মনে,
শরতের লঘু প্রসন্নদিনের হাওয়ায়!

পৌষ, ১৩৪৭

ওএন্-এর একটি কবিতা

বিষ্ণু দে

পৃথিবীর চক্র চলে উষ্ণ রক্তে তৈলসিক্ত! প্রায় বুঝি ভুলিয়াছি তাই।
আমরা নিশ্চল র'ব, নিজেরে খনন করি শান্তধীর গভীর চিন্তায়।
সুন্দরের অধিষ্ঠান তোমার নয়নে মুখে, তুমি দক্ষ সার্থক সক্ষম;
প্রজ্ঞা রহে মোর মনে পারমিতা, আমারে ঘেরিয়া রহে রহস্যের হিম।

আমরা রহিব পিছে সর্ব্বশেষে, জীয়াইয়া আমাদের অসিধারব্রত।

স্বত্বত্যাগ করি আজ এসো বন্ধু, মানুষের মন নামে পাশব স্বভাবে।
রক্তপানে পুনর্স্বাস্থ্য লোকমুখে শুনি বটে—চাহি না সে ভীমের আসবে।
ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা ল'য়ে আমরা হই না যেন কভু দ্রুতপদ বেগবান্।
অগ্রপথ থেকে যারা বাঁকাচোরা গলি ধরে ছাড়ি সেই জনতা গহন।
দলত্যক্ত সঙ্গীহারা রহিব আমরা, যতো জীর্ণভগ্ন পরিখাপ্রাচীর
নগরীতে পলাতক জগতের জনতার প্রত্যাগামী নিরাপদ ভিড়ে।

মুক্তাকাশতলে এসো রহি বন্ধু, অনিকেত মুখোমুখি সত্যের সাক্ষাতে।

ওরা যবে রুদ্ধগতি দাঁড়াইবে, রথচক্র রক্তক্লেদে আকর্ণগভীর,
আমরাই ছুটে' যাব গভীর বাপীর জলে শুচিস্নান করাব ওদেরে।
আমরা মজ্জিত আজ, বাহুচ্যুত মঙ্গলকলস ওরা আমাদের বলে।
তবুও বহুর পঙ্ক মিটাইব পর্ণপুটে, ধুয়ে' দেব মোদেরই সলিলে।
সেনানীর অগম্য সে অতল শীতল বাপী, সঞ্জীবনী স্বখাতসলিল—
শত্রুর অস্পৃশ্য যারা রক্ত দিল, বাপীতটে কীর্ণ শুভ্র তাদেরও কপাল।

শত্রু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সূর্য-অস্ত-যায়-না এমন রাজ্যে
(সম্প্রতি বুঝি টলায়মান সে-ভিত্তি !)
প্রয়োপবেশন দৈনন্দিন কাজ যে।

না-চেয়ে বরাতে জুটছে বেকারবৃত্তি
দুরদৃষ্টকে আনি না আদৌ গ্রাহ্যে।
স্মরণে জাবর কাটছে পুরোনো কীর্তি।

চিনেছি শত্রু, রয়েছি প্রভুর পক্ষে
(নতুবা শাসন চল্‌তো ভগ্নস্বাস্থ্যে)
খাদ্য, খাদক কোলাকুলি করি সখ্যে !

গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্তে।
বাঁচবেই গণতন্ত্র, এই যা রক্ষে
যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি, কাস্তে।

সাবধান ! যারা চাইবে বক্র হাসতে ॥

পদাতিক

দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভোগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এ ঈর্ষ্যাযোগ্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে; বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

অবশ্য এ-সম্মান কারো কপালেই বেশিদিন টেঁকে না, টেঁকা উচিতও নয়। বাংলাদেশের যুবক কবিরা যে এত তাড়াতাড়ি বয়োকনিষ্ঠতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আমাদের সকলের পক্ষেই এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। যুগান্তকারী প্রতিভা সত্যিই হয়তো শতাব্দীতে একটির বেশি জন্মায় না, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিশ্রমী ও বিবেকবান সৎকবির সংখ্যা বাড়ছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অনতিবিলম্বে তরুণতমতার গৌরব হারাবেন; তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাবার এ-সময়ই সব চেয়ে শুভ।

অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এ-কারণেও নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে-পদেই আমাদের চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে-কোনো আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ-কথার সাক্ষ্য দেবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য; প্রথমত, তিনি বোধ হয়

---

* পদাতিক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা-ভবন, এক টাকা।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমন কি, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না ; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও একেবারে প্রথম কবিতা-গুলিতে ছিলো। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে।

তাঁর কাব্যের এই দুটি লক্ষণের মধ্যে প্রথমটি নেতিবাচক, এ-আপত্তি ওঠে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে একটি বাঙালি ছেলে যে বয়ঃসন্ধি সময়েই কবিতা লিখলে, অথচ প্রেমের কবিতা লিখলে না, এ-ঘটনাকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক ব'লে উড়িয়ে দেয়া চলে না। কুড়ি বছর আগে, দশ বছর আগে এ সম্ভব হ'তো না। এতে বোঝা যায় যে সময় বদ্‌লাচ্ছে। কেউ যেন মনে না করেন আমি এমন ইঙ্গিত করছি যে প্রেমের কবিতা না-লেখার মধ্যেই প্রশংসনীয় কিছু আছে ; বরং আমি এটাই আশা করি যে কোনো সামাজিক অবস্থাতেই আমরা প্রেমের কবিতা লিখতে ভুলবো না। আমি বলতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। হয়তো অনেকের মতে দুর্লক্ষণ। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হ'য়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।

কবিতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার ঝোক রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও দেখা গিয়েছে। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এ তিনজন কবি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু প্রকৃতির উদার মুক্তি থেকে মনুষ্য-সমাজের কঠোর সংকীর্ণতায় তাঁরা ঠিক নেমে আসতে পারেননি, যতীন্দ্র সেন-গুপ্তের মতো কটুভাষী কবিও প্রকৃতির বর্ণনায় ও বন্দনায় মুখর। 'কল্লোলে'র যুগের যে-সব কবিতায় বাংলা সাহিত্যের হাওয়া-বদলের খবর পাই, তাদের

যুদ্ধঘোষণার লক্ষ্য ছিলো যে-মুক্তি, তা ব্যক্তির, সমষ্টির নয়। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক পরিভাষায়, সে-বিদ্রোহ রোম্যাণ্টিক, রুসো-শেলি-ফিট্‌জেরাল্ড-স্যুইনবর্নের সমপর্যায়ী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন অভিনব, আর তাঁর কাব্যে প্রেম কিংবা প্রকৃতির বদলে কোন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, সে-আলোচনা এখন সহজ হবে। তিনি অভিনব শুদ্ধ এই কারণে যে বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যাঁর জীবনদর্শন একেবারেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী নয়। তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্যে নয়, কোনো বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যেও নয়, সমগ্র মনুষ্যসমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞা তাঁর মনে নেই। তিনি স্পষ্টই বলেন :

> কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ—
> জানি, আজ নেই অন্য গতি ;
> যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
> সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

শ্লোকটি বড়ো বেশি সহজ, কথাটা বড়ো বেশি স্পষ্ট, অনেকে এ-রকম আপত্তি করবেন। কবিতায় একটু বাঁকা ক'রে বললেই ব্যঞ্জনা গভীর হয়। কিন্তু এ-কথা এমনি সরল ও স্পষ্ট ক'রেই আমাদের নতুন কবিদের মধ্যে কোনো-একজন ঘোষণা করবেন, এ-প্রত্যাশা আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের পক্ষে অন্যায় নয়। বাংলা কবিতায় এই ধরণের সমাজচেতনা সমর সেনের ক্ষুদ্র রচনাগুলিতেই আমরা প্রথম পাই ; আমাদের কাব্যজগতে যে-আন্দোলন তিনি আনেন তার ফল এতদূর গড়িয়েছে যে এখন শক্তিশালী আধুনিক কবিদের অনেকেই সমাজবিপ্লবের আগমনী গাইছেন। কিন্তু সমর সেন নিজে মোহমুক্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাই বরাবর বজায় রেখে আসছেন ; সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও দুরূহ উল্লেখের সাহায্যে ছাড়া বিষ্ণু দে-র মন কাজ করে না ; আর সুধীন্দ্র দত্তের প্রায় জ্যামিতির প্রস্তাবের মতোই ন্যায়সম্মত কবিতাগুলিতে ধ্বংসোন্মুখ আভিজাত্যের যে-ছবি পাওয়া যায়, তা তিনি অভিজাতের মতোই ঠাণ্ডা মেজাজে

দেখেছেন ও এঁকেছেন। সর্বনাশ যে আসন্ন—এমন কি উপস্থিত—এ-বিষয়ে সকলেই সচেতন; আর এই সচেতনতার ফলে হতাশা আর বিদ্রূপই হয়েছে আধুনিক কবিতার প্রধান দুটি স্বর। কিন্তু এই সর্বনাশই যে সাম্যবাদী সমাজকে প্রসব করবে, পৃথিবীতে নবযুগ আসবে, এ-বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে এমনই জ্বলন্ত যে তিনি ব্যঙ্গনিপুণ হ'লেও হতাশা থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ দিয়েছে তা আশার উল্লাস।

> তবু জানি, ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
> যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
> তবু জানি—
> জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
> আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। ('ঘরে বাইরে'—সমর সেন)

এই বিশ্বাসে 'পদাতিক' আগাগোড়া উদ্দীপিত। বিশ্বাস—যে-কোনো বিশ্বাস—শিল্পীর বিরাট সহায়; এবং সাম্যবাদের ধ্রুবতায় আশ্রয় পেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক কাব্যের হতাশা থেকে বেঁচে গিয়েছেন। সাম্যবাদই মানবজাতির ধ্রুব লক্ষ্য কিনা এ-বিষয়ে তর্ক তোলা এখানে অবান্তর, কাব্যে বিশ্বাসের মূল্য নৈতিক নয়, সম্পূর্ণই শিল্পগত। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কবি জীবনকে বিশেষ একটি ভঙ্গিতে দেখেন ব'লে তাঁর বাক্যগুলি রসাত্মক কিংবা আবেগবাহী হ'য়ে উঠতে পারে সহজে, এবং শিল্পের সংক্রামণ ক্ষমতা প্রবল ব'লে তখনকার মতো নাস্তিক পাঠকের মনেও সে-বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়, বিশ্বাসী কবির এই পর্যন্ত লাভ। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী পাঠকের পক্ষে যদি রবীন্দ্রনাথ কি হপকিন্সের কবিতা উপভোগের কোনো বাধা না থাকে, তাহ'লে সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকের পক্ষেও 'পদাতিক' উপভোগ্য না-হবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বাস যেখানে প্রবল, প্রকাশের ঝোঁক সেখানে সরলতার দিকে। 'পদাতিক' খুলেই প্রথমে পড়ি :—

পৌষ, ১৩৪৭

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া ('মেদিনের কবিতা')

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে।...

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে॥ ('সকলের গান')

এ-সব চটুল ছন্দ শুনিয়েই সত্যেন দত্ত একদা আমাদের মন মজিয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষের এ-ধরণের রচনাগুলিতে একটি lilt আছে যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এ-ছন্দগুলি প্রায়ই এলিয়ে পড়তে চায়, একঘেয়েমির দুর্মূল্যে এদের মধুরতা কিনতে হয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে যুক্তাক্ষর ছড়িয়ে সুভাষ এদের বাঁচিয়েছেন। এ-কবিতা দুটি আমার নিজের খুব পছন্দ নয়, কিন্তু এ দুটি প'ড়ে মনে হয় যে জনগণের কবি হবার প্রায় সমস্ত উপাদানই এই তরুণ কবির আছে। যে-সব কবি কবির পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল সমাজে জীবন কাটিয়েছেন, যেমন চসর কি ভিঁল কি পুশকিন, তাঁদের রচনায় আবেগের একটি নির্লজ্জ সরলতা পাওয়া যায়, কারণ সাধারণ লোক নিয়ে গঠিত একটি শ্রোতৃমণ্ডল চোখের সামনে রেখেই তাঁরা লিখতেন। কবিতাকে বক্তৃতা কি কথকতার কাজে লাগাতে তাই তাঁদের কুণ্ঠা তো ছিলোই না, বরং আনন্দ ছিলো। শ-র 'ক্যাণ্ডিডা' নাটকের কবি যখন বলেন, 'All poets speak to themselves, the world only overhears,' তখন ধনতন্ত্রী সমাজে কবির দুরবস্থার অতি চমৎকার বর্ণনাই তিনি করেন;

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

যে-সমাজে কবির শ্রোতা জনসাধারণই, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নয়, সে-সমাজে কবি নিজের মনে গুনগুন করেন না, বেশ চেঁচিয়ে, সকলের শোনবার মতো ক'রেই কথা বলেন।

'পদাতিকে'র অনেকগুলি কবিতাতেই এই উচ্চস্বর, এই বক্তৃতার ঢং ধরা পড়ে। দ্রুত ছন্দে, সহজ কথ্যভাষায় কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ না ক'রে আবেগটিকে একেবারে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য :

সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছনে ফেলে,
সব চেয়ে দ্রুত ট্রেনে ক'রে আজ
এখানে আসা
----আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সারি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে,----
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি
কামারশালে? ('এখানে')

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও···
দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা, বন্যার ঢেউ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই। (চীন : ১৯৩৮)

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

নিছক কান দিয়ে শুনলে এ-সব কবিতা খুবই ভালো লাগবে; এদের আগাগোড়াই—এমনকি জাপানি বোমাবর্ষণের বর্ণনাতেও—শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার—এমনকি বেপরোয়া ফূর্তির—সুর; এ যেন বৃহৎ জনগণসভায়, কি 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা ব'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি, যে-ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে, তার সুমিত সুষমা মুহূর্তের জন্যও নষ্ট হয়নি।

তবু বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কবিতায় জনপ্রিয়তার গুণ থাকা এতই দুরূহ যে চড়া গলা শুনলেই আমাদের সন্দেহ হয়। নজরুলের উচ্চস্বরকে শেষ পর্যন্ত ভাবালুতায় অধঃপতিত হ'তে তো দেখলুম। আর যে-দেশের জনসাধারণ নিরক্ষর সে-দেশে তা না হ'য়েই বা উপায় কী? জনগণের কবি যদি বা দেখা দেন, কাকে গান শোনাবেন তিনি? বড়ো জোর 'ভদ্র' বেকার অক্ষৌহিণীকে। সংবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে তাই ফিরতেই হয় স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে, জটিল আঙ্গিকে, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায়, যদি তিনি কবি হিসেবে নিজের পূর্ণ বিকাশ চান।

ঠিক এই কাজই সুভাষ মুখোপাধ্যায় করেছেন। 'পদাতিকে' রয়েছে সরলতার পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসংকোচ, নির্লজ্জ আবেগের পাশে ব্যঙ্গের চাতুরী, ধ্বনির বিচ্ছুরিত আভা। সমসাময়িক অনেক কবির কাছেই তিনি পাঠ নিয়েছেন—বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে—কিন্তু কারো প্রভাবে কখনো তিনি পড়েননি; এত অল্প বয়সে যে নিজের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।

২

বিশিষ্ট আঙ্গিকের যিনি অধিকারী আসলে তিনিই সার্থক কবি, কারণ তিনি যে শুধু নিজে ভালো কবিতা লেখেন তা নয়, নিজের ভাষার সমগ্র

কাব্যকলাকেই অন্তত সামান্য একটু এগিয়ে দিয়ে যান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-অভিনবত্বের কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি তা তাঁর কাব্যে সব চেয়ে গৌণ জিনিস, কারণ বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য দায়ী কবি নিজে নন, দায়ী তাঁর সামাজিক পরিবেষ। প্রসঙ্গের সরসতা পারদধর্মী; বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘন-ঘন ওঠে পড়ে যে শুধু বিষয়বস্তু নিয়েই কথা হ'লে এক যুগের কবিতা অন্য যুগে প্রায়ই পড়া যেতো না। অর্থাৎ অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে সাম্যবাদেই যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিষয়, খুব সম্ভব সেখানে নতুন, ও নতুন ধরণের, রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ দেখা দেবে। বর্তমান এই কালসঙ্কটে সর্বজনের এই মুক্তির ইঙ্গিতে অনেক পাঠকেরই মন নেচে ওঠে, কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারণে। অনেক সময় মুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আমরা এও ভুলে যাই যে বিষয়ে কবিতা হয় না, কলাকৌশলই কতগুলো শব্দসমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে, এবং কলাকৌশল বিষয়নিরপেক্ষ। শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতার—কি যে-কোনো শিল্পের—বিচার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে; কারণ শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে তা নয়, উপরন্তু একই যুগে একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনো পাঠকের চোখে দৃষ্য। এই কারণে কবিতার আঙ্গিকের আলোচনাই সব চেয়ে সার্থক সমালোচনা।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে শুধু বিষয়ের জন্যই আমি আজ 'পদাতিকে'র প্রশংসা করতে বসিনি। যে-বিশ্বাসের কথা আগে বলেছি তা এই তরুণ কবির রচনায় শুধু সদিচ্ছা কি শুকনো নীতির রূপে প্রকাশ পায়নি, তাতে তিনি দিয়েছেন এমন একটি আবেগের উত্তাপ যা আমরা সাধারণত প্রকৃতি কি প্রণয়িণীর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করি। তার উপর এ-আবেগ ফুটিয়েছে যে-কলাকৌশল তার নৈপুণ্য সত্যিই বিস্ময়কর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত, ছন্দ নিয়ে এই ৩২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থে

নানারকম দুঃসাহসী পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন, নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে তাঁর এই ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহ'লে বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনো পরিণতি তাঁর মারফৎ আশা করা অন্যায় হয় না।

তিন মাত্রা ও পয়ার, দু'রকম ছন্দেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওস্তাদ। পয়ারে তাঁর হসন্ত শব্দের ব্যবহার আমার রীতিমতো আশ্চর্য লেগেছে। পয়ারে যুক্তাক্ষরকে আমরা একমাত্রা ধরি, কিন্তু হসন্তের পরে স্বরান্ত শব্দকে আলাদা মূল্য দিয়ে থাকি, এ নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, 'কল্কিতে' কথাটি নিঃসন্দেহে তিন মাত্রা হ'লেও 'কলকাতা' সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান, 'জল নিতে' লিখতে গেলে তাকে চার মাত্রার মূল্য না দিয়ে উপায়ই থাকে না। হসন্তের পূর্বের স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে বলবার যে-নিয়ম বাঙালির উচ্চারণে মজ্জাগত, তার সাহায্যেই এ-অসঙ্গতি মানিয়ে যায়, এবং ভেবে দেখতে গেলে এই নিয়মের উপরেই পয়ারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উচ্চারণের স্বাভাবিক ঝোঁক বিকৃত না-ক'রেও পয়ারে হসন্তের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার সম্ভব। কয়েক বছর আগে পদ্যে একটি নাটিকা লেখার সময় আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' অনায়াসে তিনমাত্রার জায়গা পায়—

আসিলো কলকাতার আরো এক কাল

তো বটেই,

আসিলো কলকাতার আরো এক সকাল

এ-ও পয়ারে চ'লে যায়। বলা যেতে পারে, 'এক সকালে'র 'ক' আর 'স' অদৃশ্য, কিন্তু শ্রুতিগম্য, যুক্তাক্ষর রচনা করেছে, এবং পংক্তিটি হঠাৎ যদি খটকা লাগায় তার কারণ এই যে ছন্দ পড়বার সময় আমাদের চোখের অভ্যাসকে ভুলতে পারিনে। তারপর থেকে এ-ধরণের পরীক্ষা এখানে-ওখানে করেছি, কিন্তু প্রথা-পথ থেকে বেশি দূরে সরতে সাহস পাইনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তীদের অনুশাসন ভ্রুক্ষেপমাত্র না ক'রে হসন্তের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন: হসন্তকে কখনো দিয়েছেন একমাত্রার গৌরব, কখনো পাশের স্বরান্ত

শব্দের সঙ্গে দিয়েছেন এঁটে : ফলে তাঁর পয়ারে চলাফেরার একটি অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। বিশেষত, বাক্যগুলিকে গদ্যের ছাঁচে ঢালাই করতে, ও বিদ্রূপ জমাতে, এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী। ২৩ পৃষ্ঠায় 'অতঃপর' নামে যে-গদ্যাকৃতি কবিতাটি রয়েছে, তার নিঃসন্দিগ্ধ সাফল্যের মূলে এই কৌশলই রয়েছে :

> অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুই তিন সনে
> বিপদ একাকী নয়কো !...
> দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম।
> এতৎসত্ত্বেও হয়তো...
> আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার ?
> ধনীদের তো পোয়া বারো
> বিশেষত,—ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধি। ('অতঃপর')
>
> গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে।
> বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ? ('আলাপ')
> অনেক খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে ('আলাপ')

এই পংক্তিগুলিতে 'খাজনা', 'নয়কো', 'হাত-পা', 'হয়তো', 'আসবে', 'অনেকদিন' 'খিদিরপুর' 'গোলদীঘির' 'কী দরকার' 'ধনীদের তো' 'ভারতবর্ষে' 'একচেটিয়া' কথাগুলি লক্ষ্য করবার। হসন্ত গেঁথে দেয়া হয়েছে পরের স্বরের সঙ্গে, শুনতে খারাপ তো হয়ইনি, বরং মুখের কথার মতোই অবাধ গতিতে বিদ্রূপ হয়েছে ধারালো। 'হাত-পা সব হিম,' 'ধনীদের তো পোয়া বারো', 'ভারতবর্ষে একচেটিয়া' এ ক'টি সংযোগ খুবই দুঃসাহসী ও নিতান্ত মৌলিক, অনেকে আপত্তি করবেন। কিন্তু 'ধনীদের পোয়া বারো', 'দুশ্চিন্তায় আমাদের হস্তপদ হিম', 'বিশেষত এ ভারতে একচেটে নেতা গান্ধি' এ-রকম লিখলে মামুলি অর্থে ছন্দ বাঁচতো, মারা পড়তো কবিতাটি। এ জোর কোথায় থাকতো ?

এ-রকম উদাহরণ আরো পাওয়া যাবে—

কবিতা

পৌষ, ১৩৪১

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা···
নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি···
হাজরা পার্কে সভা কাল···
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা ; লেনিন-দিবস : লাল-পাগড়ি মোতায়েন

কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা চলে না কবির মনোযোগ হসন্তের এই নতুন ব্যবহারেই আবদ্ধ, বিপরীত আচরণেও তিনি অকুণ্ঠিত :

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্চ্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না···

এখানে 'প্রত্যহ' আর 'লাগবে না' চার মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মোটের উপর, হসন্তের উভয় রীতি নিপুণভাবে মিশিয়ে এই তরুণ কবি পয়ারের এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছেন।

তিনমাত্রার ছন্দ আঁটোসাটো, নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা, তাকে খেলানো শক্ত, কিন্তু এ-যন্ত্রেও সুভাষ তাঁর নিজের একটি সুর লাগিয়েছেন। নিখুঁত কারিগরি ধরা পড়েছে তিন-মাত্রায় যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে, তাছাড়া পংক্তিগুলির শেষে স্বরবর্ণ যোজনায়, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেননি :

রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি।
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি ;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হ'য়ে যায় সব-হারাদের বস্তি। ('রোমান্টিক')

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি ? ('বিবোধ')

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে। ('বধূ')

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

এ-সব কবিতা যে একেবারেই মিলবর্জিত তা কান দিয়ে কিছুতেই বোঝা যায় না, চোখের সাহায্য নিলে তবে ধরা পড়ে। ছন্দের গতিই এমন যে মিলের কাজ আপনিই সম্পন্ন হচ্ছে, এমন কোনো অভাব নেই মিল যা পূরণ করতে পারতো।

৩১ পৃষ্ঠায় 'কিংবদন্তী' নামে ৮ লাইনের যে-পদ্য আছে তার ছন্দের প্রতি আমি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

> চলছিলো এতকাল বেসাতি
> নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
> আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
> যমদূত দেয় ডুবসাঁতার।

এখানে তিন মাত্রার ছন্দকে পুরো বারো মাত্রা না ক'রে এগারোমাত্রায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, শেষের কথাটা তাই একটু টেনে পড়বার ঝোঁক হয়, তাছাড়া হসন্ত শব্দ বেশি আছে ব'লে বেশ একটা দ্রুত রকমের দোলা জেগেছে।

এ-ছন্দের জাত অবশ্য নতুন নয়, এগারো মাত্রাও অভিনব নয়, এ-বইয়েরই ২৮ পৃষ্ঠায় এর আর-একটি উদাহরণ রয়েছে, যা অতি পরিচিত :

> বড়ই ধাঁধায় পড়েছি মিতে,
> ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে ;
> বার বার ধান বুনে জমিতে
> মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে। ('ধাঁধা')

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হসন্ত শব্দের আধিক্যের জন্যই 'কিংবদন্তী'র সুরটা হয়েছে আলাদা, আমার কানে তো ভারি নতুন শোনালো।

৩

'পদাতিকে'র কবিতাগুলি সবই আধুনিক সমাজসঙ্কট নিয়ে। নাম-কবিতাটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য—শুধু দীর্ঘতার জন্য নয়, ছন্দের বৈচিত্র্যের জন্যও নয়, যদিও এ-সব কারণও আছে—কবিতাটিতে রয়েছে সমস্ত বইয়ের

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

নির্যাস, তাছাড়া এখানে স্বরের এমন একটি গাম্ভীর্য আছে যা অন্য-কোনো রচনায় নেই। অন্য কবিতাগুলোর মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে 'বধূ' ও 'প্রস্তাব'; এ-দুটিতে ব্যঙ্গের লঘুতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গভীর আবেগ, কোথাও মাত্রা ছাড়ায়নি, কোথাও উপচে পড়েনি, এক অদ্ভুত মানসরসায়নে মিশে দুই-ই হয়েছে রূপান্তরিত।

> শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
> বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।
> চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান। ('প্রস্তাব')

ঠাট্টাটা আমাদের সকলেরই উদ্দেশে, আশা করি গায়ে লাগবে। 'বধূ'তে আছে প্রাক্-বণিকযুগের সরল গ্রাম্য জীবনের আর আধুনিক নগরজীবনের পাশাপাশি ছবি। দুটি স্বরই একসঙ্গে বাজছে, মধুরের সঙ্গে রূঢ়কে, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে এমন কৌশলে জড়ানো হয়েছে, পদে-পদে এমনই অপ্রত্যাশিতের হানা যে কবিতাটির সম্পূর্ণ ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হ'লে অন্তত দু'বার পড়তে হয়।

> সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
> গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া,

প'ড়ে মনটা বিশেষ একটি স্বরে বাঁধা হয়, বিশেষ একরকমের প্রত্যাশা জাগে, কিন্তু সে-প্রত্যাশা চূর্ণ হয় তার পরেই যখন পড়ি:

> ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
> পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।

এটা sublime থেকে ridiculous-এ আসবার দৃষ্টান্ত নয়, অতীত থেকে বর্তমানে, কৃষিযুগ থেকে যন্ত্রযুগে, গ্রাম ছেড়ে সহরে আসা।

> ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
> দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
> আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
> —ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

গ্রামের 'খাসা জীবন' ছাড়তে হ'লো, এদিকে শহরও নির্মম, নিঃসুখ :

> বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা ; তাই
> কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
> কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
> গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো!

ঠাট্টার সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘশ্বাস, স্পষ্ট শোনা গেলো।

একটা কথা বলা দরকার। এ-কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'র প্যারডি নয় ; যদিও নাম এক আর রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে, তবু এটি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। নানা উপাদানের সংযোগের ভিতর থেকে কবিতাটি যেন একটি স্বতন্ত্র দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে, এত ভালো লাগে যে বলতে ইচ্ছে করে মাস্টারপীস, অন্তত এটি যে 'tour de force', সে-কথা মানতেই হয়। অন্য একটি 'tour de force' 'অতঃপর' কবিতাটি। এর ছন্দের কথা আগেই বলেছি ; এতে যে-কথাটা বলা হয়েছে তা ভারতে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়, ধনতন্ত্রের উদ্ভব। কথা খরচ হয়েছে কম, অথচ সব কথাই আছে। জমিদারি ও মহাজনিতে আয় ক'মে যাচ্ছে, তার উপর—

> বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশ বিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম—
> পৈতৃক বলাও চলে।

কিন্তু তবু আশা আছে :

> মহাশয়,—জমিদারী যায় যাক। বণিকের মৌলিক প্রতিভা
> দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে :

জমিদার হবে বণিক, অভিজাত হবে বুর্জোয়া, ফিউডল সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর গ'ড়ে উঠবে পুঁজিওলার লোলুপ বাণিজ্য। মস্ত একটি উপন্যাসের বিষয় ঠাসা হয়েছে ক্ষুদ্র কবিতায়—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা আগাগোড়াই স্বল্পভাষী, কিন্তু এ-কবিতাটি সঙ্কোচনের একটি চরম নমুনা। এই বিষয়েই আরো দু'একটি কবিতা পাওয়া যাবে 'পদাতিকে' ; সাময়িক প্রসঙ্গকে, এমনকি

পৌষ, ১৩৪৭

সংবাদপত্রের ঘটনাকে, আবেগের উত্তাপে গালিয়ে তা দিয়ে কবিতা গড়বার ক্ষমতায় সুভাষ অদ্বিতীয়।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সমস্ত জিনিস তিনি দেখেছেন, শুধু মানুষের জীবন নয়, বিশ্বপ্রকৃতিও।

'নিষিদ্ধ খানার গর্তে লালকোর্তা সূর্যের বারতা' ('দলভুক্ত')

আবার

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ। ('নির্বাচনিক')

চাঁদের কথাও আছে:

বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী। ('নির্বাচনিক')

কিংবা

তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়। ('পদাতিক')

('চাঁদ কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?' এ-কথা এখন আর সত্য নয়। আধুনিক যুগের চণ্ডালের—অর্থাৎ দরিদ্রের—ঘরে চাঁদের জায়গা নেই, আকাশ রুদ্ধ। কলকাতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা জানেন।)

দক্ষিণে হাওয়াও বাদ যায়নি—

বোমারুক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। ('পদাতিক')

আজগুবি কিছু লিখে শস্তায় বাহবা নেবার চেষ্টা এ নয়, এখানে পাচ্ছি সত্যই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এ-চোখে দেখলে সবই অন্যরকম লাগবে। দেখতে পারিনে বললে চলবে না, দেখবার ইচ্ছাও থাকা চাই।

তাই ব'লে এমন নয় যে এ-চোখে ছাড়া কবি দেখতেই পারেন না। দু'একটি লাইনে এখানে-ওখানে তিনি তুলে ধরেছেন অসাধারণ এক-একটি চিত্ররূপ, যা এমনকি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁর সঙ্গে এঁর সব বিষয়েই দুস্তর অসাদৃশ্য:

সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হ'লো কার নয়নে,

পৌষ, ১৩৪৭

নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ! ('বিরোধ')

চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্নের নদী। ('পদাতিক')

অপরাহ্নের এই নদীটি সত্যি অপরূপ।

নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও
তারের বেড়া;
সর্পিল পথে চলে রেলপথ
ধনুক-আঁকা
দেশান্তরে। ('এখানে')

তৃতীয় পংক্তিতে 'পথ' কথাটি দু'বার না-থাকলেই ভালো হ'তো, তবু সুন্দর। 'আলাপে' কবি বিশুদ্ধ ব্যঙ্গের চর্চা করেছেন; একটি পদ্য সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম:

পণ্ডশ্রম

অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু-খোঁজা ক'রে,
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে।
তারপর আত্মহারা অধিক রাত্রিতে
যখনি দিয়েছি সাড়া যে-কারো ইঙ্গিতে
তখনি পিছন থেকে বলেছে বিদায়
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো।

আঠারো শতকের ইংরেজি কাব্য মনে পড়বে; স্থৈর্য, ভারসাম্য, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ; ফল মর্মান্তিক।

৪

১৫ পৃষ্ঠায় কবি বলছেন: 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ।' আর শেষ কবিতার শেষ পংক্তি দুটিতে:

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমারে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই।

সুতরাং তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। কবিত্বশক্তিও তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ। এরই মধ্যে সাফল্য যা হয়েছে তা আমি তো মনে করি আশ্চর্য। তবু, এ আরম্ভ মাত্র। এ-কবির ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের আশার স্থল। 'পদাতিকে' দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি: প্রথমে, সরল, চড়া গলার কবিতা, 'গণ'-কবিতা হবার যা দাবি রাখে, অন্য দিকে জটিল আঙ্গিকের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু'দিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। কবি কোন দিক ছাড়বেন? যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিসেবেই, কবি হিসেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। এই আশা আমাদের রইলো।

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা ছন্দ

দিলীপকুমার রায় প্রণীত ছান্দসিকীর প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ১৩৪৭ সালের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়া উচিত ছিলো। বাংলা ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন, কিন্তু এ বিষয়ে এমন বই এখনও লেখা হয় নি যা জিজ্ঞাসুর সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করতে পারে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তাঁর ঋষিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাংলা ছন্দের মূল সূত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর রচনা বৈয়াকরণের পথ ধরে' চলে নি বলে' বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথার আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। দিলীপকুমারের কাছ থেকে এ-অভাবের পরিপূরণ আমরা আশা করেছিলাম। কারণ দিলীপকুমার স্বয়ং একজন কবি, তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে দিলীপ-কুমারের চেয়ে যোগ্য লোক বাংলাদেশে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিলীপকুমারের বই যদি কোনোদিকে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে তবে তা এর সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতায়।

"ছান্দসিকী"র পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৯, কিন্তু উচ্ছ্বাস, স্বরচিত কবিতাগুলি এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের আলোচনা বাদ দিলে মোট বস্তু এর অর্দ্ধেকেরও কম দাঁড়াবে। এই সারাংশকে বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যায় যে দিলীপকুমারের মতে বাংলায় মূল ছন্দ প্রধানত তিনটি,—অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত। এ ছাড়া স্বরাক্ষরিক ছন্দ, লঘুগুরু ছন্দ, প্রস্বনী ছন্দ নামে আরো তিন জাতীয় ছন্দের বিবরণ দিলীপবাবু দিয়েছেন, যা তাঁর মতে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। এই সব নূতন ছন্দের আবিষ্কর্তার সম্মান অবশ্য দিলীপকুমারেরই প্রাপ্য। দিলীপবাবু এ গ্রন্থ রচনা করেছেন অন্তরের প্রেরণায়। তাঁর নিজের

* ছান্দসিকী : দিলীপকুমার রায়। কালচার পাব্লিশর্স।

ভাষায় : "সেক্ষপিয়র বলেছেন যে 'some are born great, some attain greatness, some have greatness thrust upon them.' আমার মগজে হৃদয়ে রক্তে অস্থিমজ্জায় কোনো শক্তি যে এইভাবে ছন্দের দোলা চারিয়ে দিয়েছে একথা বল্‌লে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।"

কিন্তু এই স্বর্গীয় প্রেরণা সত্ত্বেও দিলীপকুমার দু'টি মারাত্মক ভুল করেছেন বলে' তাঁর বই শেষ পর্য্যন্ত নৈরাশ্যজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত বাংলা ছন্দের মূলসূত্রকে গ্রহণ না করে তিনি প্রবোধকুমার সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করেছেন। তাঁর এ পক্ষপাতের কারণ "বাংলা ছন্দের প্রথম সূত্রকার তিনিই।" কিন্তু প্রথম কথা খুব কম ক্ষেত্রেই শেষ কথা রূপে টিঁকে থাক্‌তে পারে একথা মনে রাখা ভালো। দ্বিতীয়ত, দিলীপবাবু এই axiom থেকে সুরু করেছেন যে "ছন্দোজাত আনন্দের মূল ভিত্তি হোলো গাণিতিক—বাইরের বিচারে। অন্তরের দিক্ দিয়ে এ যে কী কেউ জানে না।" যা কেউ জানে না "ছান্দসিকী" পড়ে তা জান্‌বার আশা আমরা করিনে, কিন্তু নিতান্ত বাইরের বিচারেও ছন্দ গণিতসম্রাটেরই খাস প্রজা একথা মান্‌তে একটু খট্‌কা লাগে।

কাব্যছন্দ ব্যাপারটা কি এতই বেশি গাণিতিক যে সব সময়ই তা একটা নিয়মিত দোলার খাঁজ ধরে চলবে? গোড়াতেই এ ধারণা নিঃসন্দিগ্ধ বলে গ্রহণ করার ফলে, মনে হয়, দিলীপকুমারের নিজের কবিতাও হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন, সাত মাত্রার ছন্দে বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে দিলীপ-কুমার তাঁর নিজের একটি সাতপৃষ্ঠাব্যাপী পূরো কবিতা উদ্ধৃত করে' তা'র চার লাইন লাইন পরেই আরো একটি (এবারেও নিজের) কবিতার চার লাইল তুলে দিয়েছেন। ছন্দ জিজ্ঞাসুদের কাছে সে চার লাইন উদ্ধৃত কর্‌বার লোভ সাম্‌লানো গেলো না :—

তুমি কেমনে নাথ। আলোকে বঞ্চিবে?
নিতি জ্বলিয়া ওঠো। তব বিজয়-দীপে (sic)

বল, তটিনী কভু। চাহে কি সঞ্চিতে
তার করুণা ঢেউ ?। সে চাহে উছলিতে।

গুণ্‌তে গেলে প্রতি পর্বে ৭ আর ৬ মাত্রা ঠিকই আছে, দুই, তিন, দুই হিসেবে ভাগও করা আছে, কিন্তু তবু দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হয় যে গণিত পৃথিবীর অনেক বড় বড় কাজ করতে পারলেও ছন্দোরচনায় তা'র উপর অত বেশি নির্ভর না করাই ভালো ছিলো। দিলীপকুমারের সাফাই "এ সব ছন্দে নববৈচিত্র্য অভিনবতা আনার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নৈলে যে ভঙ্গি চল্‌ছে সে-ভঙ্গির মধ্যে নব নৃত্যের আনন্দ আস্‌বে কেন?" অর্থাৎ কিনা "নতুন কিছু করো।"

তা দিলীপবাবু নতুনত্ব আনুন, ভালোই, কিন্তু তাঁর বই পড়ে অক্ষরবৃত্ত স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য কোথায় সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লে আমরা উপকৃত হতাম। দিলীপবাবু বোধ হয় ধরে নিয়েছেন যে তাঁর পাঠকরা সবাই এই সব ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলির সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা এই ছন্দোবিভাগই স্বীকার করেন না। যেমন "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আমি নিজেও স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণটা ভালো বুঝি না। ছান্দসিকী পড়ে' ধারণা হয় চল্‌তি ভাষায় লেখা তিন মাত্রার ছন্দের নামই বুঝি স্বরবৃত্ত ছন্দ। দিলীপবাবু তো স্পষ্টই বলেছেন "এ ছন্দের ভবিষ্য বিকাশ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ কর্‌বার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। বস্তুত ইতিমধ্যেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সাধু ক্রিয়াপদ হইতেছে, যাইতেছিলাম, করিবার, ধাইবার···প্রভৃতি কবিমনে তেমন ঠাঁই পাচ্ছে না?" অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে দিলীপকুমারের মতামতও সমান রহস্যময়। অক্ষরবৃত্ত কাকে বলে? না যে ছন্দে

> "(ক) শব্দের শেষে এলে এ-ছন্দে যুগ্মধ্বনি গজেন্দ্র গমনে চলে দু'মাত্রার কদমে—
> "সর্ব্বদাই"।
>
> (খ) শব্দের মাঝে প'ড়ে গেলে চলে রুদ্ধশ্বাসে একমাত্রার কদমে কিন্তু "সর্বদাই" নয়—
> "সচরাচর"।"

নূতন ধাঁধা'র মত শোনায়।

দিলীপবাবু সর্বত্র যুক্তাক্ষরকে গুরু ধরে' নিয়ে আলোচনা করে' একটু ভুল করেছেন। যুক্তাক্ষর তো ঠিক গুরু হয় না, যুক্তাক্ষরের আগের (কিংবা হসন্তবর্ণের আগের) অক্ষরটাই গুরু ধরা হয়ে থাকে। এই জন্য চরণের প্রথমে বা পদের গোড়ায় যে যুক্তাক্ষর থাকে তা'র ওজন বাড়ে না। এই কথা মেনে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই ঠিক, বাংলা ছন্দ সাধারণতঃ দু' মাত্রার কিংবা তিন মাত্রার (এখানে মাত্রা শব্দটি আমি রবীন্দ্রনাথের অর্থে ব্যবহার করছি) কদমেই চলে, তবে দিলীপবাবুকে লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি—ছন্দসমস্যার সমাধান কত সহজে হতে পারে।

বাংলা ছন্দের প্রতি পর্বাংশে মাত্রাসংখ্যা দুইয়ের কম এবং তিনের বেশি হতে পারে না একথা স্বীকার করে নিয়ে ছন্দের আলোচনা আরম্ভ করা যাক্। কতকগুলো ছন্দ আছে তা'র প্রতি পর্ব আগাগোড়া দু'মাত্রার চলনে চলে। যেমন:—

"আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।"

যে মুহূর্তেই "বৈশাখ" বলা হোলো সে মুহূর্তেই তিন অক্ষরে পর্ব শেষ করতে হোলো, কেননা শুধু "বৈ" কথাটাতেই দু' মাত্রার ওজন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য পয়ার হোলে এটা হোতো না। বৈশাখের মাসে লেখা চল্‌তো।

এর পরে নেওয়া যাক্ তিন মাত্রার চলনের দৃষ্টান্ত। যেমন:—

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১
"মু ক্ত। বে ণীর। গ ঙ্গা। যে থায়। মু ক্তি। বি ত রে। র ঙ্গে" কিংবা

২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২
ন ন্দ। লাল তো। এ ক দা। এক টা। ক রি লো। ভীষ ণ। পণ" কিংবা

২ ১ ১ ২
প ঙ্ক। নদীর। তীরে

১ ১ ১ ১ ১ ১
বে ণী পা। কা ই য়া। শিরে।

আর এক রকম ছন্দ আছে দুই আর তিন মাত্রার পর্বে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন বিষম মাত্রার ছন্দ। এ ছন্দে দুরকমের পর্ব আছে বলেই যে এখানে কবির স্বাধীনতা বেশি তা নয়। কারণ এ পর্ব সাজানোর patternটি কিন্তু নিয়মের দৃঢ় শিকলে বাঁধা। যেমন :—

৩ ৪ ৪
"এমন। দিনে তারে। বলা যায়।

৩ ৪ ৪
এমন। ঘন ঘোর। বরিষায়।

৩ ৪ ৩ ৪
এমন। মেঘ স্বরে। বাদল। ঝর ঝরে

৩ ৪ ৪
তপন। হীন ঘন। তমসায়।"

তিন, চার, তিন, চার অতি নিয়মিতভাবে সাজানো। আরো ধরুন :

ঝর্ণা। ঝর্ণা। সুন। দরী। ঝর্ণা
তর। লিত। চন্। দ্রিকা। চম্। পক। বর্ণা

এরো একটা বাঁধা প্যাটার্ন আছে।

ওপরে বলা এ-সব ছন্দেরই মোটামুটি স্থিতিস্থাপকতা কম। ট্রাম লাইনের মত বাঁধা রাস্তায় এরা চলে, কোথায় একটু চলনের ভুল হলে ছন্দের পতন অনিবার্য। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যাঁর তুল্য ছন্দের হাত বাংলায় খুব কম কবিরই দেখা গেছে তিনিও ওই প্যাটার্ন রেখেই চলেছেন :

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
"দেশটা। দেখো। যাচ্ছে। ভরে। ম্লেচ্ছ। আর। নাস্তি। কে

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
হচ্ছে। সব। তুল্য। পাপী। দিচ্ছে। কারে। শাস্তি। কে

একমাত্র স্বাধীনতা দেখি পয়ার ছন্দে। ও ছন্দ কিছুতেই যেন পতিত হতে চায় না। এবং এ-ছন্দে যত কৌশল এবং কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ এমন আর কোনো ছন্দেই নেই। ভালো কবির হাতে এর শক্তি প্রকাশ পায়

আশ্চর্য। তার কারণ এ কবিকে বলে: "হে কবি, প্রতি পর্বাংশে দুইয়ের কম বা তিনের বেশি মাত্রা ব্যবহার করবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে কাব্য রচনা করো। একমাত্র নিয়ম এই যে কোনো পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষরের বেশি থাক্‌তে পারবে না।" (বলা বাহুল্য এ নিয়ম জারী করেছে চোখ, আর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সংস্কার। এই নিয়মের বাঁধন তুলে দিলে যে ছন্দ জন্ম নেয় তাকেই আমরা বলি ছড়ার ছন্দ।) এ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন এই জন্য যে বাংলায় এ দুটোই পর্বাংশের সীমানা। এখন পয়ারকে যতই হাল্কা করুন প্রতি পর্বাংশে দু' থেকে তিন মাত্রাই সে রাখ্‌বে এর বেশিও না কমও নয়। যেমন:—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
"সখা। সনে। উং। সবে। বং। সর। যায়।"
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

আবার ঠেসে বাড়িয়ে দিন:

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
"দুর্দান্। ত পান্। ডিত্য। পূর্ণ। দুঃসা। ধ্যসিদ্। ধান্ত।"

ভালো কবির হাতে এ-ছন্দে সম্ভাবনা স্বভাবতই প্রচুর; কারণ যুক্তাক্ষরের সার্থক ব্যবহার কেবল এ-ছন্দেই সম্ভব। একটা সেকেলে ধরণের লেখা পয়ার থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। দেখুন যুক্তাক্ষরের সুষ্ঠু ব্যবহারে এর সৌন্দর্য্য কি অপরূপ হয়ে ফুটেছে:

আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবং।
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে
কত লক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিক্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবী
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।

এ-ছাড়া দিলীপবাবুর পর্ববিভাগও দু' এক জায়গায় আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। যেমন :

"এই ভারতের। মহা। মানবের। সাগর তীরে।"

"স্বর্ণশ। ক্রধনু। রতনে খ। চিত তনু। চূড়া শিরো। পরে"

"একদা তুমি। অঙ্গ ধরি'। ফিরিতে নব। ভুবনে
মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা"

এগুলো কি ছাপার ভুল ?

অজিত দত্ত

নতুন কবিতা

নতুন পাতা : বুদ্ধদেব বসু প্রণীত (কবিতা ভবন : দুই টাকা)।

বুদ্ধদেব বসুর "নতুন পাতা" হাতে পৌঁছল। অত্যন্ত আধুনিকেরা স্তম্ভিত হবেন কবি হয়েও তিনি কবিত্ব করতে ভয় পাননি ; সেকেলে ভাব সাজিয়ে খেয়ালের দোকান তুলেচেন। শত্রুপক্ষীয় ভালোমানুষ কবি বলেও তাঁকে ভুল করবার উপায় নেই। আদিম কথা স্পষ্ট অথচ ললিত ভাষায় বলবার ভঙ্গী কোন্ প্রথাসঙ্গত।

গদা-হাতে "গদ্য কবিতা" এ নয়, মুক্ত ছন্দে ব'য়ে চয়েছে অথচ ধারার বাঁকে বাঁকে জাগ্রত মনের পরিচয়। যাঁরা এখনো মনে করেন আধুনিক লেখকদের মধ্যে স্বীকৃতির অকুণ্ঠিত খুসি নেই, প্রশ্নসমন্বিত মনই সর্ব্বজয়ী, তাঁদের জন্যে এই পূজোর উপহার।

"এই মুহূর্ত্তে চাঁদ তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে
কত বড়ো চাঁদ !
কী সম্পূর্ণ, কী সুন্দর, কী অবিশ্বাস্য-সম্পূর্ণ সুন্দর।
কিন্তু তার চেয়েও আরো কত সুন্দর এই যে আমার মেঝেতে কোনো রূপকথার নীলসমুদ্রের
টলটলে জলের মতো একটুখানি জ্যোছনা এসে পড়েছে।"

(চাঁদ)

চাঁদে-পাওয়া দশা কবিত্বের সর্ব্ববাদীসম্মত লক্ষণ অতএব সাধু সমালোচকেরা আশ্বস্ত হবেন। অসাধুরা দ্রুত নিশ্বাস ফেল্‌বেন জলজ্যান্ত মামুলি চাঁদটা নিয়ে আলোচনা দেখে, কিন্তু ভয় নেই। জোয়ারের জল ঘাট পেরিয়ে ভাসাবে না। শিল্পের বাঁধুনি আছে। পাহাড় নিয়েও দস্তুরী উঁচু উচ্ছ্বাস রয়েচে—সুখের বিষয় কোন্‌টা সাবেকী কোন্‌টা নয় সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েই বুদ্ধদেববাবু লিখেচেন এবং সেই কারণে উচ্ছ্বাস কথাটায় বিপদ নেই।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৭

"উত্তরে কাঞ্চনজংঘার
পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারে রূপালি আগুন।
এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত? না কি দূরে বহুদূরে
এরই সন্ধানে আমাদের স্বপ্ন-অভিসার? অস্পষ্ট অপরূপ
ঝিলিমিলি তুলে শাদা ময়ূরের মতো আমারই দিকে আস্‌ছে?"
(চাঁদ ও তুষার)

ছাপ-মেরে শ্রেণীবদ্ধ করবার সুবিধা হবে না; এখানে সেকেলে এবং বহুকেলের সঙ্গম।

"চা-বাগানের কোঁকড়ানো সবুজে-নীল" ছবি দেখো; "তীব্র তিব্বতি হাওয়া"র মতো ডি. এইচ. আর. গাড়ির শব্দ; (অন্য এক কবিতার লাইনে মাদ্রাজ মেল্ চলেচে "চাকায় চাকায় স্তব্ধতাকে আগে-আগে ঝেঁটিয়ে"); কোথাও

"সমুদ্র ধু-ধু করচে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্তে প্রসারিত।" (পৃঃ ৮০)

সমুদ্রকে নিয়ে কথা বলা শক্ত কেননা নানা দেশীয় কবিত্বের শ্লেটে হিজিবিজি তৃপ্তির দাগ পড়েচে। "যেন" কথাটা বাদ দিলে নির্দ্দেশ বদ্‌লাতো কিন্তু জোর কি বাড়ত না?

উঁচু হয়ে উঠে গেছে সমুদ্র
যেখানে চোখ যায় না—"

স্নানরত ঢেউবিলাসীর মন সাড়া দেবে। তার আগেই বলা হয়েচে,

"আমরা ভাসছি, আমরা নাচছি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনার ঘূর্নিতে,
মাথার উপর শাদা পাখির ঝাঁক
চাকার মতো ঘুরছে।" (পৃঃ ৭৮)

সামুদ্রিক খেয়াল জাগ্‌ল—

পৌষ, ১৩৪৭

"গ্যাখো না সমুদ্র তোমার কী করে
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মতো হাওয়া।

যেমন শঙ্খ আর ঝকঝকে ঝিনুক
এই ঢেউয়েরা হাজার বছর ধ'রে আঁকে
কত অফুরন্ত রঙে, কত বিচিত্র নক্সায়,
বাদামি আর বেগনি আর অপরূপ মসৃণ
আর আকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো রেখায়—
তেমনি তারা তৈরি করুক তোমার শরীরকে
শঙ্খের মতো মসৃণ তোমার শরীর—"

(পৃঃ ৭৮)

পুরীতে ব'সে "নতুন পাতা" পড়চি—হয়তো সমুদ্র বিষয়ে বেশি উদ্ধৃত ক'রে বস্‌ব; অদূরবর্ত্তী চিল্কা হ্রদেরও ঝিলিক দেখ্‌লাম অন্য কবিতায়। এ পাড়ায় বুদ্ধদেববাবু বেড়িয়ে গেছেন তার দলিল প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পৃথিবীর মাটিজল পাহাড় চোখে ধরা দিয়েচে এইটেই কবিতার সংবাদ। বইয়ের এই দ্বিতীয় অংশের রচনায় পার্থিব রূপের প্রদক্ষিণ আছে। সকলেই জানেন ধরণী সহজ বস্তু নয়, ভ্রাম্যমাণকে নীল জলে ভাসায়, দুর্গম পাহাড়ে চড়ায়, খদে গহ্বরে নিয়ে মাথা ঘোরায়—কবিত্ব নিংড়ে নিতে আঙুলের জোর চাই। "এভারেস্ট্" কবিতায় অভিযানী চিত্ত চড়াই ভেঙে উঠেচে, গৌরীশৃঙ্গের ডগায় পা না পৌঁছলেও কবির মন তার

"দৃষ্টি-অন্ধ-করা আলো, আর
সৃষ্টি-লুপ্ত-করা অন্ধকার, জরাযৌবনহীন রাত্রিদিন"-কে

ছুঁয়ে এসেচে।

এর পরে "অকায়, অকঙ্কাল কলকাতা, ছায়াময়"
যেখানে মানুষ

"কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী;
বিশ্বের জানলা বন্ধ।"

তার কথা তোলা বিসঙ্গত ঠেক্‌বে। "নতুন পাতা"য় সেই বদ্ধ সংসারটা এসেচে আগে—বইয়ের প্রথম অংশে।

"রাস্তায় ভিড় ব্যস্ততা মত্ততা। আপিসে ময়দানে রেস্তোরাঁয়
কাজ খেলা নেশা, হাড় ভাঙা সপ্তাহশেষে জুয়ো, জিন, দুপুরের ঘুম
সব অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, শহর মূর্ছিত।"

পরিচিত "আধুনিক" কাব্যের রাস্তা। জিন কারা খায় ঠিক জানি না। কিন্তু কলকাতাকে নিয়ে কাব্যে যে-নতুন দস্তুর অতি প্রাচীন হ'তে চলেচে তারই আবৃত্তি "নতুন পাতা"র উদ্দেশ্য নয়। এখানেও নতুন আলো ঠিক্‌রিয়ে এসেচে, অনেক সময় ট্রামের আলো—

"লাল-আলো-জ্বালা টালিগঞ্জের ট্রাম
অন্ধকার পার হয়ে আসছে" (পৃঃ ৬৮)

এখানেও সুর এসে পৌঁছয়, দৈবক্রমে সেটা কোকিলের, শুধু ট্র্যাফিকের নয়, যদিও কোকিলের ধ্বনিটা যে শব্দের পটভূমিতে জেগেচে তা সাহরিক। কলকাতার রাত্রিটা সুদক্ষ টানে ফোটানো—

"রাত্রি একটা।
রাস্তায় উড়েদের হল্লা এতক্ষণে থেমেছে।
এখন কোনো শব্দ নেই ;
শুধু মাঝে-মাঝে এই শান্তিতে টোল ফেলছে
দূরে রাস্তা দিয়ে দ্রুত-ছুটে-যাওয়া ট্যাক্সি।
আর ঘড়িটা টিকটিক করছে—
সময়ের অবিশ্রান্ত, ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন। (পৃঃ ৪৫)

"ক্ষীণ" কথাটা সুন্দর বসেচে। নিঃঝুম রাত্রির ছন্দ।

এই সময়টায় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে

"হঠাৎ একটা কোকিল
রাত্রির বুকের ভিতর থেকে ডেকে উঠ্‌ল।"

সব মিলিয়েই কলকাতা। রাত্রে যেমন কোকিল এবং রাস্তার কাকলি, তেমনি

দিনে ভাবনার রঙে মেশানো প্রহরের সংঘর্ষ। মধ্যাহ্নে সংগ্রামের সহর জুড়ে শানে-আছড়ানো অতৃপ্তি।

> "দুপুরবেলায়
> বাইরে হাওয়া তেতে উঠে,
> বৃষ্টিহীন আকাশ বিবর্ণ।
> ...আমার বুকের মধ্যে
> হাজার ক্ষুধিত কুকুরের তোলপাড় চীৎকার।" (পৃঃ ৪১)

"নতুন পাতা"য় নগরবাসীর ক্ষুব্ধতা তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর যে-বিশিষ্টতা "আধুনিক বাংলা কবিতা" সংগ্রহের সম্পাদক দেখিয়েছেন—প্রথম ভূমিকায়—সেই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ এখানে প্রচুর। প্রেমের কবিতা ইটপাথর কাঠের ফাটলে ফাটলে সবুজ রঙীন হয়ে যেখানে সেখানে ঠেলে বেরিয়েচে। প্রথম অংশটা হৃদয়বৃত্তির ডায়েরি। বাঙালী জীবনের সমস্যাজনিত আক্ষেপ এবং প্রত্যুত্তর; উপাদান গাঁথা হয়েচে প্রেমের মূলসূতোয়। সেইখানে আন্তরিক সঙ্গতি। "আমি ভালোবাসি" বলবার সাহস "নতুন পাতা"য়। হৃদয়বৃত্তির ঝাঁজ লক্ষ্য করেচি বুদ্ধদেববাবুর অন্য কবিতার বইয়ে, শরীরমনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তীব্র বল্‌বার চেষ্টা। এতে শোনা যায় কম। সূক্ষ্ম মন প্রতিহত হয় আহত না হয়ে—অর্থাৎ বাস্তবিকতা রোধ করে অব্যবহিত বোধকে যা ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়েই প্রকট হওয়া সম্ভব। দেহমন জড়িয়ে কেন্দ্রিক অনুভূতি প্রকাশের শিল্প চলেচে দুই রাস্তায়। বিজ্ঞানবাক্যের সরাসরি প্রয়োগ ইংরেজী রীতিকে দেখা দিল: লক্ষণ বোঝাতে কবির চেয়ে কবিরাজের বচন। অন্যদিকে রেখার চেয়ে রঙের ঝলক, কখনো বা মগ্ন চেতনা হতে তুলে আনা। নূতন জ্ঞানের প্রসঙ্গ য়ুরোপে বহুধা সঞ্চারিত ব'লে আর্টিস্টের কাজ ওখানে কতকটা সহজ হয়েচে। বাঁধা আইন নেই—শিল্পে একমাত্র প্রশ্ন: হয়েচে কিনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঝাপ্‌সা অনির্দ্দিষ্ট কথার স্থানে স্পষ্ট পারিভাষিক কথা বাড়্‌চে এটা নিশ্চয়ই প্রাণধর্ম্মী। কিন্তু 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেতে চাঁদ

—দুর্লভ মুহূর্ত্তটি দূরে না স'রে যায় বেশি কাছে বাঁধবার প্রয়াসে। ভাবালুতা এবং অত্যুগ্র বর্ণনার মধ্যে সেতু বাঁধতে পারায় আর্টিস্টের কেরামতি; বিশেষ ক'রে ভালোবাসার কবিতায়। "নতুন পাতা"র বহু ছত্রে তার পরিচয় পাবেন।

পাতা উল্‌টিয়ে হঠাৎ থামতে হয় পরিপূর্ণ সুন্দর ছোটো আকাশে; ভাবনায় দৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত মুহূর্ত্তের আকাশ বইখানির নানা জায়গায় ছড়ানো। ছন্দ-মিল-ছুট্ কাব্যে আগাগোড়া এক-একটি কবিতাকে আঁট বেঁধে আব্‌হাওয়া রচা শক্ত; বুদ্ধদেববাবু নিজেই স্বীকার করবেন এই রাস্তায় তিনি নতুন পথিক। কিন্তু কথার বালি ভেঙে হঠাৎ সবুজ কেন্দ্রে পৌঁছনর বিশেষ সুখ আছে, গাছের একটুখানি ছায়া আর পাশে কোথাও টল্‌টলে জল। এই নিয়ে স্বর্গরাজ্য। এম্‌নিতর টুকরো লাইন পূরো কবিতার স্বাদ দেয়।

"রূপকথার সেই সব-শেষের পাতা
মায়ের চোখের নিচে উজ্জ্বল।"

(পৃঃ ৫১)

"ছায়া-ঢাকা ঠাণ্ডা রাস্তার শেষে ঝিরঝিরে, রঙিন ফুলের বাগান"

* * * * * * * (পৃঃ ৫১)

"জানলার বাইরে আছে আকাশের নীল টুক্‌রো,
আছে সমস্ত দিন ভ'রে মনের মধ্যে কবিতার গুঞ্জন"

* * * * * (পৃঃ ২১)

"বাতাস ঝুলে রয়েছে নিশ্চল ধোঁয়ার সুতোর মতো
গাছের পাতায় পাতায়।"

* * * * (পৃঃ ১৭)

"তোমাকে ডাকছি সময়ের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু'দিক মৃত্যুর দেয়াল দিয়ে ঠাসা।" (পৃঃ ৯)

* * *

"আর আমার জানলায় ছোটো ছোটো তুলসীর পাতা
তারা ভ'রে উঠেছে জীবনের সমস্ত মধুরতায়।

আর এই রাত্রি নাচছে আমার রক্তে
জ্বলন্ত কোনো তারার আকাশ-পরিক্রমণের মতো।"

(পৃঃ ৩০)

"সময়কে আলোর করাত দিয়ে চিরে-চিরে যায়
এক-একটি মণিময় মুহূর্তে। (পৃঃ ৬৭)

এ শুধু এক মুঠো, অনেক মুঠোর ঝল্‌মলে ভাণ্ডার রয়েচে "নতুন পাতা" কাব্যে।

তৃতীয় অংশে সাহিত্যিক সংবাদ, তর্ক, মন খুলে কবিতায় ভর্ৎসনা "ইন্‌টেলেকচুয়েল্‌" সমালোচককে। যাকে বলে "বাঁশির জায়গায় অসি" কাব্য। কেন হবে না? তর্কে যোগ দেব না, কিন্তু অন্তঃশীলা দরদী মনোধারার সন্ধান পেয়েচি সেই কথা জানাব। সদ্য ছাপা নিজের বই হাতে নিয়ে লেখক পড়তে বসেচেন, গর্ব-বেদনা অভিমান ছাপিয়ে উঠেচে সত্তার নিগূঢ় আনন্দ—সুন্দর এই সমাপ্তির ছবি, তাতে ফিরে পড়বার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

"যেন এই শাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোটো একটি সূর্য আমি তৈরি করেছি;
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জ্বলন্ত।"

(পৃঃ ১১০)

"তুমি বল্‌ছো, 'এ-বই থাকবে না,
মিলিয়ে যাবে কালসমুদ্রের জলে কয়েকটা উল্কি এঁকে দিয়ে।
কেন তবে—' কিন্তু সেইজন্যেই তো।

(পৃঃ ১০৪)

"তবু তোমরা আজকের মতো চুপ করো,
একটু চুপ ক'রে থাকতে দাও আমাকে।
বিকেলের ম্লান আলোয় একা ঘরে আমি পড়ি আমার কবিতা।
মুহূর্তের জন্য ফিরে আসুক সেই দিন," (পৃঃ ১০৫)

অতএব সমালোচকের মুখ বন্ধ; ভয়ে নয়, প্রশংসায়। বুদ্ধদেববাবু আধুনিক বাংলা কাব্যে একটি নূতন সুর যোগ করেচেন। যাঁরা তৈরির কাজে নিবিষ্ট হন নি তাঁরা এই আত্মপ্রসাদকে প্রশান্তি ব'লে মনে করবেন। প্রসাদ-

গুণের মূল এখানে নেমেচে গভীর মাটিতে। "নতুন পাতা"য় যে-আনন্দটুকু ফুটেচে তা সংগ্রামজয়ী।

"দুঃখ দাও আমাকে
এই নববর্ষায় ছোটো-ছোটো বৃষ্টির মতো
ধারালো দুঃখ আমার বুকের উপর নামুক :
যে-বৃষ্টিতে জাগে প্রাণের অঙ্কুর,
মাটি সবুজে হেসে ওঠে।" (পৃঃ ৫৬)

অমিয় চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
মুদ্রাকর : ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন। "মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস" ৭ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।
কার্য্যালয় : কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা   চৈত্র, ১৩৪৭   ক্রমিক সংখ্যা ২৬

মিলের কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯।১।৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত, দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপটিপ ক'রে। সুধাকান্ত ব'সে আছে পাশের চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, ব'লে গেলুম—

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হোলো, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন ক'রে হোলো যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে ব'লে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি সাদা হয়ে গেছে, মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তা হলে যেটা হোলো শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে,—রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হ'য়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা "হাঁ"-য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই এ'কে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে—একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড় মিলনের কাব্য।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে-মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁঠ বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরে ও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদল সন্ধ্যায় হাজ্‌রে-দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়াছেন তার প্রমাণ দিই :—

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানব জীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হোত একাক্কার।
প্রোটন এবং ইলেকট্রনের যুগল মিলনেই
জগতটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হোলো সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।

সৃষ্টি কার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো আঁধার পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।
বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎ কণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি চেয়ে শোভাটাই যে সত্য
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্ পেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা এক হয়ে যায় আর
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয় মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট বাজারের গন্ধ কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে॥

চৈত্র, ১৩৪৭

ইষ্টিমারে

বুদ্ধদেব বসু

দিন কাটলো ইষ্টিমারে।

ঝেঁকে-ঝেঁকে বিষ্টি পড়ে,
হঠাৎ থামে। মেঘ-ভাঙা রোদ ঝলক তোলে তীব্র জলে।
আবার নামে
কালো মেঘের পুঞ্জ জমে,
আকাশে কে থেকে-থেকে গড়ে পাহাড়, রাজার বাড়ি, উঁচু মিনার,
ছায়া ছড়ায় কালো হাওয়ায়, ইষ্টিমারের চাকার তলায় শাদা ফেনার
ঢেউয়ের সারি কালো নদীর হৃদয় চেরে, ঘুরে ফিরে ঘূর্নি তোলে;
একটু পরেই ভাঙে আবার ভাঙে পাহাড় রাজার বাড়ি, যায় মিলিয়ে
উঁচু মিনার; থামখেয়ালি কোন খেলা এ!
আধেক নদী কালো ছায়ায়, আধেক ঝলে আলোয়,
ক্ষণেক দেখি মস্ত নদী রুপোর মতো জ্বলে
নীল আকাশের তলায়;
সূর্য ভাঙে লক্ষ কণায় ঢেউয়ের কোণায় চোখ-ধাঁধানো ঝিকমিকিতে,
আকাশ ঝরে আলোর তোড়ে; ক্ষণেক পরে
মেঘের পাখার ঝাপটানিতে দূরের গ্রামে ছায়া নামে,
ঢেউয়ের শ্রেণী কালো বেণীর মতো জড়ায়, কেঁপে-কেঁপে তীরে গড়ায়,
দিগন্তকে ঝাপসা ক'রে ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি ঝরে।—
আলো-ছায়ার অফুরন্ত থামখেয়ালি খেলা
দেখে-দেখে কাটলো দুপুরবেলা
ইষ্টিমারে।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

মিলিয়ে গেলো নারানগঞ্জের লাল টিনের ছাদ,
পোষা হাতির পালের মতো গাধাবোটের দল
ক্ষীণতনু তরুণীদের মতো চপল
ছোট্ট ফেরিগুলির চলাফেরা
আর যায় না দেখা। রইলো শুধু জল।
তিনদিকে জল ঢলোঢলো, দিগন্তে নীল জল,
বাঁকা রেখায় দূরে মিলায় ঘন শ্যামল তীর,
কখনো নীল আর কখনো রুপোর মতো শাদা
কখনো বা নরম কাদার চোখ-জুড়োনো রং;
বাদালি জল বেগুনি জল ধূ-ধূ ধূসর জল
ঢেউয়ের দোলায় রঙের লীলায় আকাশ-তলে
আরেক আকাশ ছুটে চলে।
এই আষাঢ়ের উদ্দামতায় উদ্ধত উচ্ছল
বাংলাদেশের হৃদয়জোড়া পদ্মানদীর জল।

মস্ত বড়ো নদী পদ্মা, যেন সমুদ্দুর।
দুই হাতে সে জড়িয়ে আছে ঢাকা ফরিদপুর।
মেঘলা রঙের মেঘলা হ'য়ে মেলে সমুদ্দর।

হারিয়ে গেলো নীল দিগন্ত, সামনে এলো তীর
সবুজ গাছে ধানের ক্ষেতে আঁকা।
আধেক চাঁদের মতো বাঁকা ছিপছিপে ঐ খাল
পাঁচটি গ্রামের কোলে
পড়ছে ঢ'লে খলখলিয়ে হেসে,
যেন নদীর ভরা বুকের ভালোবাসার বান

চৈত্র, ১৩৪৭

আপন টানেই উপচে পড়ে, ছড়িয়ে দেয় প্রাণ
ক্ষণে-ক্ষণে বাংলাদেশের কোণে কোণে।
খালের পাড়ের ইষ্টিশানের আটটি টিনের ঘর,
বিকেলবেলার বাঁকা আলোয় তাও হ'লো সুন্দর,
ইষ্টিমারের একদিকে তীর, অন্যদিকে চর।

আধেক জাগা আধেক ডোবা বর্ষানদীর চর
কৃষ্ণ রাতের চাঁদের একটু ফালি,
তারি মধ্যে লম্বা ধানে ঘেরা
দুটি চারটি ছোট্ট টিনের ঘর।
চরের পরে মস্ত নদী দেখা যায় না কূল,
মেঘের রঙে মাটির রঙে এমন ঢলাঢলি!
ধূ-ধূ ধূসর জলে জড়ায় লাল মাটির রং
তীব্র স্রোত দিগন্তে টল্‌মল্‌।

সত্যি কী সুন্দর
বিকেলবেলায় পদ্মানদীর চর।
ইলা বললে এই আমাদের মনের মতো ঘর।
আকাশ ভরা ভালোবাসার চির-চপল ভঙ্গি,
যেদিকে চাই পদ্মানদী দিনরাত্রির সঙ্গী।
ঠাণ্ডা হাওয়া, টাট্‌কা ইলিশ, নরম ঠাণ্ডা মাটি,
একমাত্র অসুবিধে নেই ইলেকট্রিসিটি।

সত্যি বড়ো ভালো লাগে ইষ্টিমারে আরাম ক'রে ব'সে
কাল সকালেই কলকাতাতে পৌঁছবো তায় সন্দেহ নেই জেনে
চেয়ে-চেয়ে দেখতে চরের নির্জনতা, শ্যামলতা,
এই আষাঢ়ের পদ্মানদীর উচ্ছলতা,
মনে মনে-ভাবতে, আহা এখানে কি থাকা যায় না এসে!

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

আকাশ ভরা এমন আলো, এমন স্বাধীন সুস্থ হাওয়া, স্নিগ্ধ নরম মাটি,
তিনদিকে দিগন্ত ছুঁয়ে পদ্মানদীর জল
ঢলোঢলো লাবণ্যে উচ্ছল ;
অন্যদিকে শ্যামল ধানের গ্রাম,
আধেক চাঁদের মতো বাঁকা খালের পারে ছোট্ট ইষ্টিশান।
সাজসজ্জা চক্ষুলজ্জা চুলোয় দেবো
যত ইচ্ছে দুধে মাছে মোটা হবো,
এমন স্বর্গ ছেড়ে কোথায় যাবো ?—কলকাতায় কী আছে !

ইতিমধ্যে ঘুরলো আবার ইষ্টিমারের চাকা,
কাব্যি অনেক হ'লো, এবার চা।

আমরা যখন নানারকম খাবার খাচ্ছি, চুমুক দিচ্ছি চায়ে
হঠাৎ দেখি চেয়ে
একেবারে কিনার ঘেঁষে যাচ্ছে ইষ্টিমার ;
প্রচণ্ড তোলপাড়
লাগছে জলে ; কৌতূহলী বৌ-ঝির দল ঘরকন্না ফেলে
দেখছে ইষ্টিমারের কাণ্ড ; হয়তো ভাবছে এই বর্ষায় বাড়িখানা টিঁকলে বাঁচি।
কত মাটি গিললো পদ্মা, ভাঙলো কত হাজার বাড়ি, তলিয়ে গেলো কত
রাজার বাড়ি,
রাক্ষসীটার শান্তি তবু নেই !
ইষ্টিমারের ধাক্কা লেগে শোঁ-শোঁ শব্দে মস্ত-মস্ত ঢেউয়ের পরে ঢেউ
লাগছে পাড়ে, ভাঙছে শাদা ফেনায়।
ইলা বললে মনে পড়ছে পুরী
এমনি ঢেউয়ে লুটোপুটি দাপাদপি মনে কি নেই ?
গ্যাখো, গ্যাখো, কালোকেলো নেংটি-আঁটা ছোট্ট ছেলেগুলো

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

দাঁড়িয়ে আছে নির্ভাবনায় পা ডুবিয়ে জলে,
এক্ষুনি ঢেউ এলো ব'লে, ঐ যে আসে,
দৌড় দিয়েছে ঢেউয়ের সারি ঊর্দ্ধশ্বাসে
কারে ওরা করছে তাড়া ? টলমলালো উপুড়-করা ডিঙিগুলো,
টানো টানো, ডাঙায় তোলো—ঐ যে এলো
শোঁ-শোঁ শব্দে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো
ছ'টা ছোট্ট কালো মাথা—বাস্‌রে ওদের সাহসটা কী !
এমন ঢেউয়েও হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি,
পদ্মা নিয়েই বুঝি ওদের খেলা !
ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জলের গলা,
এক দুরন্তে ছ'টি ছোট্ট দুরন্ত দেয় ডুব—
কোথায় গেলো ?—আরে ঐ তো খানিক দূরে ডাঙায় উঠে
ইষ্টিমারকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে জোর গলায়,
জ্ব'লে উঠছে পিছল আলো জলে-ভেজা চিকচিকে গাগুলোয়—
আরে আরে কী সর্বনাশ ! ঐ যে ভেসে যাচ্ছে একটা ছেলে
ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতো ছুটে।
ঐ ডুবলো, ফের উঠলো—আর-একঠা ঢেউ বাঘের মতো লাফিয়ে প'ড়ে
কোথায় নিয়ে গেল ওকে ? হায় হায় ও তলিয়ে গেলো,
হাঁ ক'রে সব মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে ডাঙায়,
এতগুলো চোখের সামনে ছেলেটা কি ডুবে মরবে—আহা !
কোথায় সারেঙ ডাকো তাকে থামাক ইষ্টিমার !
কী আশ্চর্য কারো কোনো সাড়াশব্দই নেই !
তুমিও বেশ—খাচ্ছো চীনেবাদাম ভাজা !
এ কী কাণ্ড ! ঐ তো দেখি ভেসে উঠলো
হাঁড়ির তলার মতো কালো ছোট্ট মাথা,

চৈত্র, ১৩৪৭

হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেললো পাটের গোড়া,
হেঁচড়ে টেনে প'ড়ে রইলো পাটক্ষেতের কাদায়
একটু পরেই লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে দৌড়—
সাবাস ছেলে !

দেখতে-দেখতে কূল হারালো ইষ্টিমারের ঘূর্নি,
আদিগন্ত ছুটে চলে খোলা জলের শূর্তি।
টিনের বাড়ি গাছের সারি কৌতূহলী বৌ-ঝির ভিড় হারিয়ে গেলো ;
সূর্য-ডোবার আবির রঙে হালকা ডিঙি নৌকোগুলো
গাল-ফোলা লাল-কম্‌লা পালের ক্ষণ-লীলায়
মাতলো সন্ধেবেলায়।
বাইরে চেয়ার টেনে আমরা ব'সে
দুটি একটি কথা বলছি মৃদুস্বরে,
এমন সময় সোনা-জ্বলা নদীর জলে
সূর্য ডোবালো তার টকটকে লাল গলা।
লাগলো আগুন আকাশ জুড়ে মেঘে-মেঘে
পশ্চিমে ছড়িয়ে দিলো বিয়ের রাতের রং
মেঘের উপর মেঘ চড়লো হলদে হোলি গোলাপি বেগনি—
আহা আহা কী সুন্দর, কতদিন যে এমন দেখিনি।

মস্ত বড়ো নদী পদ্মা বিচিত্রবরণ,
দিনরাত্রির আলোছায়ায় ছড়ায় রংবেরং,
প্রাণ বিলোয় বাংলাদেশের বাঁহান্ন পরগনায়।

তারপরে রাত নামলো।
আকাশ-তলে নদীর জলে ছায়ার কোলাকুলি।

চৈত্র, ১৩৪৭

ঢেউ উঠলো, হাওয়া ছুটলো, ফুটলো তারার গন্ধহারা কুন্দ
আরো ঘণ্টা তিনেক পরে আসবে গোয়ালন্দ।
হারিয়ে গেছে অন্ধকারে গাছপালার নীল কিনার
মিলিয়ে গেছে মেঘের সিঁড়ি রাজার বাড়ি উঁচু মিনার
কালো জলের কলকলানি শুনতে-শুনতে ঘুম পেয়ে যায়।
এখন ডিনার।

রাত বাড়লো।
মস্ত রাতের হৃদয় চিরে কালো পদ্মা ছুটে চলে
সার্চলাইটের তীব্র তীরে বেঁধা
ঢেউ দুলছে, ফেনা ফুলছে, এ-কূল ও-কূল কালোয় হারা
দিগন্তহীন অন্ধকারের ঘোমটা-পরা মস্ত রাতে
বাইরে রেখেছে ঠেলে ছোট্ট কেবিন ইলেকট্রিকের আলো জ্বেলে।
ঝক্‌ঝক্‌ঝক কাঁপছে কেবল ইষ্টিমারের ছন্দ,
আর তো সময় কাটে না, কখন গোয়ালন্দ!

খোঁয়াড়ি

সমর সেন

মুছে গেল রাতের জঞ্জাল ;
এবার এক কাপ চা, ঠাণ্ডা স্নান,
সূর্য ওঠে কুয়াসা ছিঁড়ে, মিনার জ্বলে,
আবার সুরু হয় নগরের প্রাণ।

কানে বাজে কাল রাতের গান

শব্দহীন মন,
বিরস এ দিন আমার।
শ্বেতপাথরের সূর্যের আলো লাগে।
নবাবী আমল, সৌখীন প্রাণ,
সন্ধ্যায় লাল মস্‌জিদে আজান
কানে বাজে কাল রাতের গান
... ...
আশ্চর্য ব্যাপার সব অভ্যাসে পরিণত,
সবি নিয়তির খেলা, বিষচক্রে জীবন ঢিমে।

আর কতোদিন এ নগর
হাততালি দেয় সৌখীন নাগর।
... ...
ভাঙা পাথর, মাইলের পর মাইল ;
জরাগ্রস্ত মস্‌জিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব ;

চৈত্র, ১৩৪৭

তখন নবীন শৃগাল বারে বারে ডাকে
ভুঁইফোড়ের জয়গর্বে,
কোটরে প্রাচীন পশু শিথিল, শীতে স্তব্ধ।

উজ্জীবনের উৎস নেই,
এ গাম্ভীর্য সমাহিত শান্তির নয়,
অবক্ষয়ের উচ্ছিষ্ট মাত্র।

... ...

ধূসর কালের ছায়া! দিগন্তে জাগে কালো পাহাড়,
মরুভূমি আলোড়িত ভয়াল ঝড়ে,
এ প্রাচীন নগরে
উর্ধ্বগ্রীব উট সন্তর্পণে চলে,
দিগ্বিজয়ী মদন সহরে নরক জ্বালে।

চৈত্র, ১৩৪৭

জনৈক নিউরটিক

(ফ্রয়েড অনুসরণে লেখা)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

একদিন নিজের ক্ষীণ ছায়ার দিকে
একদৃষ্টে চেয়ে থাকার পর
আকাশে দেখেছি বিরাট ছায়াপুরুষ।
আজ মাঝরাতের ট্রেন থেকে হঠাৎ চোখে পড়ল
বিশাল প্রান্তরে অস্ফুট জ্যোৎস্না।

—আমাকে মনে রেখো
ওগো আমাকে মনে রেখো—
এ উদ্দাম প্রার্থনা ভুলেছি ত বহুদিন।
তবুও অস্ফুট জ্যোৎস্নায় বিশাল প্রান্তর
সেই বিরাট ছায়াপুরুষকে ডাকল আজ।
রক্তে শুনি ট্রেনের শব্দের প্রতিধ্বনি।
অতীত দুপুরগুলো ভিড় ক'রে আসে
ফেরিওলাদের ক্লান্ত ডাক
আর অদ্ভুত তোমার সান্নিধ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তারপর নাগরিক শীতল ঔদাসীন্য মনে হল
ও কিছুই নয়।
মেয়েরা শুধুই মাটির সঙ্গে বন্ধন রাখার গ্রন্থি
আমাদের বিচ্ছেদ তাই
আমায় দেবে আনন্দলোকের পাথেয়।

নাটকের দেবতা তবু পরিহাসরসিক
পুনর্মিলনের চূড়ান্ত পরিস্থিতি তাই—
ট্রাম নয়, ট্রেন নয়, সিনেমাও নয় কোনো,
শবযাত্রীর বিমর্ষ হরিনাম তোমার স্মরণে শুনি।

গ্যাসের আলোয় চোখে পড়ল
তোমার মাথার কাছে বেয়াড়া ফুলের গুচ্ছ
ও ফুল বড় প্রিয় ছিল,
আশ্চর্য।
তোমার আর আমার—

হরিধ্বনি, শ্মশানযাত্রীর বিমর্ষ হরিধ্বনি···

ওরা মোড় বেঁকে যায়
গ্যাসের আলোয় দেখা চকিত ফ্যাকাশে মুখ
চোখের সামনে আনে উদ্দাম প্রার্থনা আমাদের
—আমাকে মনে রেখো
ওগো আমাকে মনে রেখো—

তৃতীয় অধ্যায়

—ও কিছুই নয়
ফাঁপা ছায়াটা আমার পেছনেও ঘুরেছে ত বহুদিন
তারপর কোনো সন্ধ্যায় দীর্ঘ, দীর্ঘ হ'তে হ'তে
পথ আগলে দাঁড়াবে;
স্মৃতির গুহায় পরিচিত পায়ের প্রতিধ্বনি ক্ষীণ হবে
তারপর অন্ধকার, আর অন্ধকার।

তবুও অসহ্য, অসহ্য মনে হয় :
ফ্যাকাশে মুখের ভারে স্মৃতির সুতোয় বাঁধা
অতীত দুপুরগুলো
বিকৃত মুখোস প'রে ঘোরে চারিধারে।

শেষ অধ্যায়

And so I cross into another world. (D. H. L.).

চ'লে আসার দিন তোমার মুখ কি মনে পড়েছিল
গ্যাসের আলোয় দেখা ফ্যাকাশে তোমার মুখ ?
আর তারপর আমলকির পাতায়-পাতায়
ঝিরঝির ক'রে উঠ্‌ল অন্ধকার
আর ট্রেনের গতি হল রুদ্ধশ্বাস।

ক্লান্তির কঠিন মেঘ স'রে উঁকি দিল আজ
নীল, নীল আকাশ
আর এতদিন, এত দীর্ঘ দিন পরে
আজ বুঝি এসিয়া পেল প্রমিথিউসের মিলন চুম্বন।

কত অসহ্য রাত
ক্লান্ত গোঙানি যেন
ভিড়াক্রান্ত চায়ের দোকান কত।
সামনের অন্ধকার আজ থরথর ক'রে কাঁপছে
অধীর সম্ভাবনার আবেগে।

চলে আসার দিন তোমার মুখ কি মনে পড়েছিল—
গ্যাসের আলোয় দেখা ফ্যাকাশে তোমার মুখ ?

চৈত্র, ১৩৪৭

আর তারপর আমলকির পাতায় পাতায়
ঝিরঝির ক'রে উঠল অন্ধকার
আর ট্রেনের গতি হল রুদ্ধশ্বাস।

তারপর শালবনের ঘন সবুজে
টলমল ক'রে উঠল ভোরের আলো
আর অজানা স্টেশনে গেঁয়ো মেয়ের দল
বুনো ফল আনল
নাগরিক বিকৃত মানুষেরা
ভুলে যাওয়া দুঃস্বপ্নের মত।
আজকের কুমারী আলোয়
থেয়ার খালি পা থেকে পড়ল
প্রথম রক্তবিন্দু মরাধুলোর মরুভূমিতে
কী নির্মল, কী পবিত্র!

তারপর পাহাড়ের অতল গাম্ভীর্যে
যাত্রা হল শেষ।
বোবা ঐশ্বর্যের আবেগে শুদ্ধ পাহাড়
আর আকাশ সবুজ, কী অদ্ভুত সবুজ।
খেয়ালি পথের হাল্কা হিজিবিজি আঁকা
এখানে অদ্ভুত বন।
পাইনের অতল মর্মরতায়
আমার নতুন জন্ম
আমার নতুন জন্ম
গম্ভীর আকাশের আহ্বানে।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

পাহাড়ের গায়ে দেখি
নাগরিক ক্ষীণ ছায়া নয়
আকাশের সেই বিরাট পুরুষ মুখোমুখি যেন।

তোমায় পেয়েছি আজ
ওগো তোমায় পেয়েছি
—সেই ফ্যাকাশে মুখ নয় আর
আনন্দ জ্যোতির মাঝে অনন্ত বিকাশ।
কানে আসে উদাত্ত ছন্দ
সঃ ঈষঃ পরমঃ প্রেমরূপঃ।

চৈত্র, ১৩৪৭

হাট

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কী আছে আমার ? মনে হ'ল ভাঙা হাটে বসে ;
কী আছে আমার ? —দূরে বাঁকা পিচ্-ঢালা পথ
আসন্ন ঝড়ের দিকে চেয়ে। বাঁকা মানুষের স্রোত
সমান দুধারে। এর মাঝে
সব চেয়ে নিরর্থক ভাবা : কী আছে আমার !

বারুদের গোলা, ক্ষেত, শূন্য এ খামার।
গুণ্ঠনের অন্য পাশে চোখের বিদ্যুতে
কী ছায়া চম্‌কালো।
আসন্ন ঝড়ের দিকে রাত জমকালো।

মানুষের মিনে করা এখানের হাট
ভেঙে দিলো পশ্চিমের মেঘ। দূরে মাঠ।
রোমাঞ্চিত আমাদের এ ভাবনাগুলি।
মানুষের কলরোল, ভাঙা হাট, মাঝি, কুলি,
তুমি, আমি, ও, সে, সবাই,
এই বাঁকা পিচ্-ঢালা পথে চ'লে যাই
আসন্ন ঝড়ের মুখে।

বেঁচে আছি কি জানি কী সুখে !

আমার কী আছে প্রভু ?
আমার সামান্য লাভ, সামান্যই ক্ষতি,
তোমার সামান্য খুসি। তবু

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

আসন্ন ঝড়ের দিকে বাঁকা পথ যে-ইসারা আঁকে,
স্থবির পাহাড়গুলি তারি ফাঁকে ফাঁকে।
জানাবার ভাষা নেই, মনে-মনে বলি ঃ
এ পৃথিবী আমাদের।
ডিসট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল রাত্রির ফুলের মত।
স্তব্ধ শীর্ণ আমাদের ইস্পাতের পথও
অকস্মাৎ স্পন্দিত হয়েছে।
আমাদের দেহ দিয়ে কত ট্রেন পার হয়ে গেছে।
ভাঙা হাটে আসন্ন ঝড়ের দিকে চেয়ে
মনে হ'ল তবু :
আমার অনেক আছে, আমিই স্বয়ম্ভু।

হাইনে অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Als die junge Rose blühte

গোলাপ-চারায় ফুল ফুটেছিলো সে-দিন সবে,
নিশীথে কোকিল ডেকেছিলো বার বার,
চুম্বনঘন প্রথম সোহাগে সহসা যবে
করেছিলে তুমি আমাকে অঙ্গীকার ॥

আজ হেমন্ত পাপ্‌ড়ি খসায় গোলাপ থেকে ;
নীরব বেহাগ, কোকিল নিরুদ্দেশ ;
সঙ্গতিহীন শূন্যে আমাকে একাকী রেখে
তুমিও ছেড়েছো ম্রিয়মাণ প্রতিবেশ ॥

হাড়-হিম রাত ফুরাতে চায় না, কেবলই বাড়ে ;
পায় না তোমার সাড়া অন্তর্যামী ।
ভূতের বেগার খাটতেই স্মৃতি চেপেছে ঘাড়ে ;
সত্যের ফাঁক স্বপ্নে ভরাই আমি ॥

২

Das gelbe Laub erzittert

পীত শাখে ওই ধরেছে কাঁপন,
ঝরকে ঝরকে পাতা ঝরে ;
শুকায় যা-কিছু ললিত, মোহন,
ধূলার কবরে লুটে পড়ে ॥

অটবিশিখরে জ্বলে থেকে থেকে
সবিতার শোকাবহ জ্যোতি ;
মনে হয় শেষ চুম্বন রেখে
দ্রুত চ'লে যায় ঋতুপতি ॥

অশ্রুফল্গু সহসা আবার
ভাসে পুরাতন উচ্ছ্বাসে ;
এ-ছবি নেহারি সেই দিনকার
বিদায়ের বেলা মনে আসে ॥

জানিতাম আশু তোমার মরণ,
যেতে হলো তবু ডাক শুনি ;
তোমার উপমা মুমূর্ষু বন,
আমি পলাতক ফাল্গুনী ॥

৩

Es glänzt so schön die sinkende Sonne

নির্ব্বাণমুখ রবিরে রম্য লাগে ;
তোমার চোখের রুচি ততোধিক ধন্য ।
রাজীব আঁখির দীপকে, অস্তরাগে
আমার হৃদয় শোকে আজ অবসন্ন ॥

সন্ধ্যাশোণিমা ঘোষে বিচ্ছেদ নভে,—
পৃথগাত্মার যাতনাজাগর রাত্রি :
অশ্রুসাগরে অচিরাৎ দ্বিধা হবে
অন্ধ ভিখারী, সুনয়নী বরদাত্রী ॥

স্মরণী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শব্দ শোনো, চূর্ণকাচে ভীত ইঁদুরের।
শকুনিরা আকাশে উদ্যত—
কী ভীষণ পরিণাম! এ যুগের রথচক্রতলে
আমরাও ইঁদুরের মতো।

এখনো অনেক স্মৃতি এ-স্থবির হৃদয়কে ঘিরে।
এখানে হারালো দেহ বহু ক্লান্ত স্ফীত মানুষেরা।
নিভেছে অন্তিম আশা ব্যর্থতায় বিতৃষ্ণা-তিমিরে,
তাইতো হৃদয়-হ্রদ শ্মশানের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

হাওয়া নেই, অদ্ভুত স্তব্ধতা—
বাহিরে নড়ে না আর কৃষ্ণচূড়া ক্ষুদ্র শাখাটিও
কেবল প্রাসাদকক্ষে নির্লজ্জ রেডিয়ো।
বার-বার নেভে-জলে ধূমাঙ্কিত জীবনের চিতা।

নির্লিপ্ত বিষণ্ণ মুখে জীবনের শূন্য বালুচরে
অন্তিম হাওয়ায় শেষ আমন্ত্রণ শুনি।
দ্যুলোকে-ভূলোকে যত স্বপ্নসৌধ ভেঙে-ভেঙে পড়ে
কল্পনায় চিত্ত তার বুনি।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

অনেক উদ্‌ভ্রান্ত গান হ'লো গীত আগত দুর্দ্দিনে,
উষ্ট্র লয়ে রিক্তপথে ফিরে গেলো বহু যাযাবর।
কতো ঋতু সর্ব্বস্বান্ত! তবু পথ নিলে না তো চিনে,
মধ্যপথে শূন্যজীবী রৌদ্রে ঝড়ে আজো জাতিস্মর।
জীর্ণ চাকা ঘোরে না তো আর—
অন্তিম প্রণয়ে ফের আনো বৃথা রক্তিম জোয়ার॥

চৈত্র, ১৩৪৭

পার্টির শেষ

বিষ্ণু দে

গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়ীতে আসে নিমন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে—
জমিদার, দারোগা, হাকিম আর কলের মালিক দলে দলে
চর্ব্য চোষ্য পানীয়ের সুদৃশ্যা ও সুশ্রাব্যার দর্শন-আশায়।
নিচে হ্রদ এঁকে বেঁকে লাল জলে আঁকাবাঁকা পাহাড়ের গায়
বুদ্বুদ ছড়ায়, পালে সূর্যাস্তের সোনা লাগে, দঙ্গলে দঙ্গলে
হাট থেকে চাষী ফেরে। গাংটার ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত জঙ্গলে
নবাবী সূর্যাস্ত ঝরে। সন্ধ্যা জমে, উৎসবের মুখর সোনায়
তাঁবু সারে সার, ধোঁয়া ওঠে, সদ্যমৃত শিকারের পাচ্য স্বাদে
মূল্যবান অবসাদে অতিথি সজ্জন হলে অবশ অসাড়,
রাজা শুধু ম্রিয়মাণ, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্ত্তকীর কলগীত গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝিবা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারি ঝাড়
একে একে নিভে যায়, বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়, পাহাড়ী সূর্যের আলো রক্তাক্ত সোনায়।

চলচ্চিত্র

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রস্থান

'মশা মেরে হাত নষ্ট, কাজেই সে-ভার
নিয়েছে হিটলারচন্দ্র ; বেচারা ইংরাজ।
স্বাধীনতারক্ষাকল্পে এদিকে তৈয়ার
স্বদেশী সিন্ধুক।
অই যুদ্ধের আওয়াজ!
ত্রিবর্ণ নিশান তোলো কেল্লায় এবার ;
যখন পরাস্ত গান্ধী, আসন্ন স্বরাজ।
সব্যসাচী আমি, বিনা অস্ত্রে বাজি মাৎ—
ভেদাভেদ নামে মাত্র ডাইনে আর বাঁয়।'
—এত বলি ত্রিপুরীর বীর জগন্নাথ
গেলা চলি। ধ্যানমগ্ন ভক্তদল গায়
'ধন্য প্রভু, তুমি যেন বাপুজি সাক্ষাৎ।'

সহসা বিস্মিত শিষ্য কীর্তন থামায়—
বিষণ্ণ বাজার কাঁদে : 'নিমাই নিমাই॥'

গ্রাম্য

শুনেছি একদা সোনালি ধানে
আকাশ তপ্ত সূর্য আনে।
বিকেলে হালকা হাওয়ার নাচে
হৃদয়ে ফুর্তি হয় ছোঁয়াচে।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

সম্প্রতি গ্রামে আছি। কোথাও
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা।
উপবাসী চাষা, ধান উধাও—
মহাজনদের পন্থা জানা।

আঁকাবাঁকা পথে দেখছি রোজ
পান্থজনের লটবহর।
পথে ভিক্ষায় চলেছে ভোজ—
চোখে চিত্রিত দূর সহর।

শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা—
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরখ করুক ধার।

সত্য

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দৈবানুগমে আপন খেয়ালে এসেছিলে এই জীবনে।
বনানীদাহের শেষ সমারোহ
মেঘেতে ললাটে ঘনায় বিমোহ
মাটির কালোয় আকাশের নীলে সাজালে নয়ন অঞ্জনে।

কি ক'রে ভুলিব সেই কথা ?
নৈর্ব্যক্তিক জীবনকাব্য সে তো কৃত্রিম বিমুখতা।
মানুষের প্রেম শরীর ঘিরিয়া বাড়ে
তাই অনুভূতি হৃদয়তন্ত্র
খোঁজে দেহমন-শিল্পমন্ত্র
পরাহত সুখে আত্মারে নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছাড়ে।

তোমার বহ্নি মোর প্রচ্ছায়ে জলে ওঠে নিষ্ঠুর
জানো না কি হায় কোথা ঝরে যায় কবিতার অঙ্কুর !
সেই বীজে যদি নাহি ফোটে শত
তত্ত্বকথার ফুল
রহে শুধু প্রাণ ইতিহাস-গত
হবে কি বিরাট ভুল ?
তপোবনে কভু থাকি নাই তাই জানি না তাহার দান
শুধু শুনিয়াছি সেখানেও ছোটে পঞ্চশরের বাণ।

প্রকাশ-বিপাকে দ্বন্দ্ব জাগেনি মনে।
আকৃতি-সীমার অতিক্রুত রূপ নিরূপিত বন্ধনে
আকুল করেনি। প্রসঙ্গ চেয়ে পদ্ধতি নয় বড়ো।

চৈত্র, ১৩৪৭

তাই মিলনের ও প্রতিষেধের
ঘন অরণ্য স্মৃতিস্বপ্নের
মৃত পল্লব খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদা করেছি জড়ো।
মৃত্তিকারোহী লতাপ্রতানের সুচিকণ সঞ্চয়
স্পর্শধন্য দগ্ধ তরুর আমরণ বিস্ময়।

চৈত্র, ১৩৪৭

আলো

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

নব্য নগরের বুকে মানুষের ভিড়
বিদ্যুতের বাতি জলে দিবসে ও রাতে,
অশ্রান্ত উদ্যম-কেন্দ্র ; গৃহশান্তিনীড়
মুহূর্তে মুহূর্তে নষ্ট বৈচিত্র্য আঘাতে।
আকর্ষণে বিকর্ষণে জাগ্রত চেতনা
ক্ষণে ক্ষণে দুঃখে সুখে ব্যস্ততায় মেশা,
জীবনের বক্ষে নাচে চঞ্চল বেদনা
প্রতি ক্ষণে ভ'রে ওঠে মরণের নেশা।
কালের প্রদীপ্ত আলো যুগের প্রভাব
মুহূর্তে মুহূর্তে হেথা আকর্ষণ করে
সরল পল্লীর প্রাণ—শান্ত সে স্বভাব,
তীব্র জ্যোতি বক্ষে যথা পতঙ্গেরে ধরে।
অন্ধকারে বিদ্যুতের প্রখর এ আলো
দুঃখের উন্মাদ সুখ, তবু এই ভালো।

প্রগতি সাহিত্য

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রগতিসাহিত্য আরাধনায় অক্ষমতার পুনরুক্তিতে অনেক সহজ পাঠক নাস্তিক হয়েছেন। কারণ, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, নিখিলভারত প্রগতিলেখকসংঘের কোলকাতায় শুধু সাড়ম্বর উদ্বোধনই সার হ'ল, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও গোস্বামীর যুগ্মসম্পাদিত গ্রন্থ "প্রগতি" যে "সাহিত্যিকদের" তেমন সুনজরে পড়েনি তার প্রমাণ, আজ পর্যন্ত বইটির তেমন সমালোচনাই হল না। তা ছাড়া এখানে ওখানে, ছাত্রমহলেই প্রধানত, প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে নানা সম্মেলন ত লেগেই আছে—ফল কিন্তু গড়ায় খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পর্যন্ত। তার উপর যুদ্ধ বাধল: কাগজবিক্রেতা, প্রেসওয়ালা থেকে সুরু করে চারদিকেই প্রতিকূলতার রুদ্ধ প্রাচীর। এ দুর্দ্দিনেও "ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘ" যে একটি সংকলন বার করতে পেরেছেন তার জন্য উক্ত সংঘের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এবং প্রকাশক যখন জানাচ্ছেন যে "ক্রান্তি"র সাহিত্যিক উৎসাহ "মূল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত," মূল প্রগতি সংঘ যে এখনও সক্রিয় নাস্তিক মহলে তার প্রমাণ পৌঁছুল। তা ছাড়া দাম খুব সস্তা—আট আনা মাত্র। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ আছে। যাঁরা প্রগতি সাহিত্যের মোহমুক্তিতে মূর্খ আনন্দও পান তাঁরাও উক্ত গ্রন্থ কিনে পড়বেন। আমি এ বইএর প্রচার কামনা করি।

অবশ্য উক্ত কামনার অর্থ এ নয় যে এই সঙ্কলনের প্রত্যেক কথায় আমার সায় আছে। বস্তুত প্রগতি সাহিত্য সমালোচনার ধারা আজ যে দিকে যাচ্ছে আমার মতে তা অত্যন্ত ভয়ের কথা। শুধু সাহিত্যের দিক থেকে নয়, মার্কস্‌বাদের দিক থেকেও। মার্কস্‌দর্শনের কাছে আমরা শিখেছি যে সাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। প্রথমত আমি মানি এ দর্শনের চরম আদর্শ বিজ্ঞানের প্রণালী। বিজ্ঞান ফ্যাক্ট-এর উল্লেখ করে মাত্র, মূল্য নির্ণয় করে না। ফলে সাহিত্য

* ক্রান্তি: নতুন সাহিত্য ভবন। আট আনা।

ও সমাজের সম্বন্ধ মনে রেখে আমরা এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে কোন সাহিত্যে কি কি ভ্রান্তি আছে, কোন সাহিত্য ফিউড্যাল, কোন সাহিত্য বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ইত্যাদি, কিন্তু এ সমস্তই ত হবে statements of facts : এর মধ্যে মূল্যনির্ণয় কোথায় ? সাহিত্য ভাল কি মন্দ এ কথার মীমাংসা করতে হলে প্রয়োজন সাহিত্য-সমালোচনার মূল নীতি, যা বিজ্ঞান নয়, যার উদ্দেশ্য মূল্যনির্ণয়ই। অর্থাৎ আজ সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে বা প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাল কবি কি মন্দ কবি তার বিচারের জন্য প্রয়োজন নিছক সাহিত্যিক মাপকাঠি। এবং সে জিনিষটা যে কি তার খবর পাওয়া যাবে নন্দনতত্ত্ব নামক সম্পূর্ণ পৃথক পাঠাভ্যাসে : সমাজতত্ত্বের সেখানে কি বলার থাকতে পারে ? তবে আজকের চলতি সমাজ তাঁদের মধ্যে কি কি illusionএর হেতু তাঁদের মধ্যবিত্ত পারিপার্শ্বিকের দরুন হতাশা আছে কি না, পলায়নী বৃত্তি আছে কিনা এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক বিচারসাপেক্ষ, অর্থাৎ তার মীমাংসা করবেন সমাজতত্ত্ববিদ। ধরুন, এলিয়টএর Murder in the Cathedralএর সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা দুর্ব্বুদ্ধি বা নির্ব্বুদ্ধি : তবুও সমাজতত্ত্ববিদ অনায়াসে দেখিয়ে দেবেন এ নাটক ভ্রান্তিতে ভর্ত্তি।

সংস্কৃতির অন্য আর একটা দিক ধরা যাক না। আইনস্টাইনের গণিত গণিত হিসেবে কতখানি নির্ভুল তা কি শুধু গণিতজ্ঞদেরই জানবার কথা নয় ? তাঁর সমাজ হয়ত বহুদিক থেকে তাঁর আরও অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করেছে। এ সব বিচার করবে সমাজতত্ত্ব। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদকে গণিতজ্ঞের শরণ নিতে হবে বা নিজেকে গণিতজ্ঞ হতে হবে যদি তিনি জানতে চান আইনস্টাইন্ সত্যিই কতটা এগুলেন।

কিম্বা দর্শনের কথা ধরা যাক। বার্কলির বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক মূল্য যাচাই করতে হলে শুধু এটুকু বললে চলবে না যে তিনি বুর্জোয়া দার্শনিক। লেনিনও শুধু তাই বলে শেষ করেন নি। নিছক দার্শনিক যুক্তি দিয়ে তিনি এ বিচার করতে চেয়েছেন। মূল্যনির্ণয়ের স্বতন্ত্র প্রণালী আছে যা শেখবার

জন্যে বহু কষ্টে সাইবেরিয়ায় বসে তিনি যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভেবে বিস্ময়বোধ না করে পারা যায় না :

"I found that it is indeed necessary to take a serious account of Neokantianism........I could not control myself, for I recognise my backwardness in philosophic matters *and do not intend to write on these questions until I learn more about them.* At present I am engaged in a study of those subjects and have started with D'Holbash and Helvetius. and I intend to turn to Kant. *I have secured the chief works of the most important classical philosophers."* (ইটালিকস আমার)

আমাদের প্রগতিবাদী সাহিত্যিক সমালোচক যদি সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করতে চান তাহলে এ অধ্যবসায় ও দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া তাঁর চলবে কেন? সাহিত্যিক শিক্ষা ছাড়া সাহিত্যিক মূল্য তৈরী হয় না ; এবং সাহিত্যিক মূল্য শুধু সাহিত্যেরই মূল্য : সমাজের আলোচনা আলাদা কথা।

চিত্রকলার কথা তোলা এখানে অবান্তর হবে না। সম্প্রতি মাতিস সম্বন্ধে বই পড়লুম একটা : এবং প্রগতিপন্থী বন্ধুরা আশ্বস্ত হতে পারেন এ বই রুশ চিত্রবিদ্ Alexander Rommএর লেখা : ইংরেজী অনুবাদটাও লেনিনগ্রাডে ছাপা। সেখানে লেখক দেখিয়েছেন মাতিস বুর্জোয়া সমাজের আত্মবিরোধ থেকে মুক্ত নন ; মাতিস পলায়নপন্থী, এবং আরও অনেক illusionএর বশবর্তী। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠ্‌ল শিল্পী হিসেবে এঁর মূল্য কতখানি, লেখক একেবারে মুক্তকণ্ঠ। কারণ শিল্পী হিসেবে তাঁর মূল্য শিল্পোৎকর্ষে : যার বিচারপদ্ধতি আলাদা—সামাজিক category নয়। কাব্যের বেলাতেও এ কথা সত্য। কবির মূল্য তাঁর কাব্যকুশলতায়, সামাজিক সচেতনতায় নয়।

আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই এখনি তর্ক উঠবে যে আমি সংস্কৃতিকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করতে চাই। এবং এটা মার্কসদর্শনবিরুদ্ধ। উত্তরে বলব এ দর্শনের পরিমাণ থেকে নতুন গুণে পৌঁছবার নৈয়াকিক পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য না করে এমন আপত্তি উঠতেই পারে না। সংস্কৃতির ভিত্তি সমাজ ; কিন্তু সংস্কৃতির সম্পূর্ণ নতুন একটা quality। জড়ের থেকে উৎপন্ন হয়েও জীবন

যেমন নতুন একটা quality, এবং তাই এর বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন। এবং এখানেই যান্ত্রিক জড়বাদ ও গতিশীল জড়বাদের তফাৎ।

তাই আমার মতে নিছক যাঁরা প্রগতিবাদী হবেন তাঁরা যেন সংস্কৃতির আলোচনা শুধু এই বলে শেষ করেন যে সংস্কৃতি কি ভাবে সমাজের মুখাপেক্ষী। যথা, সেক্‌স্‌পীয়রের সমাজ তাঁর কাব্যকে কী ভাবে প্রসঙ্গ ও আঙ্গিকের দিক থেকে বেঁধে দিয়েছে। এ পর্য্যন্ত বললে সেক্‌পীয়র ভাল কবি কি খারাপ কবি সে কথার কোন নিষ্পত্তিই হবে না। সে নিষ্পত্তির জন্যে আমাদের নিছক সমাজের স্তর থেকে সংস্কৃতির স্তরে (যা একটা নতুন quality) আসতে হবে: তবে সেখানকার ভালমন্দের মাপ কাঠি পাওয়া যাবে। এবং তখন আলোচনা হবে—সেক্‌স্‌পীয়রের পারিপার্শ্বিক অনেকেরই ছিল, কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক ত আর কারুর এল না। ফলে তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত এমন কোন শক্তি ছিল যার ফলে তিনি এ ধরণের কাব্যসৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন অথবা একটা বিশেষ প্রসঙ্গ ও আঙ্গিকের সার্থক সম্মিলন ঘটালেন। এ শক্তি কী, এ প্রশ্নের কাব্যজিজ্ঞাসা উত্তর দেবে, এবং সমাজতত্ত্ব সেখানে মৌন শ্রোতা মাত্র। কবির ইতর-বিশেষ নির্দ্ধারণ করবে সেই শক্তি; অর্থাৎ এটাই কাব্যবিচারের মাপকাঠি।

'ক্রান্তি' গোষ্ঠীর বন্ধুদের বলব তাঁরা যদি আজ সমাজসচেতন হয়ে প্রকৃত সাহিত্য গড়তে যান এর থেকে প্রমাণ হবে মাত্র তাঁরা কোনো বিশেষ এক রকম প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক খুঁজছেন। তবে তাঁরা ভাল কবি বা সাহিত্যিক হবেন শুধু তাঁদের সাহিত্যিক শক্তির ফলে; উক্ত আঙ্গিক বা প্রসঙ্গের গুণে নয়, উক্ত আঙ্গিক ও প্রসঙ্গের সার্থক ব্যবহারে। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমালোচনা লেখায় মন দিয়েছেন তাঁদের বলব সাহিত্যিক শক্তির ভালমন্দ বিচার করতে হলে সাহিত্যের মূল্য শিক্ষা করে তাই প্রয়োগ করুন—সমাজচেতনা দিয়ে এ মূল্যনির্দ্ধারণ না করেন যেন—নইলে যান্ত্রিক জড়বাদের হাত থেকে রক্ষা নেই।

উইলিয়ম হেনরি ডেভিস

যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একজন প্রিয় কবির মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছলো। আন্তর্জাতিক সংকটের গুরুভার সকলেরই মনে, তবু কবিতার কথা, কবিদের কথা চিন্তা করবার সময় যদি না থাকে তবে সভ্যতাই বৃথা। উইলিয়ম হেনরি ডেভিসের কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন তাঁর কবিতা জীবনের সহজ আনন্দ থেকে উদ্ভূত—যে-অনুভূতি সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিরল। যাঁরা পড়েননি, অথচ যাঁরা আধুনিক কাব্যের দুরূহতায় পরিশ্রান্ত, ডেভিসের কবিতা পড়লে তাঁরা জানবেন কবিতা শিশুপাঠ্য না-হয়েও কত সহজ হ'তে পারে, কত সহজে আনন্দ পেতে ও দিতে পারে। যা সহজ তাকে সহজভাবে বলা মোটেও সহজ নয়, আমরা সকলেই জানি। সেই দুর্লভ ক্ষমতা ছিলো ডেভিস-এর। শিশু, পশু, গাছ, ফুল, পাখি, গৃহহীন ভবঘুরের মুক্ত জীবন—তাঁর কাব্যের বিষয় মোটামুটি এই। তাঁর ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল রচনাগুলি কখনো ষ্টিভনসন-এর, কখনো ডি লা মেয়ারের, কোনো-কোনো মুহূর্তে এমনকি ব্লেকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ তাঁকে হয়তো মুখ্যত প্রকৃতির কবি ব'লেই চিনবে—ওঅর্ডসওঅর্থীয় অর্থে নয়—প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ওঅর্ডসওঅর্থ প্রকৃতিকেই জেনেছিলেন লেকজেলার কুটিরে রোজগার-না-করা আয়ের নিশ্চিন্ত আরামে, ইংলণ্ডের সাজানো বাগানে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে, তাই প্রকৃতিকেই মানবের পরমগুরু হিসেবে ভজনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। ডেভিসের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় আরো অনেকটা কাছাকাছি। যৌবনের অনেকগুলি বছর একদম ভবঘুরে হ'য়ে তিনি কাটান—বেশির ভাগ আমেরিকায়। সতেরোবার গোরু-মোষের জাহাজে আতলান্তিক পাড়ি দেন, আমেরিকায় মালের রেলগাড়িতে লুকিয়ে ভ্রমণ করেন বহুবার, তারপর একবার চলতি ট্রেনে উঠতে গিয়ে একটি পা কাটা যাওয়ায় ভবঘুরে জীবন সাঙ্গ ক'রে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই বছরগুলিতে তিনি কাজ যা করেছেন, কাজ না-করেছেন তার বেশি; খাবার দোকানের সামনে খদ্দের-তাড়ানো চেহারা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অন্তর্ধানের দাম আদায় করেছেন একবেলার আহার, আমেরিকায় শীতের আরম্ভে কোনো ছোটো শহরে দোকানের কাচ ভেঙে জুটিয়ে নিয়েছেন জেলখানায় তিন মাসের বিশ্রাম: গল্পের মতো শোনায় এ-সব, কিন্তু সবই সত্য। এ-সব কাহিনী তিনি নিজের মুখেই শুনিয়েছেন Autobiography of a Super-Tramp নামক অতুলনীয় বইতে, বর্নার্ড শ'র ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হ'য়ে যে-বইটি ডেভিসকে খ্যাতির চূড়ায় চড়ায়। ভ্রমণকাহিনী-জীবনস্মৃতি জাতের যত বই ইংরেজি ভাষায় আছে, তার মধ্যে ডেভিসের এই আশ্চর্য আত্মজীবনীর মতো বই আর হয়নি, কারণ এ-রকম জীবন অন্য কোনো ইংরেজ লেখক

এ-পর্যন্ত কাটাননি। দেশে ফিরে এসে চটি একটি পদ্যের বই ছেপে দরজায় দরজায় ফেরি ক'রে বেড়াবার গল্পও ভোলবার মতো নয়; কেউ কিনলো না বই, তারপর কিছু ডাকটিকিট কিনে বড়ো-বড়ো লেখকদের নামে একখানা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে চিঠি রইলো বই ভালো লাগলে দামটা যেন পাঠিয়ে দেন। উত্তর যাঁরা দিলেন তাঁদের মধ্যে বর্নার্ড শ অন্যতম, তিনি কবিতার সুখ্যাতি করলেন ও তিন কপি কিনলেন। এইভাবে শুরু হলো ডেভিসের সাহিত্যিক-জীবন। ক্রমে আর্থিক অবস্থা ভালো হলো, নিচু দরের বোর্ডিংহাউস ছেড়ে একটি বাড়ি দখল করলেন, তারপর একদিন রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ এক ক্যামেরাধারী এসে তাঁর ছবি নিয়ে গেলো। বুঝলেন তিনি বিখ্যাত হয়েছেন।

Autobiography of a Super-Tramp এখানেই শেষ। এ-বইয়ে মানুষটার সঙ্গে আমাদের একেবারে মন-খোলা পরিচয়, কিন্তু কবিকে পেতে হ'লে কাব্যগ্রন্থের আসরেই নামতে হবে। হ্যারল্ড মনরো তাঁর 'জর্জিয়ান' সংগ্রহগুলিতে ডেভিসকে সসম্মান আসন দিলেও ডেভিসের কবিতা আসলে জর্জিয়ান নয়, ব্রুক বা মেসফীল্ডের মতো পালিশ-করা মসৃণ চামড়ায় তাঁর কবিতার শরীর তিনি ঢাকেননি। তাঁর কবিতা বরং অত্যন্ত গা-খোলা, আকাশের তলায় জঙ্গম জীবনের টাটকা কড়া ফুর্তির হাওয়া তিনি বইয়ে দিয়েছেন তাঁর বেশির ভাগ রচনায়।

What is life if, full of care,
We have no time to stand and stare.

তাঁর ভ্রমণ কোনো গন্তব্যে পৌঁছবার জন্যে নয়, ভ্রমণই লক্ষ্য।

Sing out, my Soul, thy songs of joy;
Such as a happy bird will sing
Beneath a Rainbow's lovely arch
In early spring.

এই তাঁর কাব্যের মূল কথা। পথ-চলাই যার পেশা তার মনে রোদ, মেঘ, চাঁদ, ফুল, মাছরাঙা, পথের ধারে খেলা-ভোলা গরিবের ছেলে, দিন রাত্রির বিভিন্ন ভঙ্গি, ঋতুর লীলা—এ সমস্তই সোজাসুজি গিয়ে পৌঁছয়, যে-সহজ আনন্দ তোলে তা চির পুরোনো অথচ যেন সদ্যোজাত, কথায় তা বলতে পারাটাই কবিত্ব। ডেভিস ছিলেন সেই কথার মালিক, পথ-চলা, পথ-চলার কবি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চৈতালি কথাটি চৈত্র থেকে উদ্ভূত, চৈতালি চৈত্রমাসের ফসল। রবীন্দ্রনাথের এ-কাব্যগ্রন্থও তা-ই। শুধু যে এর বেশির ভাগ কবিতা চৈত্রমাসে রচিত তা নয়, বাংলার প্রথম গ্রীষ্মের উদাস আলস্য এতে বিজড়িত। তবে এ-বইয়ের নাম দেখে, বর্ণনা শুনে, প্রথম মনোরম কবিতাটি ('আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ-গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল') প'ড়ে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে যে-ধরনের প্রত্যাশা জাগতে পারে, সম্পূর্ণ বইটি তার পরিপোষণ করে না। মনে হ'তে পারে এ-বই ছুটির দিনে লেখা ও ছুটির দিনের পড়া, কর্মহীন গ্রীষ্মের উন্মাদনা ধরা পড়েছে এর ছোটো-ছোটো লিরিকে, কিন্তু আসলে বইটি অন্য জাতের। সে-উন্মাদনা আছে, কিন্তু যথেষ্ট নেই; কিংবা সে উন্মাদনাই এর একমাত্র এমনকি প্রধান বিষয়ও নয়। 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে'র কৈশোরিক মধুরিমা, যা প্রাক্-'মানসী' রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়, 'চৈতালি'তে আর ফিরে এলো না, যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে এর প্রায় সব কবিতাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-'প্রভাতসঙ্গীতে'র সমধর্মী।

বস্তুত, 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র পরে 'চৈতালি'র আবির্ভাব একটু বিস্ময়কর। আবার 'কথা' 'কাহিনী' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' যে 'চৈতালি'র নিকট-পরবর্তী এ-কথা মনে রাখলে এ-মীমাংসাই গ্রহণ করতে হয় যে নদী যেমন হঠাৎ এক-এক জায়গায় মাটির বুক চিরে একটি সরু আঙুল পাঠিয়ে দেয়, তারপর শান্ত একটি খাল মৃদুগতিতে গ্রামের ভিতর দিয়ে ব'য়ে চলে, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত রচনাতেই অগ্রগমনের আগ্রহ নেই, কখনো কোনো-কোনো রচনাগুচ্ছ আশে-পাশে ছিটকে পড়েছে, এমনকি পিছনের টান এড়াতে পারেনি। 'চৈতালি' রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু

---

* **রবীন্দ্র-রচনাবলী : পঞ্চম খণ্ড : বিশ্বভারতী।** এই খণ্ডে আছে : কবিতা ও গান—চৈতালি; নাটক ও প্রহসন—কাহিনী; উপন্যাস ও গল্প—নৌকাডুবি; প্রবন্ধ—বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য।

তার অংশও নয়; মূল স্রোত থেকেই উৎসারিত হ'য়ে তা পাশে স'রে দাঁড়িয়েছে; কবিপ্রতিভার ক্রমিক পরিণতির আলোচনায় 'চৈতালি' অপ্রধান, যদিও বিচ্ছিন্ন কাব্য হিসেবে এ পদ্মার সরু একটি আঙুলের মতোই সরস সুন্দর।

'চৈতালি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণাও যে এই রকম, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো 'রচনাবলী'র 'সূচনা'য় :

> নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে আসা নানা কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হ'য়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পারে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে, খানিকটুকুর সীমানা নিয়ে একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল তার সঙ্গে চারদিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি এক টুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

অর্থাৎ 'মানসী' 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে বিচিত্র পরিণতির স্রোত এ পর্যন্ত আমরা অনুধাবন ক'রে এসেছি, 'চৈতালি'তে এসে দেখছি যেন তা হঠাৎ স্তম্ভিত, 'স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে······তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।' আসলে অবশ্য স্রোত স্তব্ধ হয়নি, নানা নতুন দেশ দখল ক'রে পূর্ণবেগে ব'য়ে চলছিলো, 'চৈতালি'ই স'রে এসেছিলো এক পাশে, বাসা বেঁধেছিলো পুরোনো পরিচিত গ্রামে। এই হঠাৎ-থমকানোই এতে সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য করবার। 'চৈতালি' এই অর্থেই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত।

'চৈতালি'র বেশির ভাগ কবিতাই পদ্মার বুকে বোটে ব'সে লেখা (সর্বজন-বিদিত 'হে পদ্মা আমার' এ-বইয়েরই অন্তর্গত)। কবিতাগুলো বেশির ভাগই চতুর্দশপদী, সবগুলোই পয়ারজাতীয় ছন্দে লেখা। পূর্বে কোনো প্রবন্ধে বলেছি যে সনেটে রবীন্দ্রপ্রতিভা কোনোদিনই খুব আরাম পায়নি, সনেটের নিয়মে-বাঁধা, মাপে-ছাঁটা আঁটোসাঁটো সংকীর্ণ গণ্ডী স্বভাব-উচ্ছল রবীন্দ্রনাথের মোটে উপযুক্তই নয়। এ-সত্য 'চৈতালি'তে পরিস্ফুট হয়েছে একটু অদ্ভুত-

ভাবে। প্রায়ই দেখা যায় যে এক বিষয়ে একটি সনেট লিখে তিনি তৃপ্ত হননি, তিনটি, চারটি কি পাঁচটি লিখেছেন, অথচ সেগুলো ইওরোপীয় ধরনের সনেট-শৃঙ্খল নয়। সনেটশৃঙ্খলে প্রসঙ্গ-বিকাশের যে-অগ্রগতি থাকে এখানে তা নেই ; এখানে ভিন্ন-ভিন্ন রচনায় একই বক্তব্যের বিভিন্ন উদাহরণ জোগানো হচ্ছে, রচনাগুলির নামও আলাদা। মনের কথাটা ঐটুকু জায়গার মধ্যে একবার মাত্র ব'লে কবির মন ভরেনি, ঐ প্রসঙ্গ ঘিরেই আরো কথা এসেছে, আরো কবিতার জন্ম হয়েছে। এ যেন একই বিষয়ে অনেকগুলি উপমা-প্রয়োগ। 'দেবতার বিদায়' 'পুণ্যের হিসাব' ও 'বৈরাগ্যে'র একই বিষয় ; 'সামান্য লোক', 'প্রভাত', 'দুর্লভ জন্ম', 'খেয়া' এদেরও বিষয় এক, আবার 'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন,' 'প্রাচীন ভারত' এই সব ক'টি মিলে যেন একটি কবিতাই গঠন করেছে, 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান,' 'মানসলোক', 'কাব্য' সম্বন্ধেও সেই কথা—যদিও এই শেষের সনেটগুচ্ছ পর-পর সাজানোও হয়নি। এটাও উল্লেখযোগ্য যে এ-সব কবিতার মধ্যে কোনো-কোনো দুটি, তিনটি কি চারটি একই দিনে কি পর-পর দু'দিনে রচিত, আলাদা-আলাদা নামে ছাপা হ'লেও এরা কেউই একা সম্পূর্ণ নয়, সমস্ত গুচ্ছটি নিয়েই কবিতাটির রচনা। 'দিদি' ও 'পরিচয়', 'স্নেহগ্রাস' ও 'বঙ্গমাতা', 'সতী' ও 'করুণা'—এরা একই কবিতার দুটি ক'রে স্তবক মাত্র। (বিশেষ ক'রে 'সতী' ও 'করুণা' একই কবিতারূপে গ্রথিত হবার দাবি রাখে, অন্তত এ দুয়ের মধ্যে আর-একটি কবিতাকে জায়গা দেয়া একেবারেই অহেতুক, কারণ দ্বিতীয়টি পড়লে তবেই প্রথমটির তাৎপর্য বোঝা যায়।) পশু ও মানুষের আদিম আত্মীয়তা যে এখনো মরেনি এ-কথা বলা হয়েছে পাঁচটি সনেটে ; 'মানসী' ''অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' এই বিখ্যাত পংক্তিতেই শেষ হয়নি, আরো তিনটি সনেটে তা পরিব্যাপ্ত। ভিন্ন পদ্ধতিতে সাজালে 'চৈতালি'র কবিতাগুলি সংখ্যায় অনেক ক'মে যায়, এদিকে বেশির ভাগই আকারে তিনচারগুণ বাড়ে।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য শুধু এই যে সনেট রবীন্দ্রনাথের যোগ্য বাহন কোনোদিনই হ'তে পারেনি। সনেট দৃঢ় আত্ম-সম্পূর্ণতার, গম্ভীর ধ্বনি-বিন্যাসের প্রত্যাশী। এ-কবিতাগুলি বেশির ভাগই একা সম্পূর্ণ নয়, এদের আঙ্গিকও অতি সরল। হয়তো এদের সনেট বলাই ভুল। আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এ-জাতীয় রচনা প্রসঙ্গে সনেট কথাটি কখনো ব্যবহার করেননি। সনেট বললেই একজাতীয় বিদেশী রচনার আদর্শ মনে জাগে, সে-আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনে যে ছিলো না এ তো স্পষ্ট। বাংলা চতুর্দশপদী একটি স্বতন্ত্র কাব্যরূপ, সনেট থেকে তা অবশ্যই অভিন্ন নয় এ-কথা স্বীকার করাই বোধ হয় ভালো। কখনো-কখনো চৌদ্দ পংক্তির সীমানা ছাড়া সনেটের আর-কোনো লক্ষণেই তাতে থাকে না, তবু কবিতার রস জমে।

এ-কাব্যরূপই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'নৈবেদ্য'। 'চৈতালি'র চতুর্দশপদীগুলি 'নৈবেদ্যে'র মতো সুগঠিত ভরপুর নয়: এরা বড়োই ক্ষীণ, বড়োই মৃদু, একরঙের হালকা রেখাচিত্র যেন। রেখাচিত্র কথাটি এখানে খুবই লাগসই, কারণ বোট থেকে দেখা নদীতীরের গ্রাম্যজীবনের ছোটো-ছোটো একরঙের লঘুরেখার ছবিগুলোই বোধ হয় 'চৈতালি'র সব চেয়ে বিশিষ্ট অংশ। বিশিষ্ট এই অর্থে যে এ-ধরনের ছবি অন্য-কোনো কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আঁকেননি, এবং সমগ্র বাংলাসাহিত্যে শুধু 'বাতায়ন'-লেখিকা উমা দেবীই এই ধরনটির নিপুণ অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। ছবির অংশ বাদ দিলে 'চৈতালি' একদিকে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ঈষদুষ্ণ অস্পষ্ট সৌরভে প্রত্যাবর্তন অন্যদিকে 'কণিকা' ও 'নৈবেদ্যে'র প্রস্তাবনা। 'সামান্য লোক', 'দিদি', 'সঙ্গী' প্রভৃতি রচনাই 'চৈতালি'র একান্ত নিজস্ব।

'রচনাবলী'র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি' সম্বন্ধে আরো বলেছেন:

পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা

শস্যখেত ধু ধু করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ ক'রে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট ক'রে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভ'রে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার-প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যই।

এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চ'লে অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।

রবীন্দ্রনাথ কোনো এক সময়ে তাঁর কোনো একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে কাব্য রমণীজাতির মতো স্বভাবতই অলংকারলোভী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কাব্যে অলংকার প্রয়োগের বৈধ স্থান আছে, আর তার সীমানা যে কোথায় তারও কোনো নির্দিষ্ট আইন নেই; ভিন্ন কবির ভিন্ন মেজাজ অনুসারে তার কম-বেশি ঘ'টে থাকে এইটুকুই আমরা দেখি। ভালো কবির রচনায় যে কত বেশি অলঙ্কার সয়, আবার একেবারে বিনা-অলঙ্কারেই যে কাব্য তার কাজ করতে পারে, এ দুয়েরই উদাহরণ বিশ্ব-সাহিত্যে আছে, এবং এ দুই-ই আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। সুতরাং এমন কোনো নিয়ম করা যায় না যে দৃষ্টির প্রত্যক্ষতার অভাব গোপন করবার জন্যেই অলঙ্কারপ্রয়োগ—এ কথা শুধু অক্ষম কবি ও ব্যর্থ কাব্যপ্রচেষ্টা সম্বন্ধেই খাটে। 'বলাকা'য় চোখের দেখা ও মনের দেখা দুই-ই অতি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, সেই সঙ্গে অলংকারপ্রয়োগও অজস্র ও অপরূপ, তাতে কবিদৃষ্টি ঢাকা পড়েনি, ফুটেছে উজ্জ্বল, সম্পূর্ণ হ'য়ে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য কালিদাসের ও প্রতীচ্য শেক্সপিয়রের মতো অলংকারের স্বভাব-সম্রাট, যে-কোনো সাধারণ কথাকে একটি উপমার ছাঁচে ঢেলে স্মরণীয় ক'রে তোলবার যে-আশ্চর্য ক্ষমতা শেক্সপিয়রের, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীতে বোধ হয় সেই ক্ষমতাই আমাদের সব চেয়ে মুগ্ধ করে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যে বলেন রবীন্দ্রনাথ উপমায় চিন্তা করেন, এ-কথা

নিতান্তই সত্য। এইজন্য শুধু পদ্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও অলংকারের ঐশ্বর্য ; যুক্তি, তর্ক, তত্ত্ব, তথ্য সব উপমা-রূপকের মায়াবি-আলোয় উদ্ভাসিত ; এই ইন্দ্রজালই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ভাষা, তাঁর রচনার ধর্মই এই।

এ-কথাও সত্য যে 'চৈতালি' এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। তার কারণ, এই চতুর্দশপদীগুলির বেশির ভাগেরই বিষয় এমন যাতে অলংকারপ্রয়োগের স্বাভাবিক স্থান নেই। 'প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক'। ভাষাও তাই অলংকৃত। 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ-গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল', এই উপমাটি শেষ পর্যন্ত সযত্নে বিস্তারিত, কোনো খুঁটিনাটি কবি ভোলেননি—

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি।
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

কিন্তু কয়েকটি কবিতার পরেই গীতিকবিতার এই উত্তাপ আর পাওয়া যায় না ; যেগুলিকে বলেছি 'চৈতালি'র বিশিষ্ট রচনা সেগুলো লিরিকজাতীয় নয়। পদ্যে প্রবন্ধ বললে ভুল হয় না, কিম্বা গল্পিকা, কোনো-কোনোটি সংক্ষিপ্ত নীতিকথার পর্যায়ে পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে যত উৎসাহ, সাধারণ মানুষের নিত্যসচল জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও তা-ই ; বোটের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখেছেন সেটুকুই এঁকেছেন, কিন্তু তার বৃহত্তর ইঙ্গিত সম্বন্ধে কবি পূর্ণচেতন। 'চৈতালি'র উপাদান 'গল্পগুচ্ছে'রও আংশিক উপাদান ; মোটের উপর এ যেন নিরুদ্দেশযাত্রী সোনার তরী থেকে নেমে বাংলার গ্রাম্য-নদীতীরে পা ফেলা। রচনাগুলির ভিতর দিয়ে মূল যে দুটি কথা ফুটেছে তার একটি বলা হ'য়ে গেছে আগেই, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', অন্যটি বলা হবে অনতিপরে 'নৈবেদ্যে', 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। 'এই পৃথিবীকে ভালোবাসি', শুদ্ধ এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে গল্পে প্রবন্ধে কতবার

কতভাবে কত সুরে বলেছেন, তবু আজ পর্যন্তও তাঁর তৃপ্তি হয়নি, আজও তিনি বলছেন, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!'

'চৈতালি'তে এ-কথা বলা হয়েছে কিছু গল্পচ্ছলে, কিছু বর্ণনাপ্রসঙ্গে, কিছু বা নিছক তত্ত্বহিসেবে। 'পুণ্যের হিসাব' কি 'বৈরাগ্য' আকারে সংকুচিত হ'য়ে 'কণিকা'য় রূপান্তরিত হবার অপেক্ষা করছে, অন্যপক্ষে নিচের চতুষ্পদীটির পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যাবে 'নৈবেদ্যে' 'গীতাঞ্জলি'তে :

> যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
> বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
> আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
> বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

আবেগের উত্তাপ যেখানে নেই, যেখানে তত্ত্বের উল্লেখ কি চিত্রণই উদ্দেশ্য, ভাষা সেখানে স্বভাবতই নিরলঙ্কার। 'চৈতালি' নিরাভরণ শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের হাতে পয়ার কখনো এত তরল এত শিথিল হয়নি। এই চতুর্দশপদী-গুলোর আঙ্গিক অত্যন্ত সরল : মিলগুলো ঠিক পর-পর আসছে, বেশির ভাগ পংক্তিই প্রবাহমান নয়, অর্থাৎ এক-একটি পংক্তির চোদ্দ মাত্রাতেই এক-একটি বাক্য কি বাক্যাংশ শেষ, যুক্তাক্ষরও অপেক্ষাকৃত কম; ফল এমন একটি একস্বরা সুর, যা গ্রীষ্মের তন্দ্রালু বিশ্রামের সঙ্গে হয়তো মানায়, কিন্তু হয়তো পাঠককেও প্রায় ঘুম পাড়িয়ে ফেলে। একই সুরের একই মাপের চার-পাঁচটি কবিতা পর-পর পড়বার পর সচেতন পাঠকের মন অবশ্যই বৈচিত্র্যলিপ্সু হবে, তাই মাঝে মাঝে 'বেলা দ্বিপ্রহর' কি 'হে পদ্মা আমার'-এর দীর্ঘতর আকৃতি ও পয়ারের জটিলতর বিন্যাস মন সাগ্রহে গ্রহণ করে। কিন্তু পয়ারের বৈচিত্র্য খেলেছে এমন কবিতা এ-গ্রন্থে খুবই কম, মোটের উপর একস্বরা মৃদুগুঞ্জনটিই কানে ও মনে লেগে থাকে।

> নির্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর,
> শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।

চৈত্র, ১৩৪৭

এখনো নামে নি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়ে নি নৌকা সাদা পাল তুলি।
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষি নাহি চলে পথে, গোরু নাই মাঠে। ('প্রভাত')

প্রসঙ্গত আর-একটি কথা এখানে ব'লে রাখি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর পটভূমিকা বাংলাদেশ, বাংলার প্রান্তর ও নদী। এ-কথাটা বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে প্রকৃতির এমন-কোনো দৃশ্য নেই যা তিনি না দেখেছেন, পৃথিবীর প্রায় এমন দেশ নেই যেখানে তিনি না গিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে একদিক দিয়ে তিনি চরম বাঙালি, আনন্দবাজারি বাঙালিয়ানার অর্থে অবিশ্যি নয়। এডওঅর্ড টমসন যে দুই বাংলার কথা একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সেই দুই বাংলাই সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের দৃশ্যপট। বীরভূমের শাল-মহুয়া-আঁকা ঢেউ-খেলানো লাল মাটির প্রান্তর (আসলে সাঁওতাল দেশের ছবি), আর পূর্ববঙ্গের নদী, নদীর চর, ধানের খেত, কাশবন, দিগন্ত-ছোঁয়া সমতল মাঠ। এ দুয়ের একটি দৃশ্যের অনেক খুঁটিনাটি 'চৈতালি'তে জমা করা আছে। আশ্চর্য এই যে এই দুটি ছাড়া আর-কোনো দৃশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নেই, অন্তত উল্লেখযোগ্যভাবে নেই, অথচ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত। পাহাড় কি সমুদ্রের দৃশ্য কখনো তাঁর মন টেনেছে ব'লে মনে হয় না, অথচ যে-কোনো উপলক্ষ্যে একটি নদীর ধারে পৌঁছতে পারলেই তাঁর কী আনন্দ। (সমস্ত 'নৌকাডুবি'তে রমেশ-কমলার গোয়ালন্দ থেকে গাজিপুর পর্যন্ত স্টিমারভ্রমণটুকুই বোধ হয় সব চেয়ে জীবন্ত।) গল্পে-উপন্যাসে কলকাতা যতক্ষণ ঘটনাস্থল, ততক্ষণ সেই হাঁফ-ধরার বর্ণনা করতে তাঁর নিজেরই যেন হাঁফ ধ'রে গেছে, কোনো ফাঁকে শহর থেকে পলাতে পারলেই তিনি যেন বাঁচেন। বিদেশী দৃশ্য ভ্রমণকাহিনীতে ছাড়া পাওয়াই যায় না, একমাত্র ব্যতিক্রম 'শেষের কবিতা'র সেই একটি উজ্জ্বল বিলেতি ছবি—'জুন মাসের জ্যোছনায় সমস্ত আকাশ যেন কথা ক'য়ে

উঠেছে।' অবশ্য 'শেষের কবিতা'য় শিলং পাহাড়ের বর্ণনা চিরস্মরণীয়, অবাঙালি আবহাওয়া 'ক্ষুধিত পাষাণে'ও আছে, খুঁজলে আরো হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু মোটের উপর এ-কথা নিঃসন্দেহ যে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার নিজস্ব নিসর্গই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অধিকার ক'রে আছে, অন্য দৃশ্য সেখানে উঁকি দিতে পারে, স্থান পেতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকায় ব'সেও তিনি জুঁই আর আকন্দ নিয়েই কবিতা লিখেছেন, আর 'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা'র স্বপ্নেই মেতেছেন। কেউ-কেউ হয়তো বলবেন যে বৈদেশিক চিত্ররূপ রবীন্দ্রনাথের রচনায় কিছু-কিছু বন্দী হ'লে বাঙালি পাঠকের আরো বেশি লাভ হ'তো; তবে সেটা কেন হয়নি সে-আলোচনা সাহিত্যের নয়, মনস্তত্ত্বের। এটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনে বিদেশী দৃশ্যাবলীর সমস্তটারই ছায়া পড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কখনো এমন-কোনো হৃদয়াবেগের সঙ্গে তারা জড়িত হয়নি যাতে তাঁর সাহিত্যে সে-সব ছায়া-ছবি শরীরী হ'য়ে উঠতে পারে। এ-কথা—মোটের উপর—পাহাড়, সমুদ্র ও নগর সম্বন্ধেও খাটে। ছেলেবেলা থেকেই পাহাড়ে-পাহাড়ে অনেক সময়ই তাঁর কেটেছে, কিন্তু আকাশকে বেড়া দিয়ে রাখে ব'লে পাহাড় তাঁর ভালো লাগে না এ-কথা তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর নগর-বিমুখতা প্রসিদ্ধ, আর 'হে আদি-জননী' সত্ত্বেও সমুদ্র সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ তিনি কখনোই দেখাননি। পৃথিবীর সমস্ত রূপই তিনি দেখেছেন, ভালোবেসেছেন শুধু বাংলার নদী আর প্রান্তর।

'রচনাবলী'তে 'কাহিনী' 'নাটক ও প্রহসনে'-এর মধ্যে দেয়া হয়েছে; কিন্তু 'গান্ধারীর আবেদন' কি 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ঠিক নাটক নয়, বরং নাটকীয় কবিতা, কিংবা নাটকীয় সংলাপ-কাব্য। সাহিত্যের এমন-কোনো প্রচলিত রূপ নেই যাতে রবীন্দ্রনাথ না লিখেছেন, তার উপর নিজে নতুন রূপ উদ্ভাবনও করেছেন, এ-বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাসেই তিনি অদ্বিতীয়। গীতিনাট্য,

নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য সবই তিনি লিখেছেন, মুখ্যত গীতিকবি হ'য়েও বর্ণনার কবিতা, নীতিমূলক কবিতা, আখ্যানের ও নাটকীয় কবিতাতেও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। 'কাহিনী' নামটি আখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু 'ভাষা ও ছন্দ' আর 'পতিতা' ছাড়া এ-গ্রন্থের সব ক'টি রচনাই নাটকীয়। নাটকীয়, কিন্তু নাটক নয় এই কারণে যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া মূল ঘটনাটি প্রতি ক্ষেত্রেই আগেই ঘ'টে গেছে, সে-ঘটনা আখ্যানের রূপেই আমরা শুনি, এবং ঘটনার যারা প্রধান পাত্রপাত্রী তাদের মনের উপর বিবিধ ও বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সংলাপ-ছলে আমাদের জানানো হয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেই এদের প্রধান আকর্ষণ, চরিত্রসৃষ্টিতেই এদের প্রধান মূল্য। এত স্বল্প পরিসরেও দুর্যোধন কি গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র কি কর্ণের মতো চিরাচরিত চরিত্রগুলিকেও তিনি নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, এ কীর্তি যে কত বড়ো তা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের পৌরাণিক নাটকগুলির দিকে একবার তাকালেই বোঝা যাবে। সাধারণ পৌরাণিক নাটকে চরিত্রসৃষ্টির কোনো চেষ্টাই থাকে না, রাম, অর্জুন, দ্রৌপদী এই নামগুলিই যথেষ্ট ব'লে ধরা হয়। এদিকে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের যত চরিত্র নিয়েছেন নিজের কল্পনায় গালিয়ে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তারা যথেষ্ট পৌরাণিক নয়, তারা অনেকখানি আধুনিক। এ-কথা বললে ভুল হয় না যে পুরাণ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের যত রচনা সব ক'টিতেই তিনি পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন ; মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'পতিতা' 'গান্ধারীর আবেদন' 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে মূলে ও রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তিগুলো মোটেও সদৃশ নয়, এবং এই বৈসাদৃশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি মহাভারত থেকে মানুষগুলোকে আস্ত তুলে আনেননি, নতুন ক'রে অনুভব ও প্রকাশ করেছেন। তুলনায় দেখা যাবে, একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জিৎ, আর-একদিক দিয়ে মহাভারতের। মহাভারতে আধুনিক মনস্তত্ত্বের জটিলতা নেই, কিন্তু এপিকের সরল ও নির্মম বাস্তবিকতা আছে ; মহাভারতের চরিত্রগুলি যেন গণিতের

পূর্ণ সংখ্যা, তারা আত্ম-সম্পূর্ণ, নির্লিপ্ত, একটু নিষ্ঠুর ; তারা বেশি ভাবে না, বেশি কথা বলে না, কাজ করে ; কামোচ্ছ্বাস হ'লে তখনি নিজেকে তৃপ্ত করে, বিরোধ বাধলে যুদ্ধ করে, নিরুপায় হ'লে জুয়োয় ঠকায়, আবার দরকার হ'লে রাজ্যসুখ ছেড়ে অনায়াসে বনবাসে চ'লে যায়। সুখকর কি শোকাবহ সমস্ত কর্মকাণ্ডে তাদের এমন একটি মৌল অনাসক্তি যা আধুনিক যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই অনাসক্তি স্বীকার করেননি, ভেঙেছেন তাদের আত্ম-সম্পূর্ণতা, মানুষের মনের অসংখ্য ছায়াময় ভগ্নাংশ আরোপ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের, চিত্রাঙ্গদার, ঋষ্যশৃঙ্গ-মোহিনী পতিতার উপর—এদের ক'রে তুলেছেন ভাবুক, আত্ম-বিরোধে জর্জর, এমনকি অশ্রুসজল। মহাভারতের চরিত্র ভাবনার ধার ধারে না, যখন যা কর্তব্য নিঃসংশয়ে করে, হয়তো একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আত্ম-অন্বেষণ তারা জানে না, স্মৃতির মায়া মানে না। উপস্থিত নিয়েই তারা ব্যস্ত, কর্মেই তারা চিরলিপ্ত। মহাভারতে যারা সম্পূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও কঠিন, রবীন্দ্রনাথে তারা ব্যাকুল, বিড়ম্বিত, অমীমাংসিত ; রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে একটি ক'রে সমস্যা উপস্থিত করেছেন মহাভারতে তাদের স্পষ্ট বোঝা যায়। মহাভারতে বর্ণিত দেবযানী দেবাসুর-বিগ্রহে একজন উঁচুদরের স্পাই-য়ের কাজ করছে, তবে একান্ত হৃদয়হীন সে নয়, কচের প্রাণও বাঁচিয়েছিলো, কিন্তু তাকে বিদায় দিয়েছিলো নিরশ্রু হাসিমুখেই ; ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যমোচনের কাজ বারাঙ্গনারা বেশ উপভোগই করেছিলো মনে হয় ; কুন্তীর কর্ণের কাছে যাওয়া একটা রাজনৈতিক চাল ছাড়া কিছু নয়, চিত্রাঙ্গদা-উপাখ্যান অর্জুনের বহু প্রণয়-কাহিনীর একটি মাত্র। সুতরাং বলতে হয় পুরাণকাহিনীর সূত্র ধ'রে রবীন্দ্রনাথ নতুন-নতুন উপাখ্যানই সৃষ্টি করেছেন ; মহাভারতে যা আছে তা নেননি, তিনি যা দিয়েছেন সে-বিষয়ে কোনো ধারণাই পুরাণে নেই।

'কাহিনী'র প্রতিটি রচনাই অপূর্ব। নাটকীয় পয়ার এখানে নিখুঁত, যদিও মিল অত্যন্ত নিয়মিত ও অনেকটা গতানুগতিক (অর্থাৎ মিলের এই

ধরনটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পয়ারে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন), তবু প্রবহমানতার জন্য মিলগুলো প্রতি দ্বিতীয় পদান্তে কানে বাজে না; যতিপাত যদিও সর্বদাই জোড়মাত্রায় (রবীন্দ্রনাথের পয়ারে বিজোড়মাত্রায় যতিপাত নেই-ই) তবু বাক্যগুলির অসমান দীর্ঘতায় বৈচিত্র্য প্রচুর। আর সর্বোপরি, এমন জীবন্ত চরিত্রচিত্রণ, এমন আবেগ-আতপ্ত কথোপকথন, একই সঙ্গে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এমন সমান স্থবিচার! দুর্যোধন ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তী, অমাবাই ও বিনায়করাও প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গি এমন নৈপুণ্য ও শক্তির সহিত উপস্থিত করছে যে তখনকার মতো আমাদের মনে সত্য ও মিথ্যার ভেদ যেন মুছে যায়, যদিও শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। যাকে হারিয়ে দেবো তাকে দুর্বল করা ভুল, তাকে যত বেশি সক্ষম করা হবে, তার শেষ পরাভবও হবে ততই সম্পূর্ণ, এ-কথা যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভোলেননি, তার চমৎকার প্রমাণ তো পানুবাবুই।

'সতী' ও 'নরকবাস' 'কাহিনী'র অন্যান্য রচনার মতো সর্বপরিচিত নয়, অথচ এ দুটিই আক্ষরিক অর্থে রোমাঞ্চকর। এদের রচনাসংকল্পও একটু স্বতন্ত্র। দুটিতেই ক্ষুদ্র গল্পাংশ আছে; মূল ঘটনা যদিও আগেই ঘ'টে গেছে এবং তা আখ্যানরূপেই আমাদের শোনানো হয়, তবু নাটিকার পরিশেষে কিছু ঘটে—'সতী'তে অমাবাইয়ের ভীষণ অসহ্য হত্যা, আর 'নরকবাসে' সোমকের স্বেচ্ছায় নরকবরণ। মূল ঘটনাটি চরম সমাপ্তির অপেক্ষায় ছিলো, তা নাটকীয় রূপেই দেখানো হ'লো। এ-দিক থেকে এ দুটি রচনা নাটকের সব চেয়ে কাছাকাছি এসেছে (বিশেষ করে 'সতী' সম্বন্ধে এ-কথা খাটে), এবং সমগ্রভাবে ধরলে এ-জাতীয় অন্য যে-কোনো রচনা অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তিকর। 'গান্ধারীর আবেদন' 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ও 'বিদায়-অভিশাপে'র ('বিদায়-অভিশাপ' 'কাহিনী'র অন্তর্গত না-হলেও এ-প্রসঙ্গে বার-বার উল্লেখ করতেই হচ্ছে) তীব্রতা সমাপ্তিতে শিথিল হ'য়ে এসেছে, কিন্তু 'নরকবাসে'র সমাপ্তি ইঙ্গিতময় আর 'সতী'র চরম মুহূর্তই তো তার সমাপ্তিতে। বস্তুত,

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

'সতী'র সমাপ্তি 'মালিনী'র কথা মনে করিয়ে দেয়, ওতে ট্র্যাজিডির হৃদয়-বিদারক, হৃদয়-শোধক দুঃখ। এ-দুঃখই 'নরকবাসে', শত পুত্রের লোভে একমাত্র পুত্রকে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপের নিদারুণ আখ্যায়িকায়, এ-দুঃখই 'দেবতার গ্রাসে'র শেষাংশে। 'সতী' আর 'নরকবাসে'র নামও 'দেবতার গ্রাস' হ'তে পারতো, এ তিনটি রচনারই বিষয় মূলত এক।

'কাহিনী'তে 'পতিতা'র সম্পূর্ণ পাঠ আছে। 'চয়নিকা'য় যা আছে, সম্পূর্ণ পাঠ তার প্রায় দ্বিগুণে। এই পরিবর্জনে কবিতাটির লাভই হয়েছে এ কথা বলতেই হয় তবু বর্জিত অংশের অন্তত দুটি স্তবকের জন্য অনুশোচনা থেকে যায় :

> দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
> ধরার নরক-সিংহদুয়ারে জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি। (১)
> আমি শুধু নহি সেবার রমণী মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা।
> তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা। (২)

'পতিতা'র প্রচলিত পাঠ আমাদের হৃদয়ে এমনভাবে গ্রথিত যে তার কোনো পরিবর্তন হয়তো আর সম্ভব নয়, কিন্তু তার পাশাপাশি সম্পূর্ণ কবিতাটিরও প্রচার হওয়া দরকার। শুধু যে বর্জিত অংশে কয়েকটি অনিন্দ্য স্তবক আছে ব'লে এ-কথা বলছি তা নয়, সম্পূর্ণ কবিতাটির স্বাদই একটু আলাদা। 'চয়নিকা'র 'পতিতা' প্রায় একটি লিরিক, মূল কবিতাটি প্রকৃতই নাটকীয়। যদিও একালাপ, তবু মূল কবিতায় পতিতা ছাড়াও আর-একটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়, সে কিশোর তাপস নয়, সে বিষয়-বিষ-জর্জর বৃদ্ধ মন্ত্রী। ঋষিকুমারের নিষ্পাপ অজ্ঞতা আর মন্ত্রীর বৈষয়িক কুটিলতার মধ্যবর্তিনী পতিতাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নাটকীয় সংস্থানের উদ্ভব হয়েছে, সংক্ষিপ্ত 'পতিতা'য় যা অনুপস্থিত। সম্ভবত 'পতিতা'র লিরিক অংশগুলিই সব চেয়ে মূল্যবান ; মনে আছে বালকবয়সে প্রথম যখন 'চয়নিকা' হাতে এলো যে-দুটি কবিতা আমাকে সব চেয়ে অভিভূত করেছিলো তা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও 'পতিতা'। 'পতিতা'র অর্থ তখন বুঝিনি, কিন্তু

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

আনন্দময়ী মূরতি তোমার, কোন দেব তুমি আনিলে দিবা,
অমৃতসরস তোমার পরশ তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

এ-কথাগুলি আমার মনে যে-আন্দোলন তুলেছিলো তার তুলনা হয় না। পরে যখন কবিতাটির অর্থ বুঝতে শিখলুম তখনও সে-আন্দোলনের নিবিড়তা বা প্রকৃতি কোনোটারই পরিবর্তন হ'লো না, আজ পর্যন্তও হয়নি। শুদ্ধ ঐ কথাগুলিতে যে-অমৃতের স্পর্শ ছেলেবেলায় পেয়েছিলুম, আজও তা-ই পাচ্ছি, বুঝতে শিখে সেদিক থেকে কিছুই জিৎ হয়নি। কবিতার যা সত্তা-সার তার উপভোগের পক্ষে বোঝা ব্যাপারটা যে একান্তই দরকারি নয় এর একটা প্রমাণ হিসেবে এটা দাখিল করলুম।

'কাহিনী'র রচনাগুলির মধ্যে এক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'কেই বলা যায় ক্ষুদ্র পরিসরে একটি নাটক (অন্তত এর অভিনয়যোগ্যতা তো স্পষ্ট), তাছাড়া এ-হিসেবেও বিশিষ্ট যে এটি লঘুরসের রচনা। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস জমাতে ওস্তাদ, তবে তাঁর হাস্যরসের আধার পদ্য নয়, গদ্য। এর ব্যতিক্রম অল্প যা আছে, তার মধ্যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বস্তুত এতখানি দীর্ঘ পদ্যাকারে নীতিশিক্ষার সঙ্গে হাস্যরসের এমন সার্থক সংমিশ্রণ বাংলা সাহিত্যেই আর নেই; তুলনার দাবি করতে পারেন প্রথমে দ্বিজু রায় ও পরে সুকুমার রায়, কিন্তু 'হাসির গান' কি 'আবোল তাবোলে'র রচনাগুলির আকারের ক্ষুদ্রতাই এ-তুলনার অন্তরায়। হাসি ও শ্লেষ, ছন্দের কারসাজি, চমকপ্রদ মিলের অনর্গলতা, আর সমস্ত জড়িয়ে ফুর্তির হালকা মেজাজ—এতগুলো জিনিস সহস্রাধিক পংক্তি ধ'রে সমানভাবে বজায় রাখা, এ যে কত বড়ো কীর্তি তা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা কখনো পদ্য লেখবার চেষ্টা করেছেন, অপ্রচলিত মিলের সন্ধানে সিগারেট ও বাতি পুড়িয়েছেন। বিশেষত যখন এর শেষে '২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০৪' এই লেখাটুকুতে খবর পাই যে সমস্ত রচনাটি একদিনে লেখা তখন আমাদের মতো কবিখ্যাতিপ্রার্থী ক্ষুদ্র মানবের বিস্ময় সত্যই অসীম হ'য়ে ওঠে। 'কাহিনী'র কোনো রচনা লিখতেই

একদিনের বেশি লেগেছে ব'লে মনে হয় না; এ-ক্ষমতা মহাকবির নয়, মহামানবের।

আমার মনে হয় বাঙালি সাহিত্যিক মহল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'কে এখনো যথেষ্টভাবে পরীক্ষা করেনি। লক্ষ্য করবার অনেক জিনিস আছে এতে। পদ্যে চলতি ভাষার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রথম—প্রথম বয়সের গীতিনাট্য দুটি বাদ দিয়ে। বাংলা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেও যে নিখুঁত পদ্যের ছাঁচে ঢালা যায় তা রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম দেখালেন। 'বাল্মিকীপ্রতিভা' 'মায়ার খেলা'র উদ্যম এখনো প্রশংসনীয়, কিন্তু তাতে সুরের সাহায্য ছিলো, পদ্য হিসেবে ছন্দ ভাঙা-ভাঙা, সংলাপের নাটকীয়তা অপেক্ষা সুরের হেরফেরই প্রধান। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র সংলাপের বাস্তবিকতা নিখুঁত, এ একেবারেই আমাদের প্রতিদিনের ঘরোয়া কথাবার্তা। তিনমাত্রার এই ছন্দ একঘেয়ে হ'তে পারতো, কিন্তু প্রবহমানতার জন্য হয়নি, লাইনগুলো কখনো এগারো কখনো বারো মাত্রার, কিন্তু কানে একরকমই শোনায়, পড়তে-পড়তে ছন্দের দোলা আর অদ্ভুত মিলের চমক প্রতি মুহূর্তেই আমাদের বিস্ময় কাড়ে, আগাগোড়া কারিগরির ওস্তাদিতে হতবাক হতে হয়। আশ্চর্য এই যে একটিমাত্র লাইনে ছন্দ কেটেছে, সত্যি কেটেছে—

মরেও নি বটে জন্মেও নি কভু।

এতগুলি সংস্করণ পার হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভক্তদের কান এড়িয়ে এ-লাইনটি যে 'রচনাবলী'তে পৌঁছলো এতে সামান্য একটু দুঃখ বোধ না ক'রে পারা যায় না, জানি না এখনো শোধনের সময় আছে কিনা। অবশ্য এ অতি ছোটো কথা; কিন্তু 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মতো অপূর্ব রচনায় আঙ্গিকের আণুবীক্ষণিক খুঁতও কাব্যপ্রেমিককে ব্যথা দেয়।

'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথের দুর্বল উপন্যাস। কবি নিজে তা জানেন, তাই 'রচনাবলী'র জন্য যে-'সূচনা' লিখেছেন তাকে 'নৌকাডুবি'র অ্যাপলজি বললে

দোষ হয় না। এর অসঙ্গতিগুলো এতই স্পষ্ট যে বিস্তৃত আলোচনায় লাভ নেই। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন বলছেন যে 'ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না', শুধু মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশের খাতিরে তখনকার দিনের সাধারণ পাঠকের পছন্দের মাপসই ঘটনাজটিল দীর্ঘ উপন্যাস ফাঁদাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, তখন সমালোচকের বোধ হয় চুপ ক'রে থাকাই ভালো।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ক্রমবিকাশ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এই 'রচনাবলী'র গ্রন্থনব্যবস্থা ঠিক সময়ানুক্রমিক নয় ব'লে এ থেকে তার অনুসরণ সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের দুটো ধারা প্রথম থেকেই পাশাপাশি চলেছে, একটা 'সাধু'ভাষা, আর একটি চলতিভাষা, যদিও দ্বিতীয় ধারাটি তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বলতে গেলে চিঠিপত্রের নেপথ্যেই ছিলো। আঠারো বছরের লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' প্রথম প্রকাশের পর বহুকাল পুনর্মুদ্রিত হয়নি, 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয় কবির বয়স যখন ৫১, যদিও চিঠিগুলো তাঁর ২৪ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে লেখা। তার আগে 'গোড়ায় গলদ' 'চিরকুমার সভা' ও অনতিপূর্বে দু' তিনটি রূপক-নাট্য অবশ্যি হ'য়ে গেছে। গদ্য নাটক চলতি ভাষায় না-লিখে উপায় নেই, কিন্তু নাটক বাদ দিলে 'ছিন্নপত্রই' 'য়ুরোপ-প্রবাসী'র পর তাঁর প্রথম চলতি গদ্যে আত্মপ্রকাশ। ভাবতে অবাক লাগে যে 'ছিন্নপত্র' 'চোখের বালি'র ১৬ থেকে ৬ বছর আগে ও 'নৌকাডুবি'র ২১ থেকে ১১ বছর আগে লেখা। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যে 'ছিন্নপত্রে'র অপরূপ ভাষা যাঁর হাতে ছিলো তিনি গল্পের কথোপকথনে পর্যন্ত সাধু ক্রিয়াপদগুলোর হাম্বড়া অক্ষমতা কেমন ক'রে সহ্য করছিলেন! 'চোখের বালি' কি 'নৌকাডুবি' চলতি ভাষায় লেখা হ'লে কী হ'তো সে-জল্পনা বৃথা, তবে এ-কথা মানতেই হয় যে বাংলা 'সাধু' গদ্যের উৎকর্ষের শেষ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর উত্তরচল্লিশ ও প্রাক্-পঞ্চাশ গ্রন্থগুলিতে, অর্থাৎ 'পঞ্চভূত', 'গল্পগুচ্ছ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্যে'। এর পর তিনি 'গোরা' লিখে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু তাঁর

'সাধু' গদ্যের এর পর আর পরিণতি হয়নি। 'গোরা' মহৎ উপন্যাস, কিন্তু ভাষার দিক থেকে সেখানে কোনো নতুন কৃতিত্ব নেই। আর আমি বিশ্বাস করি না যে 'সাধু' গদ্য এর চেয়ে ভালো কখনো হ'তে পারে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিই :

এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকার দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ওই বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতা অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ('কেকাধ্বনি')

গম্ভীর, কবিত্বময়, কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় 'অসাধু' শব্দমিশে একে গতিশীল করেছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ 'সাধু' গদ্যের এ-ই ছাঁচ। এ-ভাষায় হাস্য পরিহাস সরস বিদ্রূপ সবই সম্ভব মনে হয়, আর রবীন্দ্রনাথ তা বহুবারই সম্ভব করেছেন। এ-যুগের প্রবন্ধে, গল্পে উপন্যাসে হাস্যরসের অভাব নেই। এই ভাষা আরো একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা হ'তে পারে (যেমন 'প্রাচীন সাহিত্যে' বিষয়ের গুণে হয়েছে)। তার একটু নমুনা :

নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজন-ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক। ('পাগল')

সংস্কৃত ঠাসা—কিন্তু কার সাধ্য খুঁত ধরে। যে-রুদ্র নৃত্যের বর্ণনা করা হচ্ছে, তারই ছন্দ যেন লেগেছে ভাষায়। 'হইতে থাকিবে'র মতো বেয়াড়া ব্যাপারও ছন্দের শাসনে শায়েস্তা। গদ্যের 'সাধু' পথে এর পর আর পরিণতির অবকাশ নেই, এর পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সংস্কার কাটিয়ে সরাসরি চলতি ভাষা না-লিখলে রবীন্দ্রনাথের চলতোই না।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলি সেই জাতের, আজকাল যাকে বলা হয় 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ। 'এই গ্রন্থের পরিচয় আছে "বাজে কথা" প্রবন্ধে। অর্থাৎ

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৭

ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে', আজকালকার দিনে হ'লে এ-সাফাইটুকুর দরকার হতো না। কেননা আজকাল আমরা এ-ধরনের রচনা ভালোবাসতে শিখেছি, যদিও বাংলায় এখনো এ-জিনিস খুব বেশি পরিমাণে হয়নি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' পাঠে জানা যাবে বাংলায় এই রচনারূপেরও রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তক। এগুলি খেয়াল খুসির রচনা, নির্দিষ্ট কোনো 'বিষয়' নেই, এদের উদ্দেশ্য মুখ্যত তথ্যজ্ঞাপন বা তত্ত্বালোচনা নয়, এগুলি কিছু শেখাতে চায় না, শুধু আনন্দ দিতে চায়। অবশ্য আনন্দ অনুভব করাটাই আমাদের জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা—যদিও জগতের ইস্কুলমাষ্টার, রাজপুরুষ ও বাণিজ্যরাজারা তা মানেন না—এবং সেখানেই সমস্ত শিল্পকলার সার্থকতা। এ-ধরণের প্রবন্ধেরও সার্থকতা পাণ্ডিত্যে, প্রচারে কি বিতর্কে নয়, নিখুঁত শিল্পরূপে। মতামতের চেয়ে ব্যক্তিত্ব এতে প্রধান, এর শেষ উদ্দেশ্য লেখকের ব্যক্তিত্বেরই ব্যঞ্জনা ('It is myself I portray.') অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মন্তেইন কি·ল্যাম-এর অনুগামী নন, আত্ম-চরিত্রচিত্রণে বাস্তবিকতা তাঁর অনভিপ্রেত, নিজেকে তিনি ভাবলোকের অনতিস্পষ্ট জ্যোতির্মগুলেই রেখেছেন, শুধু প্রবন্ধে নয় 'জীবনস্মৃতি'তেও। দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া-পরা চলাফেরার যে-সব অভিজ্ঞতায় তিনি অন্য সমস্ত মানুষের সঙ্গী তার বিবরণ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু সামান্যই আছে; যেখানে তিনি বিশেষ ও নিঃসঙ্গ, যেখানে তিনি কবি ও শিল্পী, তারই বিচিত্র উপাখ্যান তিনি 'পঞ্চভূত' থেকে 'ছেলেবেলা' পর্যন্ত নানা ভঙ্গিতে রচনা করেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'ও তাঁর কবি-সত্তার একটি বিশিষ্ট দিক পরিস্ফুট, এতে তত্ত্ব আছে, মতপ্রচার আছে, মননশীলতা এতে গভীর, কিন্তু সমস্ত জড়িয়ে ও সমস্ত ছাড়িয়ে রয়েছে একটি আনন্দিত সৌরভ যা একান্তই রাবীন্দ্রিক। সেই আনন্দই রচনাগুলিকে মূল্যবান করেছে। এ-গ্রন্থকে বলা যেতে পারে সুগন্ধি অবসরের তত্ত্বকথা। 'কেকাধ্বনি' যেমন বাঙালি পাঠকের নন্দনতত্ত্বে প্রথম পাঠ, 'বসন্তযাপন' তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে

যোগস্থাপনের বিবৃতি। অবসরের, অকর্মকতার মহিমাপ্রচার পদে-পদে। অশ্রান্তকর্মশীল লোভতৃপ্তিহীন ইওরোপের প্রতি শ্লেষবাক্য কী সুন্দরই না পড়েছে :

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে।...জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও।... পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মায় নাই, অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারি হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম;—দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সব জড়িয়ে যে-কথাটা বলা হয়েছে তা এই যে যা প্রয়োজনীয় তা তুচ্ছ, মানুষের মূল্য তার বাহুল্যে। আর্ট বাহুল্য, তাই অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের, অতএব সাহিত্য-শিল্প সমালোচনার, এ-ই মূল কথা। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এমন-কোনো প্রবন্ধ নেই যেখানে স্পষ্ট ভাষায় কি প্রচ্ছন্নভাবে এ-কথাটা না আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম এই ভিত্তির উপরেই গ'ড়ে উঠেছে।

'প্রাচীন সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধসংগ্রহ যার বিষয় শুধুই সাহিত্য-সমালোচনা। একটা সময়ে ইংরেজিনবিশ বাঙালি সংস্কৃত সাহিত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলো, সেদিক থেকে এ-প্রবন্ধগুলি কালিদাস বাণভট্টের পুনরুজ্জীবন। এদের ভিতর দিয়ে শিক্ষিত বাঙালি যেন তার প্রাচীন উত্তরাধিকারে নতুন ক'রে ছাড়পত্র পেলো। তাছাড়া সাহিত্যসমালোচনার নতুন একটা আদর্শও রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করালেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র বিস্মৃতপ্রায়, আবার ইওরোপীয় সমালোচনারীতিও তখন পর্যন্ত এ-দেশে অব্যবহৃত; এ অবস্থায় সমালোচনা অসার তামাসার অধঃপতিত হচ্ছিলো যার চেহারা দেখতে পাই কাব্যবিশারদের 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কিত ছড়ায়, সমাজপতির আসরে মিঠে কড়া ছিলিমে। আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় কবিদের বিচার ক'রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের

উৎসাহ ফিরিয়ে আনলেন, দ্বিতীয়ত এটা শেখালেন যে দু'চারটা রংদার ইয়ারকি করতে পারাটাই সমালোচনা নয়; গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দই প্রকৃত সমালোচনার উৎস—অর্থাৎ যে-কবিকে ভালোবাসি সে ভালোবাসা অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই সমালোচনার মহত্তম কাজ। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো সময়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

বুদ্ধদেব বসু

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

তির্যক—সত্যশক্তি ঘোষাল ও ফল্গু কর। মূল্য আট আনা।

পৃথিবীর চেহারা দ্রুত বদলাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আজ বিভক্ত, প্রশ্নচিহ্নিত পৃথিবী কেবল দার্শনিক জিজ্ঞাসাতেই সম্পূর্ণ হয়, আমাদের জীবনের একেবারে গোড়ায় সে তার নিষ্ঠুর লোমশ হাত বাড়িয়েছে। আমরা এতদিন বুঝেছিলাম; বৈরাগ্যই জীবনে একমাত্র ব্রত। তাই গোলাঘর খালি ক'রে কৌপীন সম্বল করেছিলাম। ভিক্ষায় যদিবা কিছু জুটতো আবগারিতে গুরুদাক্ষণা গুণতাম। ইতিমধ্যে কী এক দুরূহ কারণে যুদ্ধ বাধলো। এতদিন অহিংসাকে সার জেনেছিলাম। এবার দেখলাম, রাস্তার মোড়ে মোড়ে উদ্যত সঙ্গীনের বিজ্ঞাপন। এদিকে দেশলাইয়ের দর চড়লো।

আজ যাঁরা সমাজের এই সঙ্কট অবস্থা দেখে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং একে স্বরূপে দেখে এ থেকে উদ্ধারের পথ বলছেন, তাঁদের স্বভাবতই আমরা শ্রদ্ধা জানাবো। শ্রীযুত সত্যশান্তি ঘোষাল তাঁদের অন্যতম।

> নতুন ইঁটগুলো কম্পিত কণ্ঠে বলে
> এসো ভাই সব, আমরা আজ নিজেই কেঁপে উঠি।
> সেই অফুরন্ত জীবন, সুরভি বাতাস, আর সোনালী আলো
> সব আমাদের হবে।'
>
> (ভিত্তি)

সত্যশান্তিবাবু আধুনিক বাংলা কবিদের দলে আগন্তুক হ'লেও 'তির্যকে' তাঁর কবিতাগুলি পাঠকসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সত্যশান্তিবাবুর কাব্যের উপকরণ শুধু নতুন নয়, তার বলিষ্ঠ প্রকাশ যেমন সংহত, তেমনি সরল। তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীপীড়ন প্রত্যক্ষ

করেছেন। তাঁর বিশ্বাস কাব্যে কোথাও দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি কাব্যাংশের কোথাও সংবাদপত্রের সাহায্য না নিয়েও যেভাবে সমাজবোধের পরিবেশন করেছেন, তাতে ক'রে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হয়। তাঁর কবিদৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের বৈরাগ্যে শেষ হয়নি, সেখানে বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মেচ্ছার সহযোগ ঘটেছে।

'রথযাত্রা'য় আমরা ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করি। স্বপ্নচালিত জনগণ এই রথবাহক, এই রথচক্রেই আবার তাদের জীবনান্ত ঘটেছে। 'চোখ বাঁধা বলদের মত এরা নির্বিকার নিষ্ঠাভরে পথ অতিক্রম করে। 'দেবতার বেত্রাঘাত এরা অদৃষ্টের' দান ব'লে মানে। 'এরা যদি করে দৃষ্টিপাত, একটি শাণিত দৃষ্টি!'

'এই সব নিশিপাওয়া কবন্ধেরা রথ টেনে চলে।
কখন একটি লোক চুপি চুপি এগোয় সবলে;
অদেখা সিঁড়িতে তার একপা একপা রেখে শেষে
একদিন বসে পড়ে দেবতার আসনেতে এসে।'

(রথযাত্রা)

কিন্তু 'রথযাত্রা'য় একটা বিষন্ন সুর থাকলেও 'দ্বিতীয় সূর্যে' আমরা আশার লাল আলো দেখি।

'মরণোন্মুখ প্রাক্‌পুরাণিক সূর্য
নামে মৃত্যুর তুষার প্লাবন বিশ্বে!
তবু নির্ভয়ে বাজাও তোমার তূর্য
দ্বিতীয় সূর্য হানিবে চির অদৃশ্যে।'

(দ্বিতীয় সূর্য)

শ্রীযুক্ত ফল্গু কর যদিও মাঝে মাঝে সহজ, প্রায় স্বপ্নচালিতের মত, ভবিষ্যতে আশ্রয় খুঁজেছেন, তাঁর আসল টান আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর কাছে

তাই মনে হয় চুম্বনের
চাইতে চতুর আর কিছু নেই, আসঙ্গলিপ্সার
চেয়ে আর কোনো মধু পৃথিবীতে থাকা অসম্ভব।'

(দেহবাদী)

ফল্গু করের সমস্ত লেখার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ চিন্তাসূত্র নেই; তিনি বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে বিচিত্র মুহূর্তে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য বর্তমান (যদিও

'রিক্সাওয়ালা' কবিতাটি এদিক দিয়ে হাস্যকর হয়েছে)। তাঁর শব্দচয়ন শ্রুতিমধুর, যদিও ভাবের অসমপদক্ষেপে মাঝে মাঝে ভারসাম্য রক্ষা হয়নি। তাঁর কাব্য তাঁর বিশ্বাসের অভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, তিনি এখনও সংশয়িত। আমার ব্যক্তিগত মত, সংশয়ের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে যে-কোনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রতে পারলে তাঁর কবিতা আরও খুলবে। বিশেষ ক'রে, 'তির্যকে'র কবিতায় সে বিষয়ে কয়েকটি নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিশ্রুতি র'য়ে গেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

উপন্যাসই এ-যুগের মহাকাব্য, তার জন্ম ও পরিণতি আধুনিক ইওরোপে। ইংলণ্ডে ডিকেন্স, ফ্রান্সে ফ্লোবেঅর ও রুশদেশে টলস্টয় উনিশ শতকে এই নবাবিষ্কৃত মহাদেশে রাজত্ব করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে এর সীমান্ত আরো বিস্তৃত করেন একজন মার্কিন লেখক: হেন্‌রি জেমস। বিশ শতকের প্রথম ভাগে উপন্যাসের মানচিত্র যে-দু'জন লেখকের হাতে নতুন ক'রে আঁকা হ'তে লাগলো তাঁদের একজন ফরাসি, আর-একজন আইরিশ। মার্সেল প্রুস্ত্ রুগ্ন দেহ নিয়েও তাঁর দীর্ঘ স্মৃতি-অন্বেষণ শেষ না-করা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, জয়স-এর মৃত্যু এলো হাতের কাজ না ফুরোতেই। তবে তিনি আরো বাঁচলে আরো কী পাওয়া যেতো সে-হিসেব অতি কৃপণ তো বটেই, তাছাড়া অনর্থক। **The Dubliners**-এর প্রতিভাদীপ্ত ছোটো গল্পগুলিতে ও জয়স্-এর প্রথম উপন্যাস **A Portrait of the Artist as a Young Man**-এ ইংরেজি কথাসাহিত্যের হাওয়া-বদলের যে ইঙ্গিত পাওয়া গেলো, তার চরম অভিব্যক্তি **Ulysses**-এ। কোনো সন্দেহ নেই, **Ulysses** এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সমসাময়িক সাহিত্যে এর প্রভাব যত বিস্তৃত ততই গভীর। কিছুটা দুঃসাধ্য হ'লেও এই গ্রন্থ মন দিয়ে পড়া ও হৃদয়ঙ্গম করা বাঙালি সাহিত্যিকমাত্রেরই কর্তব্য। জয়স সম্বন্ধে আলোচনা বাংলা সাহিত্যের পরিণতির পক্ষে অবান্তর নয়। 'কবিতা'র আগামী কোনো সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী জয়সের সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

'কবিতা'র আগামী সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু: সমর সেন। প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু।
মুদ্রাকর: শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর সেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা
কার্যালয়: কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

রবীন্দ্র-অভিনন্দন

'কবিতা'র আগামী আষাঢ় সংখ্যা ১৩৪৮-এর ২৫শে বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে **রবীন্দ্র-সংখ্যা** হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করবে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলার বিশিষ্ট লেখকরা এতে আলোচনা করবেন। এই সংখ্যার লেখকদের নাম :

অজিত দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, অমিয় চক্রবর্ত্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশুকুমার দত্ত, হুমায়ুন কবির।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য হবে এক টাকা, তবে 'কবিতা'র চলতি বছরের গ্রাহকরা অবশ্য বিনামূল্যেই পাবেন। আগামী **১লা বৈশাখের মধ্যে** মনিঅর্ডারে এক টাকা পাঠালে **বিনা ডাকব্যয়ে** ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় ব'সে একখানা পাবেন।

কবিতা-ভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

সাহিত্য-বিচার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

নন্দগোপাল, তোমার বইখানি পড়ে খুশি হলুম। এর মধ্যে তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টির এবং ভাষার সুতীক্ষ্ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হোলো অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহু সংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্ত্তমান পরিমাপবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভাণ করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড় আদালত নেই। তার ফাঁসির দণ্ড হোলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়ত ফাঁস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং সেক্সপিয়ারও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি।

আষাঢ়, ১৩৪৮

পদ্যের মূল্য-নির্ধারণকালে ঝগড়া ক'রে তর্ক ক'রে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভাণ না ক'রে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্প-নিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্য-ভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্য-বিচার-মূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংশ্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হোতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হোতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠক সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্‌লিঙের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসঙ্ঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হোতে থাকে, অবশেষে কখন এক সময় ঋতু পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য বিচারে এ রকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহঙ্কার সর্বজনীন আদর্শের ভাণ ক'রে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হোতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এই রকম বিচারকের

অহঙ্কার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয় তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভাণ না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলেম তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে ঐ সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার চিরকুমারসভা ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তি তর্কের অতীত।

তুমি মনে কোরো না তোমার লেখায় আমার প্রতি কোনো অবিচার করেছ বলে আমি তোমার উপর কটাক্ষপাত করেছি, ঠিক তার উল্টো। তুমি আমাকে যা নগদ বিদায় দিয়েছ শেষ পর্যন্ত তার বোঝা বইতে পারলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক যশ সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা সুগভীর বৈরাগ্য এসেছে। এতদিনে কালের খাজাঞ্চিখানা থেকে আমি যা কিছু লাভ করেছি সেটা খাঁটি কিংবা খাঁটি নয় যখন তার প্রমাণ হবে, তখন আমি উপস্থিত থাকব না।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

আমার এই লেখাটা তোমার গ্রন্থের সমালোচনা নয় তার কারণ সমালোচনায় আমার রুচি বা কৃতিত্ব কোনোকালেই ছিল না এবং এখনো নেই। ইতিপূর্বে আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম—বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়। সংক্ষেপে আমি বলতে পারি তোমার রচনার বরাবর আমি প্রশংসা করে এসেছি তার ভাষা ও মননশক্তির উজ্জ্বলতা গুণে, এ গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর ভিন্ন তত্ত্ব বিচার তাঁরাই করবেন যাঁদের শক্তি আছে এবং অভ্যাস আছে—আমি অক্ষম। আমার নিজের সম্বন্ধে বিচারকের জরিমানা ও বকশিশ নিঃশব্দে মেনে নিই, অন্যের সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রক্ষেপ করতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করি কারণ এই অভিমত সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত অভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালী পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি, মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য আলোচনা সভায় আমার উক্তি অলঙ্কারের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে সেজন্য আমি

লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান ক'রে পাননি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্ম-সচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহঙ্কারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্ত-সচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-দুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না; সেই আমাদের সৌভাগ্য তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?

তোমার লেখা উপলক্ষ্য মাত্র করে আমি সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করেছি, রোগজীর্ণ ক্লান্ত মনের অসংলগ্ন উক্তি। একথাও বলে রাখা দরকার এর অধিকাংশই আমি শ্রীমান সুধাকান্তকে মুখে মুখে বলে গিয়েছি। সুতরাং এ রকম ভাষণের দুর্বলতা ক্ষমার যোগ্য।

রবিকাকার গান

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগ্নহৃদয় লেখা চুকিয়ে রবিকাকা সেই সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। জ্যোতিকাকামশায় থাকেন তখন ফরাসডাঙার বাগানে। আমরা থাকি চাঁপদানির বাগানে। এই দুই বাগান আমাদের দুই পরিবারের। আমরা তখন ছোট ছোট ছেলে। এক-একদিন বেড়াতে যেতুম ফরাসডাঙার বাগানে। যেমন ছেলেরা যায় বুড়োদের সঙ্গে। সেই একদিনের কথা বলছি।

তখন মাসটা কী মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব বৈশাখ। আমের সময়। ব'সে আছি বাগানে। খুব আম-টাম খাওয়া হ'লো। রীতিমতো পেটের সেবা ক'রে তারপর গান। জ্যোতিকাকা বললেন, 'রবি, গান গাও।' গান হ'লেই রবির গান হবে। আমি তখন সাত-আট বছরের ছেলে। রবিকাকার দশ বছরের ছোট। ওঁর তখন সতেরো বছর। সেই গানটা হ'লো—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

গঙ্গার ধারে—জ্যোতিকাকা হার্মনিয়ম বাজাচ্ছেন—প্রথম সেই গান শুনলুম—সে-সুর এখনো কানে লেগে রয়েছে।

কী চমৎকার লাগলো। গান হ'তে হ'তে সন্ধে হ'লো, মেঘ উঠলো। গঙ্গার উপর কোন্নগরি মেঘ। 'আর না, চল্ ছেলেদের নিয়ে যাওয়া যাক্।'

ঘোড়ার গাড়িতে আসতে-আসতে কী ঝড়, কী বৃষ্টি! 'চেরেট' গাড়ি—নতুনরকমের। আমরা ক'টি ছেলে—আর বাবামশায়, বড়ো পিসেমশায়। গাড়িটা ছিলো কতকটা টঙ্গা গোছের। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মড়মড় ক'রে একটা ডাল ভেঙে পড়লো গাড়ির সামনে। ওটা গাড়ির উপর পড়লে তোমাদের রবীন্দ্রনাথের গান শোনা সেই প্রথম এবং শেষ হতো। বাল্যকালে যখন সুর বোধ হয়নি, কিছুই হয়নি, তখন সেই গান শুনে ভালো লেগেছিলো। 'ভরা ভাদর' গাইবার সঙ্গে-সঙ্গে সুরের বর্ষার সঙ্গে সত্যিকার বর্ষা নামলো।

সেদিন আর ফিরবে না। তারপর গানের পর গান ওঁর কত শুনেছি, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর কত গানই শুনেছি, কিন্তু সে রকম আর শুনলুম না। যৌবনের পাখি চ'লে গেছে, আর-এক পাখি এসেছে। তিনি লিখেছেন—আমি চ'লে যাবো, নতুন পাখি আসবে। কিন্তু নতুন পাখি আর আসবে না। একলা মানুষের কণ্ঠে হাজার পাখির গান। আমার

আষাঢ়, ১৩৪৮

এখনো মনে হয় তাঁর সব রচনার মধ্যে—লেখাই বলো, ছবিই বলো—সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে তাঁর গানের দান। এখনো মনে পড়ে বাল্মীকি-প্রতিভায় বীণাপাণির স্তুতি—

এই যে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।—

বাস্তবিক সে-কথা ফলেছে। উনি বীণা হাতে নিয়ে সরস্বতীকে প্রণাম করছেন সে ছবি এখনো মনে পড়ছে।

কথার সঙ্গে সুর রবিকাকার মতো কেউ মেলাতে পারেনি। ব্রহ্মসঙ্গীতের সবগুলো সুর ওঁর নিজস্ব সুর নয়। 'মায়ার খেলা'র মতো অপেরা আর হয়নি। আমি সেদিন রথীকে বলেছিলুম, 'মায়ার খেলা করো না আর একবার।' রথী বললে, 'লোকে বলে ওতে কেবলই "লভ"!' আমি বললুম, 'ও-রকম লোক তোমাদের দলে যদি কেউ থাকে তাকে বিদেয় ক'রে দিয়ো।' 'মায়ার খেলা'য় তিনি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন। বোধ হয় বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ের সময় ওটি রচিত হয়, কিন্তু ওতে তাঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওখানে একেবারে ওঁর নিজস্ব সুর। অপেরাজগতে ওটি একটি অমূল্য জিনিস। কিন্তু হায়, যে ও-সব গান গাইবে সে ম'রে গেছে। সেই পাখির মতো আমাদের ছোটো বোনটি চ'লে গেছে। এখনো 'মায়ার খেলা'র গান যদি কাউকে গাইতে শুনি, তার গলা ছাপিয়ে কতদূর থেকে আমাদের সেই বোনটির গান যেন শুনি।

সে-সুরে যে-পাখি গাইতো সে-পাখি ম'রে গেছে। কে গাইবে! অভি-র গলায় ঐ সুর যা বসেছিলো! তার গলার timbre অদ্ভুত ছিলো। প্রতিভাদিদিও গেয়েছেন, কিন্তু ওরকম নয়। গান শুনে তবে 'মায়ার খেলা' বুঝতে হয়। আমার যদি মত চাও তবে এই করো এই জন্মদিনের উৎসবে ওর ভালো-ভালো গান দিয়ে একখানা বই করো, আমরা মাথায় ক'রে রাখবো। সংগীত সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ছাপাবার চেয়ে এ ঢের ভালো, আর যথার্থ ওঁকে সম্মান দেয়া।

ওঁর গান শুনলে এখনো আমার মনে যে কী ভাবের উদয় হয়, তা ওঁরই একটি গানের একটি ছত্রে বলছি—

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ভাবনা আমার পথ ভোলে।

নমস্কার।

রবীন্দ্র-পরিচয়

প্রমথ চৌধুরী

আমি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করি। কলকাতায় নয়, কৃষ্ণনগরে; কোনো সভাসমিতিতে নয়—আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে।

রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন, তখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন;—দাদা অবশ্য বিলেত পর্যন্ত পাড়ি দেন। এই দুচারদিনেই দাদা ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

দাদা উক্ত সনের ৩রা মার্চ তারিখে ফিরে আসেন। এ তারিখ আমার মনে আছে—কেননা ঐ তারিখেই আমি একটি ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক রোগে আক্রান্ত হই। এবং প্রায় মাসখানেক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে বেঁচে উঠি।

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বোধ হয় দাদার সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সম্বন্ধ করবার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। আমার বয়েস তখন আঠারো, আর রবীন্দ্রনাথের বয়েস পঁচিশ। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের নাম অবশ্য শুনেছিলুম, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

আমার বয়েস যখন আট, তখন নাবালক-রবীন্দ্রনাথ সেকালের কোনও একটি মাসিক পত্রিকায় দুটি একটি কবিতা প্রকাশ করতেন। দাদা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা সেই সব কবিতার বিষয় আলোচনা করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনকালেই উপেক্ষিত হয়নি,—আর তাঁর কবিতা যে মামুলি নয়, তাও অনেকের চোখে পড়েছিল।

তারপর তেরো বৎসর বয়েস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যই আমার হাতে পড়েনি।

তেরো বৎসর বয়েসে আমি ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে কৃষ্ণনগর থেকে পালিয়ে পশ্চিম যাই; আর সাড়ে তেরো বৎসর বয়েসে কলকাতায় পড়তে আসি ও হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হই। এই সময় কোনও sentimental সহপাঠীর

অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়ি। সে বই আমার মনের উপর কোন ছাপ রেখে যায়নি। তারপর সাড়ে ষোলো বছর বয়েসে আমরা কৃষ্ণনগরে ফিরে যাই এবং সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি। এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইনি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর কাব্য পড়ি। অর্থাৎ আমি কোনও রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখিনি—দেখেছিলুম সাদা চোখে। আর তখন আমার চোখ কান দু-ই খোলা ছিল।

আমি এর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ কখনো দেখিনি। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, আকৃতি দীর্ঘ, কেশ আপৃষ্ঠ-লম্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দেহ বলিষ্ঠ, চর্ম্ম মসৃণ ও চিক্কণ, চোখ-নাক অতি সুন্দর।

আমাদের সমাজে গৌরবর্ণ স্ত্রী-পুরুষ একান্ত বিরল নয়, বিশেষত আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে। কিন্তু সে বর্ণ প্রায়ই "কটা"। লম্বা লোকও দুচারজন দেখেছি, কিন্তু তাঁদের দেহ সুগঠিত নয়, পদে পদে তাঁদের দেহের ছন্দপতন হয়। সুন্দর মুখও দেখেছি, কিন্তু সে সব মুখ যেন প্রক্ষিপ্ত, দেহ থেকে উদ্ভূত নয়। রবীন্দ্রনাথ সেকালে গায়ে জামা দিতেন না। পরতেন একখানি ধুতি আর গায়ে দিতেন একখানি চাদর। সুতরাং তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল; উপরন্তু তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছিল প্রাণে ভরপুর, প্রাণ তাঁর দেহে ও মুখে টগ্‌বগ্‌ করত। তিনি ছিলেন একটি জীবন্ত ছবি। রূপের যদি প্রসাদগুণ থাকে ত সে গুণ তাঁর দেহে ছিল।

এই সময়ে আমি তাঁর গানও শুনেছি। কণ্ঠস্বরের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য আমি পূর্ব্বে কখনও শুনিনি। বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুটি যন্ত্র আমাকে মুগ্ধ করত। একটি cornet, অপরটি 'cello; তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল cornetজাতীয়, 'celloজাতীয় নয়। প্রাণের উচ্ছ্বাস এ কণ্ঠস্বরের বিশেষত্ব ছিল। তিনি একটি হিন্দি গান গেয়েছিলেন, যা আমার আজও মনে আছে। তার প্রথম কথাগুলি "জন ছুঁয়া মোরি বঁইয়া নাগরওয়া"। এ গানটির সুর বোধহয় তোড়ী, নয়ত সেই ঘরের। এ রাগে গলা খোলবার ও তোলবার যথেষ্ট অবসর আছে। আর তাঁর সুর তারার পঞ্চম পর্যন্ত অবলীলাক্রমে উঠে যেত। কিন্তু সে-সময়ে লক্ষ্য করি যে, তিনি তানের পক্ষপাতী ছিলেন না

খেয়ালের বে-পরোয়া তানের ও টপ্পার অবিশ্রান্ত কম্পনের সাধনা তিনি করেননি। সঙ্গীতের এ দুই কাজ বাঙ্গালীদের কোনকালেই শ্রোত্র-রসায়ন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কানে এ জাতীয় টপ্পাখেয়াল শ্রুতিকটু। সুর যখন কথার সঙ্গে সন্ধিবিচ্ছেদ করে' যন্ত্র-সঙ্গীতের বৃথা নকল করে, কবির কানে তা গ্রাহ্য হয় না। আমি বুঝলুম যে, ধ্রুপদ অঙ্গের গানেই তাঁর কান অভ্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গানের বিশেষত্বও এই। তাঁর অন্তরের অদম্য প্রাণশক্তি সঙ্গীতশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অতিক্রম করতে বাধ্য। এ প্রবন্ধে অবশ্য আমি তাঁর গানের আলোচনা করব না। মোদ্দা কথা এই যে, তাঁর রূপ দেখে ও কণ্ঠস্বর শুনে আমি প্রথম থেকেই তাঁকে একজন লোকোত্তর পুরুষ বলে চিনতে পারি। যখন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি, তখন তিনি আমাকে দেখেন নি। এর কারণ রোগশয্যায় আমার মস্তক মুণ্ডন করা হয়েছিল, তাই আমি লোকসমাজে দেখা দিতুম না।

সে যাই হোক্, আমি পাশের ঘর থেকে তাঁর ও তাঁর সহচরদের কথাবার্ত্তা শুনতুম। তাঁর কথোপকথন আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর রসিকতার চুম্‌কি-বসানো কথাবার্ত্তা ও তাঁর মনের স্ফূর্ত্তি আমাকে অবাক করত। আমি আসলে বাঙ্গাল হলেও, হয়ে উঠেছিলুম কৃষ্ণনাগরিক। আর সেকালে কৃষ্ণ-নাগরিকদের, বিশেষতঃ নিষ্কর্ম্মা বারেন্দ্র দলের আর কোনো গুণ না থাক্, তাঁরা বাক্-চাতুরীর চর্চ্চা করতেন এবং রসিকতা যে বাক্যের একটা মহাগুণ, তা আমি জানতুম। তাই রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন যে যেমন মনোহারী তেমনি উজ্জ্বল, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য যে রসিকতায় চমকপ্রদ, তা আশা করি সকলেই জানেন। এ গুণ কবিত্বশক্তির মতই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। বড় কবিও যে অসাধারণ witty হতে পারেন, ইনিই তার প্রমাণ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে আমি দূর থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখি, আর পাশের ঘর থেকে তাঁর কথাবার্ত্তা শুনি। রবীন্দ্রনাথের দুজন সঙ্গী ছিল,—তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রমণীমোহন ছিলেন দাদার কৈশোরের সহপাঠী আর তাঁর আকৈশোর বন্ধু। উপরন্তু তিনি ছিলেন M.A. পাশ আর অতি

বুদ্ধিমান লোক। দাদা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ ও রমণীমোহন—আমার যতদূর মনে পড়ে, এঁরা চারজনে হাসিঠাট্টাতেই দিন কাটাতেন। এঁদের মুখে কোন সাহিত্য-আলোচনা শুনি নি। রবীন্দ্রনাথের স্ফূর্ত্তিই আমাকে মুগ্ধ করে। আর একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করি,—রবীন্দ্রনাথের ভাষা। সে ভাষা খাস্ কল্‌কত্তাই ভাষা নয়—সুশিক্ষিত ও ভদ্র ভাষা; যে ভাষায় আজকাল প্রায় সকলেই কথা কন্। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় তিনচার দিন পরে কলকাতায় ফিরে গেলেন; আমাদের বাড়ীর আলো নিবে গেল।

এর মাসখানেক পরেই আমি দাদার সঙ্গে কলকাতায় আসি, আর তদবধি এইখানেই রয়ে গেছি। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় হপ্তায় দু'তিন দিন আমাদের বাসায় আসতেন। সেই সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। তাঁর "কড়ি ও কোমল" সম্পাদনের ভার দাদা নিয়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁদের যা আলোচনা হত তা'তে যোগ না দিলেও, সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম। এর কারণ আমি তখন রোগমুক্ত হয়ে convalescent অবস্থায়, তাই কলেজ যেতুম না, বাড়ীতেই থাকতুম। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শুনে আমি আবিষ্কার করি যে, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আমি তখন বাঙলা জানতুম, কেননা আমি ছাত্রবৃত্তিপড়া ছেলে; আর ইংরাজীও মন্দ জানতুম না। তাই রবীন্দ্রনাথের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারতুম। আর একরকম রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ায় বাস করে' আমার অন্তরের অঙ্কুরিত মতামত ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। এবং তাঁর কাব্যের সঙ্গেও পরিচিত হলুম। সেকালে অনেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু আমি এই বিরোধী সমালোচকদের কথা উপেক্ষা করতে শিখলুম।

আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মাত্র লিখলুম। আমার পরবর্ত্তী জীবন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতদূর জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার বিবরণ দিতে হলে আমার নিজের জীবনচরিত লিখতে হয়। আমার মহা সৌভাগ্য এই যে, আমার যৌবনের প্রারম্ভে আমি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মানসিক আবহাওয়াতেই মানুষ হই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আমার প্রতি অনুকূল হন, আর এই দীর্ঘ

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

জীবনে আমি তাঁর অনুগ্রহে কোনদিন বঞ্চিত হই নি। আমার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন অহং ছিল এবং আছে, যা সহজে কারও বাগ মানে না।

তিনি যে একজন লোকোত্তর পুরুষ, আজ তা সকলে স্বীকার করবেন। তিনি কায়মনোবাক্যে পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর বিচিত্র জীবন হচ্ছে একটি জীবন্ত কাব্য, যা শতদলের মত ফুটে উঠেছে।

পূর্ব্বস্মৃতি

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ আজ রোগশয্যায় শয়ান। তাঁর জন্য সকলেই উদ্বিগ্নচিত্ত। এমতাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধে বলবই বা কি, শুনবেই বা কে? কেবলই মনে হয়—"নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।" "একে একে নিবিল দেউটি"।

অবশ্য চিরকাল এরূপ ছিল না। তাই পূর্ব্বস্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়ে এলেও কিছু আলো ফেলে। স্মরণপথে লোকে সুখের স্মৃতিই টেনে আনে, দুঃখের স্মৃতিকে দূরে ঠেলে রেখে দিতে চায়। আর জীবন-প্রভাতে সকলই সুন্দর লাগে; অন্ততঃ পিছিয়ে দেখতে গেলে কালো দাগগুলি চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলে ভালবাসতেন ও গানে গল্পে তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারতেন; সে-বিষয়ে পুরুষানুক্রমে অনেক শিশুসাক্ষী পাওয়া যাবে। তাই ছেলেরাও তাঁকে ভালবাসত। ছেলেবেলায় যখন একসঙ্গে বিলেতে ছিলুম, তখন মনে পড়ে আমাদের হাসাবার জন্য তিনি কত রঙ্গভঙ্গ করে' হিন্দী ও ইংরেজী গান গাইতেন। এমন কি, পরে এদেশে এসেও রেল-লাইনের আদ্যাক্ষর নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, যথা: E. I. R., G. I. P. R., D. M. S. R. ইত্যাদি। যেমন জ্যাঠামশায় (পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ) "ইজিপ্ট নিউবিয়া, অ্যাবিসিনিয়া" প্রভৃতি ভৌগোলিক ছড়ায় সুর দিয়েছিলেন! আসল কথা, ওঁদের শেষ বয়স পর্য্যন্ত ভিতরের আদিম শিশুটি একেবারে চাপা পড়েনি, তাই নিজের মনকে অত সরস সজীব রাখতে পেরেছেন।

এক গানের চারদিকেই কত স্মৃতি গুণ্‌গুণ্ করে' বেড়ায়, তার ঠিক নেই। বিলেতে বিলিতী গান; এদেশেও মাঝে মাঝে পিয়ানোর সঙ্গতের সঙ্গে ইংরিজী গান; আর রকমারি বাঙ্গলা গানের ত ইয়ত্তা নেই। কথা ফুটতে না ফুটতে বোধহয় ভানুসিংহের পদাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়—তার মানে বুঝি আর নাই বুঝি। মনে আছে একবার সিমলার পাহাড়ে ছোটবেলায় একটি স্বনামধন্য বয়স্ক বন্ধু "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" গান শোনবার পরে, "ইন্দু" কথাটার মানে জিজ্ঞেস করলেন, ও জানিনে শুনে ব'লে দিলেন। কত বিস্মৃত কথার মধ্যে এই সামান্য কথাটি মনে আছে। স্মৃতির রহস্য কে ভেদ

করবে ? আর একবার দিদিমার বাড়ীর পাশের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে অম্লানবদনে "প্রেমের কথা আর বল' না" গেয়েছিলুম ; তাতে বোধহয় ছোট মুখে বড় কথা শুনে তাঁরা একটু অবাক হয়ে থাকবেন ! সেটি পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অশ্রুমতী" নাটকের গান। এখন তাই ভাবি যে, সে-সব নাটক গেল কোথায় ?—অথচ তখন সেগুলি কত জনপ্রিয় ছিল। কল্যাণীয় দিনেন্দ্রনাথের মুখেও তাঁর দাদামশায় স্বরচিত একটি প্রেমসঙ্গীত আড়াল থেকে শুনে ফেলেছিলেন ব'লে বেচারাকে খুব বকুনি খেতে হয়েছিল, শুনেছি। আবার পাঁচ বছরের ছেলে 'নিবার নিবার' প্রাণের ক্রন্দন, কাটহে কাটহে এ মায়া বন্ধন" গেয়ে বেড়াচ্ছে শুনেও লোকে হাসত !—কি করা যাবে, ছেলেরা তোতা-পাখী বৈ ত নয়। যে দেশে যখন বেড়াতে গেছি, সে দেশের গান সংগ্রহ করে' বাঙ্গলা কথা বসানো বা 'ভাঙ্গা' নিয়মের মধ্যে ছিল। এরকম করে' মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী, কোনটাই বাদ যায় নি। এখনো সে পুরনো গানের খাতা আমার কাছে রয়েছে ; কিন্তু গায় কে ? তেহিনো দিবসাঃ গতাঃ।—'খেলতে এল ভবের নাটে, নূতন লোকে নূতন খেলা।'

গানের অঙ্গাঙ্গীভাবে গীতি-নাট্যও আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-রূপে জড়িত। 'মায়ার খেলা' 'বাল্মীকি প্রতিভা-র' নাম কতই না স্মৃতির উদ্রেক করে, এবং বাড়ীর কত না মেয়েই যুগে যুগে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমা ও প্রধানাকে জ্যাঠামহাশয় অভিনয়ান্তে খুসি হয়ে "কিগো, সরস্বতী সাহেব !" বলে' পিঠ চাপ্‌ড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মনে পড়ে। মেয়েপুরুষ নির্ব্বিচারে 'সাহেব' বলে' সম্বোধন করা তাঁর এক রোগ ছিল। তার আগে 'মানময়ী' ও 'বসন্ত-উৎসব' গীতি-নাটিকা যোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় অভিনীত হয় ; যার নামও বোধহয় একালের কেউ শোনেনি। আমার মাতৃদেবীর একটি অধুনাদুর্লভ গুণ ছিল, প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিচিত্র জনগণকে সুখে-দুঃখে সেবাসহানুভূতি করা, এবং সকলকে একত্র করে' নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ অভিনয়াদি জমানো। তারও আগে বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের চিত্তরঞ্জনার্থে যোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় আমার দুই কাকামহাশয় বিবাহের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বনেরচিত একটি ক্ষুদ্র গীতাভিনয়

করেন, সেটি সম্ভবতঃ নাট্যসম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রথম স্মৃতি। কোন দর্শকের সোল্লাস হাততালির চোটে তাঁর কোলে বসানো একটি ছেলে চৌকীর তলায় পড়ে' যায়,—সে ঘটনাটিও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য! দেখেশুনে মনে হয় নাট্যকলার প্রতি সমস্ত ঠাকুরগুষ্টিরই চিরকাল একটু বিশেষ পক্ষপাত ছিল—যার রেশ এখন পর্য্যন্ত চলে' এসেছে। 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জ্জন' বহুকাল পরের কথা; এবং 'ফাল্গুনী' থেকেই বোধহয় আধুনিক রূপকনাট্যের সূচনা হয়। কিন্তু এতবার দেখেও সেই পুরণো 'বাল্মীকি-প্রতিভা'কেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য বলে' আমার এখনো মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন অপূর্ব্বসুন্দর অফুরন্ত গীতরচয়িতা, তেমনি অসাধারণ সুদক্ষ অভিনেতা,—সেকথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করতে আমি বসিনি, বা করাও আমার সাজে না। স্মৃতির উদ্যান থেকে গুটিকয়েক পুষ্পচয়ন করে' অঞ্জলি দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করা। লেখকের মনে আনন্দ না থাকলেও, পাঠকদের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ দান করতে পারলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

পূজনীয় কাকামহাশয়কে ভগবান নিরাময় করুন, তাঁর রোগযন্ত্রণার উপশম করুন, এই এখন তাঁর কাছে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। যদিও মুখে বলি "তোমারি ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ", কিন্তু পরক্ষণেই "করুণাময় স্বামী" বলে' ভগবানকে ডাকি। যদিও দৈনিক উপাসনার মন্ত্রে তাঁকে "রুদ্র" বলে' সম্বোধন করি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বলি "তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর।" আমাকে মানে আমাদের। সে প্রার্থনা কি তিনি পূর্ণ করবেন না?

আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১)

চল্লিশ বছর পূর্ব্বে যখন প্রবেশিকার দরোজা পার হয়ে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি তখন ছাত্র মহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাবের মধ্যে কৌতূহল সব চেয়ে প্রবল। 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত প্রকাশ হয়েছে। নব-পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' চলছে। ভারতীতে 'চির-কুমার সভা' বেরিয়েছে। ছোট গল্পের অনেকগুলি বিখ্যাত গল্পই লেখা হয়েছে। প্রদীপে 'কাদম্বরী-চিত্র' ও ভারতীতে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বের হয়েছে। কালিদাসের কাব্য-সমালোচনার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ্য সভায় পড়া হয়ে বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও ব্যাকণের আলোচনা সুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালীর কণ্ঠ একচেটে করার উদ্যোগ করছে। এ কবি ও লেখক যে নূতন ধরণের, এবং সম্ভব জীবিতদের মধ্যে সব চেয়ে বড় এ ধারণা দেশে, সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে, এসেছে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে এই বাঙ্গালা দেশে এক আশ্চর্য্য উৎকর্ষের বহুমুখী প্রতিভা এমন সৃষ্টি ক'রে চলেছে যার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কদাচিৎ মেলে সে জ্ঞান জন্মে নি, এবং সে কথা ভাবার সাহসও মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অস্পষ্ট, ওর মধ্যে যে শক্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে পেয়েছি বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, (যে অভিযোগ আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ সময়ে ৺দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় এনেছিলেন), সে নালিশ আমাদের মধ্যে একদলের মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টি ত একরকমের নয়! অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত 'কথা' ও 'কাহিনী'র কবিতাগুলি আমাদের সকলের মন লুট ক'রে নিয়েছিল। "সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" কি—

"পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে"

আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। পুরানো University Institute-এর হলে ৺ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দীবীর' যেমন আবৃত্তি করেছিলেন ঠিক তেমনি গলায় সেই রকম আবৃত্তির চেষ্টা তখন অনেকেই করেছি। কিন্তু সব

কিছুকে ছাপিয়ে উঠতো রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগ্রহ ও তাঁর গান শোনার লোভ। এ কবির আকৃতি ও প্রকৃতি, স্বর ও সুর যে আর পাঁচ জনার মত নয়,—অভিনব জিনিষ, এ ছিল প্রকাণ্ড আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যে সভায় কোন প্রবন্ধ পড়তেন সেখানে ছাত্রদের ভীড় হ'তো অসম্ভব রকম। কিন্তু সে ভীড় কেবল তাঁর প্রবন্ধ শুনতে নয়, তাঁকে দেখতে ও তাঁর পড়া শুনতে। এবং সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-পাঠকই থাকুন, আর সভাপতিই থাকুন সভার শেষে তাঁর গান শোনার দাবী ঐকতান চীৎকারে আমরা বরাবর জানিয়েছি; আর এ কাজে, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোককেও মাঝে মাঝে abettor পাওয়া যেতো। তাঁর সাহিত্যে ও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু।

(২)

এর পর যখন কলেজের উঁচু শ্রেণীতে উঠেছি তখন এলো বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। যে আবেগ ও উত্তেজনা বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, বিশেষ আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ে জেগে উঠলো তার অনুরূপ কিছু এ সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নি, এবং পরেও আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন, হ'য়ে উঠলেন ছাত্রদের অন্তরঙ্গ। প্রথম রাখী-বন্ধনের দিনের গান চাই। "বাংলার মাটি বাংলার জল" প্রস্তুত। টাউন হলের বিরাট জন সভায় গাওয়ার জন্য গান দরকার। এলো "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"। তাঁর সুরের সঙ্গে আমাদের বেসুর মিশিয়ে সে গান আমরা সে সভায় গেয়েছি। দিনের পর দিন তাঁর প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের অনুভূতির তন্ত্রী ঝন্ ঝন্ ক'রে কেঁপে উঠতে লাগলো।

"মোদের যাত্রা হ'লো সুরু এখন ওগো কর্ণধার"।
"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন্ শক্তিমান"।
"ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি"।
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে"।
"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না
ভয় থাকে ত করি মানা"।

সেদিনকার কতকগান কাব্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। কিন্তু সেদিনের তরুণ যুবকদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ দিয়ে এসব গান যাচাই করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে নির্ভয়ে ফাঁসিকাঠে উঠতে পারে তার সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম ছিল না। যে মোহের অবশেষ মনের মধ্যে আজও আছে।

এই রাষ্ট্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে, এবং তারই ফলে, যখন শিক্ষার আন্দোলন এসে মিশলো তখন দেশের ছাত্রসমাজ এলো রবীন্দ্রনাথের মনের আরও কাছে। আর আমরা তাঁর মন জয় ক'রে নিলুম দেশের দরিদ্র ও অসহায়দের সেবাতে সংঘবদ্ধ কর্ম্মকুশল নিষ্ঠায়। সুরাটে কংগ্রেসি 'যজ্ঞভঙ্গের' পর দেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী politics-এর ফাটলঢাকার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে করা হ'লো 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর' সভাপতি। এর অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই নিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার একটা বড় পরিচয় দিয়ে দেশকে চমৎকৃত করেছিল অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে। তাঁর অভিভাষণের শেষদিকে এই তরুণদের সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কণ্ঠে পড়লেন, "রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমারই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারত বিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে।"

আমরা তখন সবেমাত্র কলেজের পাঠ শেষ করেছি। অনেক ছাত্র ও

আমাদের মত অনতিপূর্ব্ব-ছাত্র এ সম্মিলনে উপস্থিত ছিল। মনে হ'লো আমাদের চেষ্টা ও শ্রমের পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

(৩)

আমাদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের এ প্রভাব অবশ্য 'বাহ্য'। মনে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের যে স্পর্শ সেই স্পর্শই অন্তরতম, আর তার যা ফল সেই ফলই চরম ফল। নিশ্চয় আমাদের সকলে সে স্পর্শ পায় নাই। যারা পেয়েছিল তাদের অনেকের মনে যে ফল ফলেছিল তার স্বরূপ বলছি।

আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন বাংলা দেশের উচ্চ-শিক্ষায় চলছে dark age। ইংরেজী সাহিত্যের যে রস আমাদের পূর্ব্বতনদের চিত্ত সরস করেছিল, ইউরোপের যে নব বিদ্যা ও চিন্তা তাঁদের মনকে মোহ-মুক্তির নাড়া দিয়েছিল—তাকে প্রসন্ন ঔদার্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে আমাদের মনে এসেছিল সঙ্কোচ। ও-বিদ্যা ও-চিন্তায় যে আমাদের দেশের কোনও দান নেই, অথচ তাকে আয়ত্ত করাই উচ্চশিক্ষা; আমাদের অধ্যাপকেরা যে তাকে যাচাই করেন না, কেবল ওর ভার নিজের মন থেকে আমাদের মনে নামিয়ে দেন,—তার পীড়ায় আমাদের মনের গ্রহণের শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। এ বিদ্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দেশ থেকে কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মনের মাটিতে শিকড় চালিয়ে তার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয় নি। সুতরাং আমাদের কাছে এ বিদ্যা ছিল পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র, অর্থাৎ বোঝা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার গানে—

"জয় তব হোক জয়
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়।

*　　*　　*　　*

দুঃখ দৈন্য যা আছে মোদের
তোমারে না বাঁধি রয়।"

যে মনঃপীড়া প্রচ্ছন্ন আছে আমরা ছাত্রদের অনেকে তার গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলাম না। আজ এ দুঃস্থতা কতকটা দূর হয়েছে ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তির কল্যাণে।

আষাঢ়, ১৩৪৮

আমাদের মন্দ ভাগ্যে আমাদের সাহিত্যের পাঠও যথোচিত আনন্দের ছিল না। ওর মধ্যেও ছিল একটা বড় রকম বোঝার ভার। সাহিত্য বলতে অবশ্য বোঝাত ইংরেজী সাহিত্য। সংস্কৃত কাব্য যা দু' একখানা পড়ান হ'তো তা সাহিত্য হিসাবে নয়, কি হিসাবে বলা কঠিন। কাব্যকে তার কবিত্ব থেকে বিমুক্ত ক'রে তার anatomy-র উদ্‌ঘাটন ছিল সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ। এবং সে anatomy-র বেশীর ভাগ osteology, অস্থিবিদ্যা। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যও আমাদের কেবল আকর্ষণ করেনি, তার মধ্যে একটা স্পর্দ্ধা যেন আমাদের আঘাত করতো। পাঠ্য নির্ব্বাচনে বড় ছোট লেখকের ভেদ ছিল না। ইংলণ্ডে কিঞ্চিৎ সুনাম থাকলেই তিনি ছিলেন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ লেখক, যদিও সম্ভব বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জের বাইরে তাঁর লেখা ইউরোপে আর কেউ পড়ে নি। বৃটিশ-শাসন যেমন নির্ব্বিবাদে মানার জিনিষ, বৃটিশ কবি ও লেখকের শ্রেষ্ঠত্বও ছিল তেমনি নির্ব্বিচারে স্বীকারের বস্তু। এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বুঝিয়ে দিতে অধ্যাপকদের ক্রটি ছিল না, অবশ্য ইংরেজ সমালোচকের বই থেকে টুকে এনে। আমাদের সময় English Men of Letters পর্য্যায়ের অনেক বই অবশ্য-পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না তিনিও নাকি failure of a great poet. নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হ'তো ধৃষ্টতা। ইংরেজী সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জ্জনী আমলের বৃটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক।

কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে করেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে। তাঁর কাব্যে আমরা সেই রস পেলাম মন যাকে গ্রহণ করলো দ্বিধাহীন আনন্দে। তাঁর নাম আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কখনও উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু আমরা মনে জানলুম যে সব সাহিত্যের তাঁরা 'নোট' লেখান এ সাহিত্য তার থেকে খাটো নয়। এবং এ সাহিত্য যে লেখা হচ্ছে আমাদেরই মুখের ভাষায়, আর যিনি লিখেছেন তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যেই মাঝে

মাঝে পাই—এ হয়েছিল আমাদের মনের বিশল্যকরণী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করেছিল কেবল তা নয়, তাঁর সাহিত্যই আমাদের মনের দীনতা ঘুচিয়ে ইংরেজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমাদের মনকে অনুকূল করেছিল। তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হ'য়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজী পুঁথি থেকে ধার করা নয়, যাতে সোনাকে সোনা এবং পিতলকে পিতল বলেই চেনা যায়।

আমাদের কলেজে পড়ার সময়েই 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি প্রায় লেখা হয়। আমাদের সাহিত্যিক রুচি ও অনুভূতির গড়নে সেগুলি ছিল অমূল্য। তাতেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথের টীকা নয়, বাল্মীকির রামায়ণ ধর্ম্মসংহিতা থেকে ভিন্ন।

আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল।

"ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।"

বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

কেহ বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না,
কেহ ইহাকে শুনিয়াও শুনে না।
কিন্তু [বাক্] কাহারও-জন্য [নিজ] তনু আবিষ্কৃত করে,
পতির-জন্য প্রেমময়ী সুন্দর-বস্ত্র-পরিহিতা জায়া যেমন॥

প্রায় ৫০ বৎসর হইল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন—তাঁহার "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। এটী তাঁহার "শব্দ-তত্ত্ব"-নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহে প্রথম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বে ও পরে তাঁহার সাহিত্য-জীবনে তিনি নানা-ভাবে সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্য-আলোচনা এই উভয় পথেই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ধন্য এবং ইহাকে জগৎ-সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে। একদিকে তিনি যেমন অপার্থিব বিভূতির অধিকারী, যে বিভূতি বা দেবদত্ত শক্তি না থাকিলে শিল্প-রচনা সার্থক এবং শাশ্বত রস-রচনার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে তিনি সাধক, তিনি প্রয়োগ-বিজ্ঞানে নিপুণ শিল্পী, যে প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার রস-সৃষ্টিকে আদিম বা আদিম-গন্ধী এবং অশিক্ষিত-পটু রচনার ঊর্ধ্বে, প্রৌঢ় এবং শিক্ষিত শিল্পের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তু-তন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।

প্রয়োগ-নিপুণ শিল্পী বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কেবল অনুভূতি ও আবেগ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিতে হইয়াছে, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক হইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কাছে কিছুই

তুচ্ছ নয়—যাহা-কিছু চর্মচক্ষের সমক্ষে "সৎ" বা বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির কৌতূহল থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের মনও এই বিশ্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন। বৈজ্ঞানিক বিশ্বন্ধরত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে রসানুভূতি-জাত কল্পনা ও প্রকাশ শক্তির একত্র সমাবেশ, পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ মনের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই জরমান কবি Goethe গ্যোতে-তে; আমাদের দেশে রস-রচয়িতাদের মধ্যে এরূপ সর্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন বোধ হয় এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা দিয়াছে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঔৎসুক্য এবং অনুধাবনের পরিচয় দিয়াছেন। গণিত, ফলিত বিজ্ঞান—দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞান—রীতিমত অনুশীলন না করিলেও, ঐসব বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন। তিনি ভাষা-গত বস্তুর আলোচনা অবলম্বন করিয়া যে সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আধুনিক ভারতে ভাষানু-সন্ধিৎসুগণের পক্ষে ইহা একটী মার্জনীয় আত্মপ্রসাদের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের মত দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি, শাব্দিকগণের অগ্রণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকাশ হইতেছে প্রধানতঃ বাঙ্ময় প্রকাশ। সঙ্গীত, অভিনয়, রূপকর্ম—এই তিনেও তাঁহার লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয় কৃতিত্ব থাকিলেও, মুখ্যতঃ তিনি কবি, তিনি শব্দচিত্রকার, তিনি ভাষাশিল্পী। তাঁহার প্রতিভার এই প্রধান অবলম্বন, ভাষা, এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গভাষা, তাঁহাকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহা স্বাভাবিক।

মধ্য-যুগের সংস্কৃত বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের প্রারম্ভে, ভাষা এবং ভাষাশ্রয়ী চিন্তার উৎস-স্বরূপ শাশ্বত সত্তার প্রণাম করিয়াছেন চিরাচরিত রীতিতে "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া; কারণ, উপনিষদের কথায়, "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"—এই শাশ্বত শিব হইতে

আষাঢ়, ১৩৪৮

পুরাতনী প্রজ্ঞা—বাক্—নিঃসৃত হইয়াছেন। তাহার পরে বৈয়াকরণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর-ভাবের পরিচায়ক দুইটী শব্দে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

॥ শং শব্দৈঃ ॥

অর্থাৎ, শব্দ-সমূহ-দ্বারা শম্ অর্থাৎ মঙ্গল হউক। বৈয়াকরণ এখানে রহস্য-বাদী হইয়াছেন—ক্ষুদ্র দুইটী শব্দের সাহায্যে, মানব-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি, সৌন্দর্য এবং অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা বা উপলব্ধির আভাস আমাদের তিনি দিয়াছেন; বাঙ্ময়-গত রহস্য বা আনন্দ-বোধের পরিচয় নীরস ব্যাকরণ-সূত্রে পরে আর কোথাও দিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও নিজ সমগ্র জীবনে শব্দ-দ্বারা এই 'শম্' বা 'সত্য-শিব-সুন্দর'-এর প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে শব্দের শক্তি, প্রয়োগ ও বিবৃতি—অর্থাৎ 'ব্যাকরণ'—লইয়া বিচার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; বৈজ্ঞানিক-সুলভ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বশে কবি রবীন্দ্রনাথ, 'ব্যাকরণিয়া' রবীন্দ্রনাথ হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার "বাংলাভাষা পরিচয়" বইয়ে। বছর তিনেক হইল এই বই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে নিজ অবলোকন-লব্ধ কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্য রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা রবীন্দ্রনাথের এ-তাবৎ প্রকাশিত শেষ রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর মত অনুশীলন-রীতি বা পরিপাটী অবলম্বন করিয়া ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নাই, সেইজন্য তিনি নিজেকে "ভাষা-সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী" না বলিয়া, নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী।........বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে।......জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি, তা হ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হবো।"

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার-শীল হইয়া কথাগুলি লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার প্রেরণা নিজের কথাতেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, তার ব্যাখ্যা ক'রে আমি এই বইটি আরম্ভ করেছি।" আমার মনে হয়, ভাষা সম্বন্ধে এই রহস্য-বোধ, আর ভাষার ব্যাখ্যার চেষ্টা, এই দুইটীর সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব এবং কৌতূহল, তাঁহার রস-রচনা এবং ভাষা-ঘটিত আলোচনা, উভয়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে জাগাইতে সমর্থ হইষাছেন।

ভাষা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের "বিশেষ সাধনা" ছিল না, এ কথা তিনি বলিয়াছেন। বিশেষ সাধনা, professional বা পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকের মত ছিল না, হয় তো এ কথা সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা যে অনন্যসাধারণ, তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা ছন্দ বিষয়ে আলোচনায় ভূরি ভূরি আছে। "শব্দ-তত্ত্ব"র প্রবন্ধাবলী হইতে দেখা যায়, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু অনুশীলন হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন সে সমস্তটুকুর সহিত পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু তিনি আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে, এবং বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন, প্রথম চিরতরে এই-সব বিষয়ে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। যেমন বাঙ্গালার স্বর-সঙ্গতির সূত্রগুলি; বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতি—ইহারই আধারে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার এই শ্রেণীর শব্দগুলির এক অতি চমৎকার আলোচনা করেন ("ধ্বনি-বিচার", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা; "শব্দ-কথা", ১৩২৪, প্রথম প্রবন্ধ)। বাঙ্গালা 'নাম ও সর্বনাম শব্দের তির্যক্ রূপ সম্বন্ধে, এবং এই রূপ আরও কতকগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বাদ দিতে পারা যায় না।

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যে ভাবে আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন, পরবর্তী কালে সে আকর্ষণ তাঁহার মনে হয় তো ছিল না—কারণ পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক না হইলে এই জটিল বিষয়ের সমস্ত সূত্র

ধরিয়া অনুসন্ধান করা সাধারণের পক্ষে একটু কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে—ভাষাশিল্পী কবির পক্ষেও বটে। নিছক শাব্দিক অপেক্ষা কবির আসন অনেক উচ্চে,—শাব্দিকের মত আদার ব্যাপারী হইয়া থাকা কবির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কবি যে অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ধারা বহিয়া উত্তর-কালে শব্দশাস্ত্রের কোনও বিরাট্ গবেষণায় তাহার পরিণতি হয় নাই। ইহাতে হয় তো শব্দশাস্ত্রের দিক্ হইতে আমরা একটু আক্ষেপ করিতে পারি; কিন্তু সমস্ত শব্দশাস্ত্র অপেক্ষা যাহা বড়, যাহা ব্যাপক, যাহা মানব জাতির পক্ষে উপযোগী, সেই কাব্য-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করিয়াছেন, মানব-জাতির শাশ্বত সম্পদ্রূপে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; নিছক বৈজ্ঞানিক হইয়া শব্দের জালে তিনি যে জড়াইয়া পড়েন নাই, শব্দকে পক্ষ করিয়া তিনি অসীমে যে উড্ডীন হইয়াছেন, ইহা মানব-জাতির সৌভাগ্য।

ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ছন্দের প্রকৃতি লইয়া কতকগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঙ্গালা ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ অমূল্যবাবু যে ভাবে বাঙ্গালা ছন্দের রীতি ও নিয়মগুলি সূত্র-নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে ছন্দস্তত্ত্ব লিখেন নাই। এখানে তিনি ছন্দোরাজ্যের বিজ্ঞান-সম্মত ভৌগোলিক নহেন, তিনি ছন্দোরাজ্যের সম্রাট্,—এমন জনপ্রিয় সম্রাট্ যিনি নিজ রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীন-ভাবে অপ্রতিহত-গতিতে বিচরণ করেন, ও সেই দেশের খবর যাহারা চাহে, তাহাদেরও এই বিচরণ-লব্ধ জ্ঞান দিতে কার্পণ্য করেন না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাঁহাকে "বাক্পতি" বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ধন্য, ইহার কাব্য-সাহিত্য ধন্য, ইহার তথ্যানুশীলন ধন্য, যে এই ভাষায় এত বড় বাক্পতি কবি এবং মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যিনি সত্যকার বাগ্‌দ্রষ্টা ও বাক্শ্রোতা, এবং যাঁহার নিকট বাগ্‌দেবী আপনাকে প্রকট করিয়াছেন॥

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের জীবনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এতই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁর প্রতিভা এতই সর্ব্বতোমুখী যে রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর দান মূল্যবান হওয়াটাই স্বাভাবিক। গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতার সাহায্যে স্বদেশী-যুগের আগে থেকেই দেশবাসীকে তিনি প্রবুদ্ধ করে এসেছেন। মাতৃভাষার সাধনা ও নানা উপায়ে ভারতবর্ষের মহান আদর্শকে জীবন্ত ও পরিপুষ্ট করার তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসও আমাদের অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার প্রতীতি জন্মেছে যে সাহিত্য, সঙ্গীত, অন্যান্য চারুকলা কিংবা দর্শনের গণ্ডীতে তাঁকে আবদ্ধ রাখা অন্যায়। এতে তাঁর সম্পূর্ণতাকে এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে খর্ব্ব করা হয়। সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি কলাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ভারতবর্ষকে আরো স্পষ্টভাবে জানাবার সময় এসেছে। আজ নানা কারণে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তায় ও কর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা এসেছে, অথচ ভারতবর্ষে এমন কোনো ক্ষণ আসেনি যখন তার নিয়তি এতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল বিশ্বের সাথে। আমাদের অন্ততঃ চিন্তাপ্রবাহকে মুক্ত ও পূর্ণ করার একটি সদুপায় হল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্পর্কে বক্তব্যের প্রসার। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি স্বল্প কথায় সেই বক্তব্যের মাত্র মূলসূত্রের নির্দ্দেশ করব।

ও দেশে যাকে পলিটিক্স বলে তার পিছনে রয়েছে একটি বড় ধারণা এবং একটি সার্ব্বিক ব্যবহার। মানুষ যেখানে মানুষ হিসেবেই গণ্য, সেখানকার রাষ্ট্রপদ্ধতি মানুষের দাবী মেনে চলতে বাধ্য। দাবীর প্রকাশ সমবেত কর্ম্মে, তাই রাষ্ট্রিক ব্যবহার জনগণেরই সাথে। জনগণের প্রত্যেকে দাবী প্রকাশ করতে যেকালে অসমর্থ তখন প্রতিনিধিত্ব এসে পড়ে। ক্রমে প্রতিনিধিবর্গ দূরে সরে যান, স্বার্থসর্ব্বস্ব হন, রাষ্ট্র-প্রত্যয় কল্পিত হয়। যোগটি কিন্তু কখনও একেবারে ছিন্ন হয় না তার পূর্ব্বেই জনগণ আপন অধিকার জানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষের অবস্থা ভিন্ন। গ্রামাতীত শাসনপদ্ধতির ওপর সমবেত মানুষের মানুষ হিসেবে সাধারণ দাবী-দাওয়া কখনও ছিল না—না হিন্দু-যুগে, না মুসলমানদের সময়। অন্য ভাষায়, 'স্টেট', আমাদের হয়নি। এল ইংরেজ,

বণিক হিসেবে, পরে ইংরেজ-অধিকারের রূপ-পরিবর্ত্তন হল, পেলাম সাক্ষাৎ আমলাতন্ত্রের। এ-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে হব্‌স্‌, লক্‌, রুসো, হেগেল, গ্রীন প্রভৃতির রাজনৈতিক মতবাদের তুলনা নিরর্থক। এই জন্যই আবার ভারতীয় রাজনীতির বিচার সমাজপদ্ধতির বিচারের সঙ্গে জোড়া হতে বাধ্য। রাজনীতির আলোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দারিদ্র্যের, আমাদের বিড়ম্বনার জন্য আমাদের সমাজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, তার অন্যায়কেই প্রধানত দায়ী করেছেন। তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র সমাজেরই বিকাশ।

সমাজ বলতে তিনি মানুষের গতিশীল, জীবন্ত সম্বন্ধই বোঝেন। অনেকের মতে আমাদের সমাজের গূঢ়তত্ত্ব হল 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।' রবীন্দ্রনাথ এ-কথা মানেন না। মানুষ যেকালে শব নয়, চিত্তবৃত্তিও যেকালে চলিষ্ণু, তখন পরধর্ম্মকে বরণ করার দুঃসাহসে তিনি শ্রদ্ধাবান। সম্বন্ধ অপ্রাকৃত নয়, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষও নয়। সম্বন্ধ প্রধানত সমবেত; অর্থাৎ আদান-প্রদানের, দাবী-দাওয়ার, শক্তি-প্রসারের এবং অগ্রস্থতির প্রেরণার। সমবায় যন্ত্রের আকার ধারণ করে যখন ব্যক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত, তিনি তীব্রভাবে তার ভিত্তি ও উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করান। এই সময় তাঁর মতামত ব্যক্তিত্ববাদের মতন শোনায়। কিন্তু এগুলি সীমার কথা। ইতিমধ্যে, তিনি সমবায়ী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'সংস্কারক' নন। তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস এই যে সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোরই বেশী। লোকহিতের মধ্যে কৃপা আছে, লৌকিক যোগ নেই। যোগ আসে নিজের গরজে। শক্তির সঙ্গে শক্তির লেনদেন হলেই কারবারটা সত্য হয়, যেমন হয়েছে বিদেশে বণিকে-শ্রমিকে। অবশ্য লৌকিক যোগের নানা উপায়ের মধ্যে একটি হল শিক্ষা—ডিগ্রী পাওয়ার শিক্ষা নয়, মনুষ্যত্বে দাবী পেশ করবার শিক্ষা, অতএব মাতৃভাষায় শিক্ষা। দেশাত্মবোধ তাই হল লৌকিক যোগস্থাপন, সমবেত আস্তিকতার সাধনা। মাত্র পরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সাধনা নয়। নিজের ঔদাসীন্য ও নৈষ্কর্ম্ম্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়াস। অর্থাৎ, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনই প্রথম, তার প্রক্রিয়াই হল স্বাধীনতার প্রথম যোগ।

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের সঙ্গে জাতীয়তা-বাদের (ন্যাশনলিজ্‌ম) পার্থক্য অনেক। তিনি দেশমাতাকে বন্দনা করেই চরিতার্থ নন, জনগণ-মনের জাগ্রত অবস্থাই তাঁর কাম্য। এই প্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠ সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। তার বিস্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। বিশ্বের সঙ্গে শক্তি-শালীর স্বেচ্ছাকৃত সম্বন্ধ স্থাপনই হল তাঁর স্বাধীনতার স্বভাব, অর্থাৎ পরিণতি। ভিক্ষাপাত্রের ঝুলি খদ্দরের হলেও তাঁর কাছে সম্মান পায় না; খদ্দরে আত্মসম্মান জ্ঞান এনেছে, ভয় ভেঙ্গেছে, মনের নাস্তিকতা দূর হয়েছে, তাই খদ্দরধারী তাঁর নমস্য। 'রবীন্দ্রনাথের কাছে ডোমিনিয়ন স্টেটাস কিংবা ওয়েস্টমিনিস্টার স্ট্যাটুটের কোনো অর্থ ই নেই।

ইংরেজের কাছে ভারতের ঋণ স্বীকার করতে তাই বলে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ইংরেজ শাসনকে কিংবা ইংলণ্ড-ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ অথবা তাঁর গূঢ় ইচ্ছার পূরণ হিসেবে তিনি অবশ্য ভাবেন না। ভারতে ইংরেজ এসেছিল য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে, তার মনুষ্যত্ব ও বিজ্ঞান-বোধ নিয়ে। য়ুরোপীয় সত্যসন্ধানের সততায় ও ন্যায়আদর্শের সর্ব্বভূমিনতায় ইংরেজী সভ্যতা হল বড়। তাই তার প্রভাব ভারতবর্ষের অন্য অতিথিদের প্রভাব অপেক্ষা ব্যাপক ও গ্রাহ্য। কিন্তু দেখা গেল ভারতে ইংরেজ শাসন, তার 'ল' ও অর্ডার' য়ুরোপীয় সভ্যতাকে খর্ব্ব করলে, যে মশাল আলো দিয়েছিল সে আগুনও জ্বালালে, বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের সামঞ্জস্যে বাধা দিলে। এই উদ্ধত, বর্ব্বর, লোভী, অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদকে 'বিনিপাত' বলে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিসম্পাত দেন তখন হিব্রু প্রফেটদের কথাই স্মরণ হয়। "যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহ গর্জ্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদকে শেষকড়া পর্য্যন্ত হারিয়ে দেউলে হোলো। তারপর আসুক কল্পান্ত।" সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তাঁর প্রধান আপত্তি মনুষ্যত্ব সম্পর্কে। যে-আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের প্রাণবস্তু হল জাতির সক্রিয় আত্মসম্মান তারও হন্তা এই সাম্রাজ্যপ্রসার।

কিন্তু জাতিরও দায়িত্ব প্রবল। প্রত্যেক সভ্যতার পরিণত দায়িত্ব সমগ্র

মানবের প্রতি। তার বিস্মরণ অমার্জ্জনীয়। সে-দায়িত্ব ভুলে, আজ যদি ভারতবর্ষ তালই ঠোকে, বুকই ফোলায় তবে নির্ম্মমভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দেন এই মিথ্যার আড়ম্বরটুকু। মহাত্মাজী তাঁকে Sentinel on the Watchtower বলেছেন। বর্ণনাটি নঙর্থক। সদর্থের দিক হল আন্তরিক সাধনার, আত্মশক্তি উদ্বোধনের, চিত্তশুদ্ধির আবশ্যিকতার উপদেশ, সমবেত প্রচেষ্টার সাহায্যে লৌকিক যোগসূত্র স্থাপনের বাণী। গজদন্তের চোরা কুটরী থেকে যে সাবধান আসে সেটা বিলাস মাত্র; জাতীয় উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন প্রাণবত্তা ও আত্মপরীক্ষা। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে তিনি এই কথাই বুঝিয়ে আসছেন যে অধিকার থেকে রক্ষিত হবার দুঃখভার ভারতবাসীর পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা নিজের হাতে চাপান, মুঠোয় ধরা আবেদন আর নিবেদনের থালার। বলা বাহুল্য, আজ যদি সত্যের এই পূর্ণতর আহ্বানে সে থালা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যায় তবে সে-ব্যগ্রতার মূলে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা নামাবার সময় যদি সে আত্মবিস্মৃত হয়, ক্ষণিক উন্মাদনায় সংযম, প্রত্যয়, প্রতিষ্ঠা হারায় তবে বাঙ্গালী হলেও সে তিরস্কার পায়। এবং পেয়েওছে।

পূর্ণতর আহ্বান; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সংস্কৃতি-প্রধান। সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের। সংস্কৃতির ছক্ ভারতবর্ষের, যার একটা বিশেষ রূপ তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। রূপটি বিশেষ, কিন্তু পৃথক নয়, অতএব পার্থক্যে গর্ব্বিত নয়। বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে জাতীয় প্রচেষ্টায় সার্ব্বজনীন কোনো বাণী না থাকলে তাতে দীনতাই প্রকাশ পায়। "আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা"—এই হল মহাসৃষ্টির ডাক, যেটি আমাদের মরমে না পৌছলে সঙ্কীর্ণতা ঘুচবে না, স্বাধীন হলেও ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তিই করবে। রাশিয়া ও চীন এ ডাক শুনেছে, জাপান এখন বধির। ভারতবর্ষ কি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনবে?

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভূমিকা

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্প যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথ, সার্থক উপন্যাসের সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের দৃঢ় সুপ্রশস্ত রাজপথ কাটিয়া দিয়া গিয়াছেন তিনিই। যে সূর্যালোক-দীপ্ত বাস্তব জীবন, যে সংঘাত-বিক্ষুব্ধ জীবন ও সমাজ প্রবাহ এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মায়াঘন বর্ণচ্ছটার যে বিচিত্র সমারোহ, যে গীতধর্মী কাব্যময় ভাব ও বর্ণনোচ্ছ্বাস এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণধর্মী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের উপজীব্য তাহার সমস্তই সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবনিষ্ঠা রোমান্সের রামধনুর রঙে রহস্য-মণ্ডিত অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অসাধারণ; বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস এই রহস্য ও অতি-প্রাকৃতের কল্পনায়, কাব্যের ঝঙ্কারে, সতেজ আদর্শবাদে এবং সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সমারোহে রোমান্সধর্মী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে য়ুরোপীয় এবং বাঙলা সাহিত্যেও ইহাই ছিল উপন্যাসের প্রকৃতি; সামাজিক প্রয়োজনেই, সামাজিক বিবর্তনের ফলেই এই প্রকৃতির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উত্তরাধিকার লইয়াই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-যাত্রার সূত্রপাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নহেন, দুই মানসও বিভিন্ন; রবীন্দ্রনাথের কাল বঙ্কিমচন্দ্রের কালও নয়; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমাজধর্মের চেতনাও এক নয়। এই বিভিন্নতার স্বরূপ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে; তাহাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধর্ম আবিষ্কার সহজ হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস যে-যুগের পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-যুগ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যানধারণাপুষ্ট ভারতীয় মানসের-প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশের যুগ। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাঙলার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে মানসিক আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তৃতীয় ও চতুর্থপাদে অনেকটা স্থিতিলাভ করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালী আপন সম্বিৎ অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং নবলব্ধ জ্ঞান ও

চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়া নিজের জাতির দিকে নূতন দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই দেশ তাহারই চিরপরিচিত আবেষ্টন তাহারই কাছে নূতন করিয়া ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, এবং নূতন বিধানে প্রথম আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এক কথায় তিনিই তদানীন্তন বিকাশোন্মুখ শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও সেই সমাজ-মানসের প্রতীক। এই সমাজ-মানস অত্যন্ত জটিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্নোয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করিয়াছিলেন বাঙলাদেশে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই তাহার অনিবার্য ফল ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের ফলে দেশের প্রাচীন বড়-বড় শান্ত পরিবারগুলি, ছোটবড় রাজবংশগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্তে একান্তভাবে ভূমিস্বত্বাধিকারী এবং চাকুরীজীবী ক্রমবর্দ্ধমান নানাবৃত্তিজীবী এক মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারা তখনও একটা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, তাহা তখনও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই ; সেই জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সমস্যা তখনও পরিষ্কার হইয়া দেখা দেয় নাই। আর আচণ্ডাল যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের জীবন প্রবাহ এত সরল, এত দীন ও রিক্ত যে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস অথবা তদানীন্তন মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের পরিধির মধ্যে তাহাদের কোনও স্থান ছিল না বলিলেই চলে, অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের জীবনধারার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের উপাদানের সন্ধান পান নাই, সজাগ চেষ্টাও হয়ত তাঁহার ছিল না। বাকী রহিল সদ্য বিলুপ্ত প্রাচীন সামন্ত সমাজ এবং এই সমাজেরই ধ্যানধারণায় ও ঐতিহ্যে পুষ্ট ভূমিস্বত্বাধিকারী নূতন জমিদার সমাজ। এই দুই সমাজই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপজীব্য ; মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানস দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই সমাজের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি প্রাচীন সামন্ত সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্মৃতি তখনও তপ্ত। তাহার নানা শৌর্য্য বীর্য্য নানা উদ্বেলিত বিক্ষোভ, নানা বিরোধী আদর্শের সংগ্রামের কাহিনী, গোষ্ঠীস্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল

অতীত তখন প্রথম নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে নানা ভবিষ্যৎ কল্পনায় নাচাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই নিকট অতীতের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে নূতন পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা-পুষ্ট মানস তাহার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই মধ্যে আত্মগৌরবের সন্ধান করিতেছে। অথচ এই অতীত নিকট অতীত হইলেও সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, ছায়াময়; এই ধরণের অস্পষ্ট অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই রোমান্টিক ভাব-কল্পনা মুক্তি পায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান আমলের অবসানের যুগ এক বিরাট শূন্যতার ও অরাজকতার যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই যুগের কথা ও কাহিনী লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে ঐতিহাসিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ, খণ্ডায়িত, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চস্তরের ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পজ্ঞাত বা অজ্ঞাত অতীত ছায়াময় হইতে বাধ্য এবং ছায়াময় বলিয়াই উপন্যাসে তাহা রোমান্সের সজীব ও বর্ণবহুল চিত্রণের এবং অতিপ্রাকৃতের অসাধরণতার মায়াস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। শুধু অপেক্ষা রাখে না, এই জাতীয় পরিবেশের মধ্যেই আদর্শবাদী কবিমানস রোমান্টিক ভাব-কল্পনার সাহায্যে নিজকে মুক্ত করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ করে। উপন্যাসে কাব্যের ঝঙ্কারও এই রোমান্টিক ভাব-কল্পনারই অন্যদিক। আর বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সতেজ আদর্শবাদের পরিচয় আছে তাহাও এই যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসেরই প্রকাশ। এই মানস কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল মিল্, বেন্থাম্, কোঁৎ, ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়িয়া, কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের দূর ও নিকট অতীতের নবলব্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া। এই দুই ভাবধারার সংঘাতের ফলে নূতন এক আদর্শমালা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে আশ্রয় করিতেছিল, এই আদর্শমালায় বলিষ্ঠ স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধই সর্বাপেক্ষা সজীব ও বর্ণময়। কিন্তু এই বোধ তখনও গোষ্ঠী ও ধর্মমহিমায় আচ্ছন্ন।

ভূমিস্বত্বাধিকারী নূতন অভিজাত শ্রেণীও বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকে সৃষ্টি প্রেরণা দিয়াছে; অন্ততঃ দুইটি উপন্যাসে তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু যেহেতু এই শ্রেণী-মানসের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর ইহাদের জীবন-

প্রবাহ বিচ্ছিন্ন ছায়াময় অতীতের কাহিনী নয়, স্পষ্ট জীবন্ত বর্তমান, সেই হেতু বঙ্কিমের এই ধরণের উপন্যাস অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, ইহাদের মধ্যে অতি-প্রাকৃতের অসাধারণত্বের স্পর্শ অনেকাংশে সংযত, এবং আদর্শবাদী কবিমানসও বাস্তবনিষ্ঠা দ্বারা নিয়মিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতন যুক্তিবাদী; তদানীন্তন বাঙালীর রহস্যধর্মী মানসে যুক্তি-ধর্মের স্পর্শও লাগিয়াছে। সেই হেতু কার্যকারণধর্মী ঘটনা এবং মনো-বিশ্লেষণও বঙ্কিম-মানসের অন্যতম ধর্ম। এই বিশ্লেষণ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যথেষ্ট দীর্ঘায়ত নয়, ঘটনা ও মনোবিকাশের স্তরগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতায় বিকশিত হইয়া উঠে নাই, আবার সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর কিছু না হউক পাঠকের মনে বাস্তবতার অনুভূতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয় তো ছিলেন না কারণ বাস্তবনিষ্ঠাপেক্ষা রোমান্সনিষ্ঠা ছিল তাঁহার প্রবলতর।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়; রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩২ বৎসর। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "বৌ-ঠাকুরাণীর-হাট" ১২৮৮-৮৯, এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "রাজর্ষি" ১২৯২ সালে রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রথম সার্থক উপন্যাস "চোখের বালি" রচিত হয় ইহার দশ বৎসর পর ১৩০৮ সালে এবং এই সময় হইতে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যেই সমাজ-মানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় উপন্যাসে অথবা ছোটগল্পে যতটা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব, কাব্যে, বিশেষভাবে গীতিকায় তাহা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অধিকাংশই অত্যন্ত গীতধর্মী হওয়ার ফলে সেখানেও এই পরিচয় গীতিকাব্যের মতই অত্যন্ত অপরোক্ষ।

যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাঙলা দেশে যে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষাশেষি বিংশ শতকের গোড়ায় বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পুরাপুরি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ বিশিষ্ট রেখা ধরিয়া সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার ধ্যান ধারণা ও আদর্শ, তাহার অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব, তাহার জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই এই পঞ্চাশ বৎসরে অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে, তাহার জীবন-প্রবাহ একটি বিশিষ্ট

ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং বেগবান তরঙ্গ মুখর সেই ধারাটি অন্যান্য শ্রেণীর বা সমাজ অংশের জীবনধারাকে ছাপাইয়া যাইতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসই প্রগতিশীল এবং সমাজের সকল প্রকার কর্মে ও প্রতিষ্ঠানে ইহাদেরই আধিপত্য ; এই শ্রেণীই সামাজিক আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার নিয়ন্তা। বঙ্কিমের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ভূমি-স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজের প্রতিষ্ঠা তখনও অক্ষুন্ন আছে, কিন্তু যে হেতু তাহাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ভূমি ও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থা অটুট রাখার উপর সেই হেতু তাহাদের মনোভাব ও আদর্শ রক্ষণশীল, প্রগতিবিরোধী। এই সমাজ শ্রেণীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যানধারণা হইতে নিজেদের অনেকাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন, স্বল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয়, যে কয়েকটি পরিবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আদর্শ ও ধ্যান ধারণার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহারা অভিজাত সমাজের লোক হইলেও তাহাদের মানস মধ্যবিত্ত সমাজাদর্শেই গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই অভিজাত সমাজ-মানসের মধ্যে একদিকে যেমন প্রবল ছিল পৌরাণিক হিন্দু-সংস্কৃতির নাগরিক ও গ্রাম্য প্রকাশের ধারা, অন্যদিকে তেমনই ছিল সুদূর দিল্লী—আগ্রা—লক্ষ্ণৌ—পাটনার নিম্নস্তরের ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতির ধারা, অবশ্য শেষোক্ত ধারা জীবনের দেউড়ি পার হইয়া অন্দরমহলে ততটা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ প্রাচীন সামন্ত সমাজের স্মৃতি এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরে একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই স্মৃতি বঙ্কিমের কালে বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কালে সেই স্মৃতির সেই জোর আর ছিল না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কালের চেহারার তফাৎ সংক্ষেপে এইটুকু।

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শীলে ও শালীনতায় তদানীন্তন বাঙলাদেশের অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির অন্যতম ; হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির দুইধারার শ্রেষ্ঠ সঙ্গমস্থল। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে এই অভিজাত পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত হইয়াও তাঁহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস হইতে। প্রিয়নাথ সেন,

লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশ চন্দ্র রায়, মোহিত চন্দ্র সেন, অজিত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পর্য্যন্ত তাঁহার সকল বন্ধু সুহৃৎ সহকর্মী সকলই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অভিজাত মানস আশ্রিত, পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত। এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ, দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ, কোলাহল, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য।

উপরোক্ত সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে ধর্ম্ম ও প্রকৃতির বিভিন্নতার সৃষ্টি। প্রাচীন সামন্ত সমাজের ছায়াময়ী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক সমারোহ এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বিদায় লইল। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের বাস্তব-অভিজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার অস্পষ্ট খণ্ডতা প্রকট হইয়া উঠিল, বিকৃতি উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল, জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্রোতে ঐতিহাসিক সমারোহ ভাসিয়া গেল, পড়িয়া রহিল প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, দৈন্য ও রিক্ততা, তাহার উদ্বেলিত বিক্ষোভ ও আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইল বঙ্কিমের রোমান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, অতিপ্রাকৃতের অসাধারণত্বের মায়াময় স্পর্শ। প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনে অসাধারণতার অতিপ্রাকৃতের স্পর্শের কোনও অবকাশ নাই। বঙ্কিমের রোমান্স ছিল বাহ্য-বৈচিত্র্য ও আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সংঘটন-নির্ভর; মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের প্রকাশে ইহাদের আর কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না। রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক, কিন্তু তাঁহার রোমান্স আশ্রয় করিয়াছে প্রকৃতির সহিত মানবমনের গভীর আত্মীয়তাকে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যলোককে, মানবমনের সূক্ষ্ম সমাহিত ভাবলোককে। এই রোমান্স একান্তই অন্তর্মুখী, এই প্রকৃতির রোমান্স বাহিরের ঘটনাবৈচিত্র্য অথবা আকস্মিক অসাধারণত্বের কোনও অপেক্ষা রাখে না। এই রোমান্সই

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোট গল্পগুলিকে গীতধর্ম্মী করিয়াছে, এবং এই রোমান্সই রবীন্দ্র-উপন্যাসে কাব্যের ঝঙ্কার ও সুষমা দান করিয়াছে।

আমি আগে বলিয়াছি, সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবানুভূতি যে সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, বঙ্কিমের উপন্যাসে সেই দীর্ঘায়ত তথ্য ও মনোবিশ্লেষণ নাই। কেন নাই, সংক্ষেপে তাহার হেতুও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের ভিড়ের মধ্যে, বর্ণ-বহুল তথ্য ও চরিত্রের সমারোহের মধ্যে, তাহার অবসরই বা কোথায়? সামাজিক উপন্যাসেও যেখানে জীবন-সমালোচনা কল্পনার রঙে রঞ্জিত এবং মহৎ আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত সেখানেও এই বিস্তৃত বিশ্লেষণের অবসর অল্প। যে মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য সেই মধ্যবিত্ত সমাজ ঘটনাবহুল নয়, তথ্যসমৃদ্ধ, নয়; তাহার জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ধীর ও মন্থর, সাধারণ ঘটনা স্বাভাবিক কারণে সংঘটিত হওয়াই এই সমাজের সাধারণ নিয়ম, ঘাত প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ গ্লানি বিরোধ যাহা কিছু এই জীবনে দেখা দেয়, তাহাও স্বাভাবিক কারণেই, সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধী আদর্শের সংঘর্ষের ফলে। মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবাহের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে সূক্ষ্ম সুবিস্তৃত সুনিপুণ বিশ্লেষণ লাভ করিয়াছে। এই জীবনের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ দ্বন্দ্ব সমস্যা গ্লানি বিরোধ কলহ আনন্দ ঘাত প্রতিঘাত সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তৃত করিয়া কার্যকারণ-পরম্পরা এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহার ফলে পাঠকের মনে বাস্তবানুভূতি দৃঢ় ও প্রবলভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং সমাজের বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম্প্রবাহ, বিচিত্র ধারণা ও আদর্শ, এক কথায় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে চেতনা জন্মায়। এই হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বঙ্কিম-উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর বাস্তবধর্ম্মী, রবীন্দ্রোপন্যাসে বাস্তবানুভূতি প্রবল। তাঁহার পরবর্ত্তী পর্যায়ের ছোটগল্পে এবং "চোখের বালি" হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উপন্যাসেই এই বাস্তবনিষ্ঠা মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি, দ্বন্দ্ব সমস্যাগুলিকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সম্বন্ধে চেতনাই সামাজিক চেতনা। এই গভীরতর বাস্তব-

তাই রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যের প্রধান হেতু। এই গভীরতর বাস্তবতাই পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়া নূতন ভাবে বিচিত্র উপায়ে সত্য ও বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করিতেছে।

সাধারণভাবে এই সামাজিক পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিলে এবং রবীন্দ্রোপন্যাসের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি উপরের কথা কয়টি স্মরণে রাখিলে উপন্যাসগুলির পাঠ অনেকটা সহজ এবং রসবোধের অনেকটা সহায়তা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

যামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথম জানতে হবে আধুনিক ইয়োরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী।

একজন ইয়োরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী একবার তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই মূর্ত্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়ত ভেঙেচুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপের শিল্পীরা রিয়ালিজম্-এ ক্লান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নূতন একটা পথ। তাঁরা দেখছেন শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের উপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফোটোগ্রাফিক্ ফাইডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে কোনো গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবিতে যখন দেখি একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে, বুঝি যে ওটা ঘোড়াই: কিন্তু এই ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মত নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগুতে লাগল তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজম্এর দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ, আর তাতে প্রত্যহই বাড়াতে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একই ভাবে নগ্ন ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন; নিখুঁত করার চেষ্টা, পালিস করার চেষ্টা, এদিকেই পড়ল নজর। পালিশ হল, কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। গঠন বা গড়নটা গেল হারিয়ে। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান সুরু করেছেন এই রিয়ালিজম্এর বিরুদ্ধে। পালিস ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও, এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তা হলে কি আজকের শিল্পের কোনো তফাৎ নেই? আছে নিশ্চয়ই, কারণ শিল্পের এই হলো ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা

শিক্ষামূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছে তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে প'ড়ে কোনো মূর্ত্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক-সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য্য প্রয়োজন শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজম্‌এর ভ্রান্ত মোহে ঘুরেছে ততদিন ধ'রে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল: যেমন, ড্রয়িং, রং বা সামঞ্জস্যের দিক। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অবচেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইয়োরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকেই ভাঙা: পিকাসো, মাতিস, সকলেরই—হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে ত প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারেই পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প ইতিহাসের মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্য্যই হয়, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এ দিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রং-এর কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই: অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই ব'লে কল্পনার প্রাবল্য সব সময় সমান সজাগ থাকে না, এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়ত তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর "খাপছাড়া"র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারে নি।

তা ছাড়া রিয়ালিজম্‌এর এই যে ছোঁয়াচ তা কি আধুনিক ইয়োরোপীয়ন্ শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমার ত মনে হয় আজও তা পারে নি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্‌এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন "এঁদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা আর এঁরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙে চুরে। নতুনত্ব কোথায় তা হলে?" কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিস্টিক চিত্রকলায় ও অতি-আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় দৃষ্টির কোনো তফাৎ নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পীর দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজম্‌এর ছোঁয়া এ ভাবে আর কেউ কাটাতে পারে নি। পুরাণের একটা ভাবচ্ছবি ধরুন না—জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখির কোনো সম্পর্কই নেই, এর জন্মইতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ এসে পড়ে নি। কিন্তু জটায়ু ব'লে একেবারেই চিন্‌তে পারেন না কি? পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ হল চিন্তারাজ্যের পাখি, রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ একেবারে নেই। আমার ত মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস আজ শিল্প এই রকমই কোনো পৌরাণিক জগত সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরণের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনো ছবিতে অ্যানাটমি-বোধ যদি সত্যই থাকে তা হলে শুধু এই ধরণের ছবিতেই আছে।

কারণ, ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশী আর কী? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি এই সতেজ ভাব সবচেয়ে বেশী বর্ত্তমান নয়? রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনি নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোড়েই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দু'শ বছর ধ'রে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে-অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান: ছবির জন্যে খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কী বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভাল। ধরুণ দু'জন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে—অর্থাৎ দুজনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া ক'রে নিয়ে, কল্পনার প্রসার সেখানে নেই। আর-একজন মেয়েটিকে আঁকছেন, তাও না দেখেই, কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডীর ভিতরে টেনে আনার কোনো চেষ্টাই নেই। কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। পোর্ট্রেট দেখে-দেখে আঁকা হয়, তাই বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নিচে বসেছিলেন, কোন দিক থেকে আলো পড়েছিলো, ইত্যাদি। দেখে দেখে যখন মানুষ আঁকি তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি, আর কিছু দেখি না, আবার দেহের নিম্নাংশ আঁকবার সময় মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশই দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে একভাবে দেখি, একশো ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আর-একভাবে, দুশো ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি। কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চ'লে যায়, তখনো কি তাকে দেখি না? তখনো তাকে দেখি, দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই

ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনো পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা তার নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন, আমার ত আর আর্টস্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়ত সম্পূর্ণই হয় না। আমি বল্লুম, এগার বছর স্কুলে পড়েও ত দেখি ছেলে অনেক সময়ই মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনোদিন স্কুলের কাছ ঘেঁষে নি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বৈশিষ্ট্য আপনারও হয়েছে তাই। *

† 'চিত্রলিপি' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৪॥০ ও ১০৲

* শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিলিখিত

ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ

প্রমথনাথ বিশী

বহুকাল আগে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের এক বালক শান্তিনিকেতনে পড়িতে গিয়াছিল।

শান্তিনিকেতন তখন ক্ষুদ্র পল্লী। শান্তিনিকেতন ও তার প্রতিষ্ঠাতা তখনো ঠিক খ্যাতি লাভ করেন নাই।

সেই বালক দেখিতে পাইত, এক দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ শালবীথিকার ডোরাকাটা ছায়াবাসে সকাল সন্ধ্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সবাই তাঁকে গুরুদেব বলিত; দেখা হইলেই সকলে প্রণাম করিত। এমন উজ্জ্বল প্রতিভাময়, অলৌকিক মূর্ত্তি সে আগে কখনো দেখে নাই; রামায়ণ মহাভারতে এমন পুরুষের কথা আছে বটে, কিন্তু সংসারে অসম্ভব বলিয়াই তার ধারণা ছিল।

তারপরে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, শান্তিনিকেতন বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে, আর সেই বালক বয়সের ধাপে ধাপে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনের বিস্ময় তার আজো কাটে নাই নাই—বোধ হয় কোনও দিন কাটিবে না।

ত্রিশ বছরের বেশি সে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছে; সকালে সন্ধ্যায় রাত্রে; সভাস্থলে, একাকী; বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাহিরে; নীরব, মুখর, বিশ্রব্ধ, রচনারত, সংলাপী, পাঠরত, গীতিরত, পরিহাসপ্রিয়, চিন্তাকুশলী; কখনো তাঁকে পুরাতন মনে হয় নাই, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন পরিচয়ের আভাস ঝলক দিয়া উঠিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন কখনো পুরাতন মনে হয় না, এই কবিকিরীটিকেও কখনো পুরাতন বলিয়া মনে হইল না; হাজার মনের রবীন্দ্রনাথ, হাজার ভাবের রবীন্দ্রনাথ, হাজার রূপের রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের রৌদ্র-ভাস্বর ইতিহাসে এমন আর একটি নাম তো মনে পড়ে না, এমন আর একটি কবির পরিচয় তো পাই না। হয়তো কালিদাস আছেন, কিন্তু কালিদাসের জীবনী নাই, তাঁর জীবনী লিখিত হয় নাই।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথেরও জীবনী কখনো লিখিত হইবে না। কালিদাসের জীবনী নাই, কিন্তু তাঁর বিষয়ে কিম্বদন্তী আছে; রবীন্দ্রনাথের সত্তাকেও কেন্দ্র করিয়া কিম্বদন্তী গড়িয়া উঠিবে। অত বড় বিরাট পুরুষের জীবনকে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে এমন ব্যাসদেব কয়জন আছে? কাজেই আধুনিক ধরণের জীবনীর বদলে, কিম্বদন্তী, রূপকথা, উপকথা, কবিপ্রসিদ্ধি মিলিয়া রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের অমর অশোক-স্তম্ভ গরিয়া উঠিবে, যেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, হারুণ-অল-রসিদের কথা, ব্রহ্মদত্ত রাজার কথা, বিক্রমাদিত্যের কথা, কালিদাসের কথা; সেই অনতিদীর্ঘ অবদান মালায় আর একটি আখ্যান যুক্ত হইবে, রবীন্দ্রনাথের কথা; ইহাই প্রাচ্য দেশের জীবনী লিখিবার শিল্প।

এই লোভক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের তলে আড়াই হাজার বছর পরে আজকার দিনের কোনো চিহ্ন যখন অবিষ্কৃত হইবে, তার বহু আগেই রবীন্দ্র-কিম্বদন্তী ভারতবর্ষে শিকড় সংস্থাপন করিয়াছে।

সেদিন অজ্ঞাতনাম অগঠিত নগরের বাড়িতে বসিয়া 'রবীন্দ্রকথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধের' দল শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিবে; সেদিন অজ্ঞাত ভাষার অজাত কবির দল মুগ্ধা কিশোরীর চিত্তজয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে ভাব চুরি করিয়া গান বাঁধিবে; সেদিন আষাঢ়ের প্রথম মেঘোদয়ে কাব্য-রসিকের দল মেঘদূত হইতে একছত্র আর রবীন্দ্রনাথ হইতে একছত্র আবৃত্তি করিবে; আর সেদিনের পণ্ডিতের দল (হায়, পণ্ডিতদের অবস্থা সবসময়েই একরকম!) কালিদাসের মেঘদূত আগে না রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত আগে লইয়া বিতণ্ডা করিবে।

গবেষকের দল বলিবে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি যখন বাংলা দেশের লোক, কাজেই কালিদাসও বাংলাদেশের অধিবাসী; আর একজন বলিবে সে কি কথা, রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাদেশের লোক তার কি প্রমাণ আছে? আর এই বিতর্কের মধ্যস্থ নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করিয়া দিবে, রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ওটা রূপকমাত্র—রবীন্দ্রনাথ মানে সূর্যদেব, তৎকালীন বাঙালীরা রবির উপাসক ছিল! মধ্যস্থের কথাই ঠিক—বাঙালীরা রবির উপাসক বই কি!

পণ্ডিতদের মুখ থামানো কঠিন। তারা তর্ক ধরিবে একজন কবির পক্ষে

কি প্রায় তিনশো বই লেখা সম্ভব! কাজেই রবীন্দ্রনাথ নামে একাধিক কবি ছিলেন! একজনের বাড়ী শিলাইদহে, যেখানে একখানা নৌকার জীর্ণ খোল পাওয়া গিয়াছে, খুব সম্ভব ওখানা ছিল সোনার তরীর আদর্শ! আর একজন বলিবে তাঁর বাড়ী ছিল বীরভূমে, কারণ সেখানে ভূগর্ভে শ্যামলী, পুনশ্চ নামে কুটিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে; ওই নামে কবির দু'খানা কাব্যগ্রন্থও যে আছে! ইতিমধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়া পরিস্থিতি আরো জটিল হইয়া উঠিবে—এ ব্যক্তি আবার কে? এ তিন কি এক ব্যক্তি? কি করিয়া সম্ভব? ইহাদের রচনা রীতিতে কত প্রভেদ! তিন জনে কি সমসাময়িক? ইহাদের মধ্যে কি করিয়া আলাপ পরিচয় সম্ভব? সে যুগে তো মেল টেলিগ্রাফ ছিল না, শিয়ালদহ হইতে বীরভূম যে বহুদূরের পথ!

শান্তিনিকেতনের প্রাচীন চিহ্ন দেখিতে দেশ বিদেশের ভক্তরা আসিবে; উজ্জয়িনী দেখিয়া শান্তিনিকেতন দেখিবে, শিপ্রা দেখিয়া কোপাই দেখিবে; মেঘদূত আবৃত্তি করিয়া মহাকালের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে, স্বর্গ হইতে বিদায় আবৃত্তি করিয়া উত্তরায়ণ প্রদক্ষিণ করিবে। শঙ্কর যেমন ভারতবর্ষের মানচিত্রের চার কোণে চার মঠ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, বিধাতাপুরুষ তেমনি ভারতবর্ষের মানস চিত্রের চার কোণে চার বিরাট কবি-প্রতিভার দেউল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ!

সেদিনকার শিশুর দল ঘুমের আগে পিতামহীকে ফরমাস করিবে—সেই গল্প বল, সেই যে কবির—

পিতামহী শুধাইবে—কে? কালিদাস?

শিশুরা বলিবে,—না, সেই যে আর একজন—পিতামহী হাসিয়া আরম্ভ করিবে—তবে শোন, বহুকাল আগে দেবতারা যখন পৃথিবীতে যাওয়া আসা করতেন, মানুষে যখন পুষ্পক রথে আকাশে ঘুরে বেড়াতো, আজকার মত রেল টেলিগ্রাফ যখন সৃষ্টি হয়নি, সেই সময়ে এই দেশে রবীন্দ্রনাথ বলে' এক মহাপুরুষও ছিল। ছেলেবেলায় সে ছিল খুব দুষ্টু; যেমন দুষ্ট তেমনি লেখাপড়ায় ছিল না মন; বাড়ীর সবাই তার আশা ভরসা দিল ছেড়ে; সে আপন মনে বনে বনে গান গেয়ে বেড়াতো। তার সঙ্গীরা সবাই মস্ত মস্ত

আষাঢ়, ১৩৪৮

পণ্ডিত হ'য়ে গেল রাজসভায় চাকরি পেলো; সবাই তাকে ঠাট্টা করতো! সে ভাবতো, কি ভাবতো জানিস্!

"আমি নাইবা গেলাম বিলাত
নাইবা পেলাম রাজার খিলাৎ
যদি পরজন্মে পাইয়ে হ'তে
ব্রজের রাখাল বালক।"

কিন্তু তার একটা সখ ছিল! সে ভাবতো আমার এমন সুন্দর গলা, যদি একটা বীণা পাই তবে বেশ হয়। কিন্তু পাবে কোথায়?

একদিন এক ঝরণার ধারে বসে' দুঃখ করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন এদেশে খুব শীত ছিল কিনা! ঝরণা ছিল জমে'। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখে তার কোলের উপরে এক সুন্দর হাজার-তার বীণা পড়ে আছে। তখন তার মনে পড়ল এইমাত্র স্বপ্নে যাঁকে দেখ্‌ল, তাঁর হাতে তো ছিল এই বীণা। সেই বীণাপাণি তো তাকে স্বপ্নে বলে গেলেন—ছত্রগুলি তার বেশ মনে আছে—

"আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে' যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।

* *

যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথায় তোর নাম র'বে
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।

* *

মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।"

ওদিকে সে দেখে যে সরস্বতীর আবির্ভাবে ঝরণাও ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, কি কলকল তার শব্দ! তখন সে সেই ঝরণার কল্লোলে মিলিয়ে সেই বীণা বাজালো—সেই দিন থেকে হ'ল সে মস্ত কবি।

শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

মুগ্ধ কবি কিশোর নির্জ্জন বকুল কুঞ্জের জ্যোৎস্নাতে মনের ভুলে নিজের রচিত গান গাহিয়া বসিবে; উল্টা ফল ফলিবে, মুগ্ধ কিশোরী ধরা দিতে চায় না; হঠাৎ কবির ভুল ভাঙিবে, অমনি সে বহু কণ্ঠে শেখা গান গাহিয়া উঠিবে—

"ফাগুনের পূর্ণিমা এলো কার লিপি হাতে ?
বাণী তার বুঝি না যে ভরে মন বেদনাতে !"

হাতে হাতে ঈপ্সিত ফল ফলিবে।

আর আজি হ'তে শত শত বর্ষ পরের কবি বহু প্রণয়িণীর মধ্যেও নিজের দোসরকে না পাইয়া জীবনের অপরাহ্নে একদিন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ঝোঁকে আবৃত্তি করিয়া উঠিবে—

"আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে-নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।...
কোথা তুমি, শেষ বার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে ?
মহা নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে' রয়েছো রমণী,
নীরব নিশীথে ?

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি

অমিয় চক্রবর্ত্তী

(১)

রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন,

"সাম্‌নে কী আছে জানিনা। যে-পথ দিয়ে এসেচি তার দিকে ফিরে চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে। বাঁকে বাঁকে এল অভাবনীয় মুহূর্ত্ত, কত পালা বদল, পরিবেষ্টনের ইতিহাস।

শুধু নিজের চৈতন্যের আনন্দ নয়, যে-বহির্ভূমিকার মধ্য দিয়ে এসেচি তার ছবি আমাকে নিবিড় আনন্দ দেয়। জীবনের স্মরণীয়তা মনে ভিড় করেচে। সেই গাঁয়ের মাঠ, তীরে তীরে লোকালয়, হাট বসেচে, মেয়েরা জল নিয়ে চলেচে, কল্লোলিত জীবন যা নিয়ে লিখেচি আমার ছোটো গল্প। সেই ভরা দুপুরের আলো, বসন্তের গুঞ্জরিত প্রহর, কখনো মেঘ ক'রে এল, আনাগোনার অশ্রুত সুর যা নিয়ে গেঁথেচি আমার গান। তারই মধ্যে জাতীয় জীবনের অধ্যবসায়, রাষ্ট্র এবং শিক্ষার কাজ—সমাজের প্রসঙ্গে কত ভেবেচি, কত লিখেচি। শান্তিনিকেতনের কোণায় এলাম, নিরাভরণ উৎসব জমে উঠ্‌ল, নানাজাতির মানুষকে নিয়ে মেল্‌বার পালা।

সমস্তের ভিতর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় খুঁজেচি—কোথায় থাকবে তার চিহ্ন।

হয়তো আমার লেখায় কিছু থেকে যাবে কিন্তু সংসারে অবিনশ্বরতার দাবি টেঁকেনা। এখন আমার ভাবতেও ক্লান্তি বোধ হয়। লেখ্‌বার সময় গেছে। মনের মধ্যে ছবি দেখি। তোমাকে বল্‌তে পারি না আজ আমি কোন্ দৃষ্টিলোকে উত্তীর্ণ হয়েচি।"

শান্তিনিকেতনে চৈত্রের আকাশ প্রজ্জ্বলিত; আশ্রমের খানিকটা সবুজ জটলাকে ঘিরে রয়েচে দৈগন্তিক মরীচিকা। রবীন্দ্রনাথ যা বল্‌লেন তার সঙ্গে বর্ষশেষের আকাশজোড়া দৃষ্টির মিল রয়েচে। এবং কেন্দ্রের শ্যামল সৃজনতাকে মিলিয়েই তার সঙ্গতি।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

(২)

কাঁকরের খোয়াইয়ের বুকে পঞ্চবটী বেঁচে থাকবে; শুকনো মাঠ জয় ক'রেই ছায়াতরুময় বিদ্যার আয়তন রচিত হল।

আজকের অতি ধূসর পৃথিবীতে যে-দৃষ্টির বলে বিশ্বভারতী গড়া হয়েচে তার রহস্য ভেদ করতে মানুষের সময় লাগ্‌বে।

ধুলোর তলে ভূমিকা আছে যেখানে শিকড় পৌঁছন দরকার। সেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আশ্রয়—যা সর্ব্বমানবিক; তারই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি উঠে আসে উজ্জ্বল হাওয়ায়। প্রতীকী পত্রপল্লব বেঁচে থাকে দুয়ের যোগে। দর্শনতত্ত্বে যাব না, কিন্তু মাঠের কাব্য পড়তে গিয়ে এই সব কথা মনে হচ্ছিল।

বারে-বারে আসি যাই, এইটুকু বুঝতে পারি এখানে প্রাণের সংসর্গ বেড়ে চলেচে। বেশি কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিনি: হয়তো কোনো গাছের গুঁড়ি বাঁধানো হল, পাশে কেউ এঁকে দিয়েচে শঙ্খচক্রের আলপনা; চৈনিক ছাত্র ত্রিপিটক পড়চে; মেয়েদের টেনিস্ খেলার ঐ নূতন জায়গা; চায়ের বৈঠকে মাটিতে বা মোড়ায় ব'সে নানাদেশীয়ের আলাপ চল্‌চে। সমবায় দোকানের পাশে ল্যাবরেটরির ঘর তৈরি হল। এক গাড়ি কাঁকর ঢালা হয়েচে শ্যামলীর সাম্‌নে, তার সঙ্গে খুব মানিয়েচে কাঁটা-অলা শিমুল গাছটার আগুনে ফুল। সোনাঝুরি গাছ হঠাৎ অত্যন্ত হল্‌দে হয়ে ওঠে; নিম ফুল, নেবু ফুল, মাধবী ঋতুচক্রে ঘুরচে। চল্‌চে, বদ্‌লাচ্চে। বিদ্যাভবনে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যস্ততা, শিল্প বিভাগে গান, নাচ, ছবি। মাইলখানেক দূরে কারখানা, কৃষি; চরখা,—আরেকটি কর্ম্মকাণ্ড। কিন্তু শাখাপ্রশাখা সংলগ্ন হয়েচে যে-আশ্রমে তার সন্ধান পাই বিশেষ কবির দৃষ্টিলোকে।

আমার কাছে সব চেয়ে শাশ্বত লাগে এই সব হঠাৎ-হওয়া প্রাণের যোগাযোগ, কেমন ক'রে এই মাঠের মধ্যে সঞ্জাত হল। বিদ্বজ্জনের সমাগম, বর্ষা-বাসন্তী উৎসব, মাটির ঘরে বিজ্‌লি বাতি, ভারতীয় নানাপ্রদেশের ছেলেমেয়ের সাহিত্য-সভা—একটি অদৃশ্য পরিধির মধ্যে নানাস্রোত এসে মিল্‌চে।

কণায় কণায় ধারা শুকিয়ে যাবে, অনেকখানি দূর পর্য্যন্ত তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারি না। ভারতবর্ষ কোন্ দিকে চলেচে? বাংলার বিরল কুঞ্জে

আতিথ্যের এই প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে না? যা বাংলার প্রতিভায় সমন্বিত হয়েচে তাকে হারাবার দায়িত্ব আমরা সহজে নেব বলে মনে হয় না— প্রাদেশিক স্বল্পতাকেও আমরা মান্‌তে শিখ্‌চি।

যা হয়েচে তা অপ্রমাণিত হবে কেমন ক'রে। উৎকর্ষ-কেন্দ্রের একটি সফল রূপ মানুষের ভাবনায় থেকে যাবেই।

অথচ শান্তিনিকেতনের কাজে একটি অপরিপূর্ণতার চেহারা আছে যা চোখে তৃপ্তি দেয়। অর্থাৎ শেষ হয়ে ফুরিয়ে যায় নি। কোথাও একটু গড়বার জায়গা আছে আমাদের। কিছু না হোক্ ছুটিতে এসে গাছতলায় বই পড়ব, তালতড়ির রাস্তায় কুটীর বাঁধ্‌ব যদি সাধ্যে কুলোয়। এখানকার হাওয়ায় মিশে আছে গান, রবীন্দ্রনাথের গান। দশজনকে যদি বলি জায়গাটা ভালো লাগে তাতেও মন খুসি হবে। সৃষ্টির মানস এইভাবে পূর্ণ হতে থাকে।

(৩)

রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টির রূপ দেখতে পাই তারই কথা বলছিলাম। ভাষায় এবং অন্যবিধ শিল্পে তিনি পৃথিবীকে যে-দৃষ্টিদান ক'রে গেলেন তার পরিচয় এখানে দেবার চেষ্টা করব না।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন কথার শেষে বলছিলেন—

"কী থাকবে তার ভাবনা আমার গেছে। উপনিষদে বলেচেন—কৃতং স্মর। অন্তরের দিক থেকেই বলেচেন।"

আমাদের দিক থেকে মনে হয় তাঁর শিল্পরূপ, যার মধ্যে নিঃশ্বসিত হচ্চে যুগান্তরের বেদনা, বসন্তবিকল্পিত কাহিনী এবং কত আগামী বৎসরের পর্য্যাপ্ত ফল—তার পরিচয় যদি কবির অন্তরের বহিপ্রকাশও হয় কৃতকর্ম্মের অমরত্ব রয়েচে তাতে। সংসারের এত ধ্বনি এবং ছন্দ যে কারুলোকে বিধৃত হল তার ক্ষমতা বিশ্বলোকালয়ের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে। ইতিহাসে দেখেচি বাক্যের অক্ষয়তা—যে-বাক্য প্রতিভার উচ্চারিত। হন্তারক রাষ্ট্রবীরের গর্জ্জন মিলিয়েচে প্রাচীন ইটালীর পাতালে, সহমরণের ভিড় আজো কমেনি নূতন প্রতাপাদিত্যের পাড়ায়: দান্তের বিয়াত্রিচে কাব্যের অক্ষরে ভাস্বরা, স্বর্গলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গীয় পুলিশ পুরোহিত

জমিদারের দল যখন পাথুরে সংসারের গুঁড়োয় উড়ে যাবে, ক্ষণজীবী উগ্রতার অতীত খাঁটি বাংলার প্রাণ মরবে না। তখনো কবির কণ্ঠস্বর শুন্‌বে পদ্মাতীরের মানুষ, গানের দূরদৃশ্যমান আকাশবেষ্টনীতে—সেই কবির যিনি আজ সায়াহ্নজ্যোতির অক্ষরে কবিতা লিখচেন। শ্যামল প্রান্তরে সংশ্রিত হয়ে থাকৃল প্রতিদিনের অপূর্ব্বতা যা ব্যক্ত হচ্চে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়।

(৪)

বাস্তব কাকে বলে জানি না, সত্যকে দেখবার তেজ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুধাশক্তির যোগে আজীবন প্রকাশিত হয়েচে।

আজ নববর্ষে তিনি মানুষের দিকে তাকিয়ে বলচেন, "সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ" কল্পনা করতে পারেন নি; এই বিকারের ভিতর দিয়ে "বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি···অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য" প্রকাশিত। পররাষ্ট্রের নির্লজ্জ লোভ একদা যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে সেখানে মারীর আসন্নতা তৈরি হল। প্রাচীন আচারকে জড়িয়ে মুক্তি পাব না। তিনি স্পষ্ট দেখ্‌চেন "ভারতবর্ষের ···নিদারুণ দারিদ্র্য·· অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য মানুষের শরীর মনের যা কিছু অত্যাবশ্যক তার·····নিরতিশয় অভাব।"

আশি বৎসরের ধ্যানে মানুষের দুঃখকে তিনি ভোলেন নি, মানুষকে বিশ্বাস করেন বলেই তার ভ্রষ্টতা তাঁকে বিঁধচে। হন্তেনীতিকে আর্থিক বা পারমার্থিক অঞ্জলি দেন নি—যে-পক্ষেরই হোক্—কেননা পাপের প্রসারে মানুষের ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভয়হীন, কেননা তা কারুণিক এবং দলীয় স্বার্থের বিরোধী।

জীবনের প্রথম প্রকাশিত বইয়ে এই সংবেদনশীল সত্যদর্শিতার সাহস নিয়ে তিনি অবতীর্ণ। "কবিকাহিনী" বেরিয়েছিল তেষট্টি বছর আগে।

> "যা দেখিছ', যা' দেখেছ, তাতে কি এখনো
> সর্ব্বাঙ্গ তোমার, গিরি, উঠেনি শিহরি?
> কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
> রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধ কারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে।

অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলঙ্কাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়।"

কিশোরকল্পনাকুঞ্জে আর্টিস্টের সহজ অধিকার, কিন্তু যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্ট ছিলেন কল্পনায়, অর্থাৎ সত্যের যা রুক্ষ তাকে কোনো দিন বাদ দিয়েচেন কাব্যদর্শনে, তাঁরা বাস্তববাদী হতে পারেন কিন্তু ভ্রান্ত।

"কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার!"

ষোলো এবং আশি বৎসরের আশ্চর্য্য মিল দ্রষ্টব্য—বাহিরের যে-অবস্থার বর্ণনা রয়েচে তারও বিশেষ বদল হয়নি।

পশ্চিম সভ্যতার বৃহৎ দানকে মান্‌বার শক্তি যাঁর আছে তাঁরই পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব। এখানে আজকের এবং বালক রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ নেই। তখনো তিনি সমাজে বিশ্বভারতীয় সত্যকে কাঁচা ভাষায় বোঝাতে চেয়েচেন, তাঁর কাব্যাদর্শের ভূমিকা রচিত হয়েচে খোলা চোখের জগতে। বর্ব্বর প্রতিঘাতের দ্বারা নয়, সম্বন্ধের যাথার্থ্যে তিনি সন্ধান করেচেন ধ্রুবকে।

"কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।"

সূক্ষ্ম অনুভূতিকে টান্‌চে ছেলেবেলার বিশ্বভুবন অথচ "বিশাল মনুষ্য-হৃদি"কেও তিনি জান্‌তে ব্যাকুল "কবি-কাহিনী"-র মূল কথা এই। গান ক'রে ব'লেচেন—

"শুনিয়াছিলাম কোন উদাসী যোগীর কাছে
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন'—"।

এই তাঁর সারাজীবনেরই কবিকাহিনী। এবং কর্ম্মকাহিনীর উৎস। অনুশীলন ক'রে দেখলে হয়তো এরি মধ্যে দিয়ে তাঁর আজকের দৃষ্টিতত্ত্বে পৌছন যাবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

অন্নদাশঙ্কর রায়

চার বছর আগে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আত্রাই নদীর বোটে। তখনি লক্ষ করেছিলুম তাঁর আননে অন্য এক সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য গত বছর শান্তিনিকেতনে আবার লক্ষ করেছি। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব কামনার উর্দ্ধে উঠলে, সংসার সম্বন্ধে সত্য সত্যই নির্লিপ্ত হলে শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের জীবনে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় পরিণত বয়সের ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশ তবে সেই শারদ সৌন্দর্য্য বিভাসিত হয় শুক্লকেশের কাশগুচ্ছের পটভূমিকায় প্রশান্ত উদাস ললাটে। রবীন্দ্রনাথকে এর আগে এত ভালো লাগেনি, এত সুন্দর মনে হয়নি। এই পরিচয় দিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল। জীবন যদি হয় পরিচয়জ্ঞাপন তবে তাঁর দীর্ঘতর জীবনেরও প্রয়োজন আছে। এই জন্যেই ঋষিরা বলেছিলেন, পশ্যেম শরদং শতং জীবেম শরদং শতং।

মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হয়ে তাঁর মৃত্যুভয় ক্ষয় হয়েছে। মনে হয় তিনি সাগরসঙ্গমের অস্ফুট কল্লোল শুনতে পেয়েছেন। তাঁর ইদানীন্তন কবিতায় এই বিচিত্র উপলব্ধির বার্ত্তা আছে। শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এ এক প্রকার উপভোগ। নিরাসক্ত নিঃশঙ্ক নির্মল হয়ে জীবনকে তিনি চূড়ান্ত উপভোগ করছেন, যদিও তাঁর দেহ আর বহন করতে পারছে না আয়ুর ভার। যাবেন বলে তিনি প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। যা কিছু সঙ্গে নেবার তাও গোছানো হয়েছে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, বাইরে বা ভিতরে, পিছনে বা সঙ্গে। যাবার সময় কিছু এলোমেলো রেখে যাবার ক্ষোভ নেই, কিছু অসমাপ্ত রেখে যাবার আফশোষ নেই। তাই দু'দিন থেকে যাবার জন্যে আগ্রহ নেই। তবে তিনি উতলাও নন। মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, মানুষ তাঁকে। এই সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন করবেন কী করে?

তিনি যাবার জন্যে উতলা নন। অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই বোঝা যায়, যদিও ব্যক্তিগত কোনো বাসনা নেই তাঁর, মানুষের কাছে তাঁর যে বিরাট আশা ছিল সে আশার ক্রমিক অন্তর্ধান তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে, মানব-জাতির অধঃপতন যে কত নিম্নে পৌঁচেছে তা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি

বেঁচে আছেন বলে গ্লানি বোধ করছেন। যে জার্মানীতে তিনি রাজসমারোহে অভিনন্দিত হয়েছিলেন তাঁর সেই অতি প্রিয় জার্মানী আজ কোথায়? কোথায় তাঁর আরো প্রিয় জাপান? আর যে ইংলণ্ড তাঁর আবাল্য শ্রদ্ধার পাত্র, যার শ্রদ্ধা তিনি প্রৌঢ়ত্বে লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন, সেই ইংলণ্ড আজ কোথায়? তাঁকে যাবার আগে এও দেখতে হলো—এই পতন ও ধ্বংসের চিত্র। আর তাঁর দুর্ভাগা দেশ? কবির সঙ্গে কথা কইলে দেশের জন্যে তাঁর যে আক্ষেপ ব্যক্ত হয় তা বিলাপের তুল্য, কখনো কখনো প্রলাপের সদৃশ। গৌরব করবার কিছু নেই, আশা করবার কিছু নেই, শুধু দিনযাপনের গ্লানি, শুধু প্রাণধারণের পীড়া। এই তো তাঁর স্বদেশ। তবু তাঁর আশা আছে ভারতের উপর, গান্ধীজীর উপর। দেশবিদেশের নবজাতকদের প্রতি, নবীনদের প্রতি তাঁর আশীর্ব্বাদ রয়েছে সব সময়। বিশ্বের অফুরন্ত যৌবনে তাঁর অফুরন্ত বিশ্বাস। তিনি আজকাল ভগবানে বিশ্বাস করেন কিনা জানিনে, একবার জিজ্ঞাসা করে ধরাছোঁয়া পাইনি। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যৌবনে ও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে তিনি চিরদিনের মতো এখনো বিশ্বাসবান।

তাঁর জীবনের অস্তাচল যদিও মেঘাচ্ছন্ন তবুও তিনি এক মনে রশ্মি বিকাশ করে চলেছেন। গ্যেটে ও টলস্টয়ের শেষজীবনের মতো তাঁর শেষজীবনও বিচিত্র প্রয়াসে পূর্ণ। তিনি যে এই বয়সে প্রচুর লিখে আমাদের প্রত্যহ লজ্জা দেন তা আমরা কনিষ্ঠরা জানি। কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। তিনি যে কবি তাই তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ছবি আঁকি কি না। আঁকিনে শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, যেন ওর মতো আনন্দ আর নেই। এবার তাঁর ছবি আঁকতে বসা চোখে দেখে এলুম। বললেন তুলি দিয়ে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তেমন লেখনী দিয়ে নয়। দেখলুম তাঁর লেখনীর সুয়োরাণীর যত আদর। ছবির পরে ছড়ার উপরে তাঁর ঝোঁক। সেবার আমাকে বলছিলেন ছড়া লিখতে। বাংলা কবিতার আসল রূপটি নাকি ছড়াতেই ফোটে। ছড়ার যে ভবিষ্যৎ আছে তা তিনি আমাকে এমন করে বোঝালেন যে আমি অতি সহজেই দীক্ষিত হলুম। তবে এখনো ছড়া লিখতে চেষ্টা করিনি। আমিও মানি যে বাংলা কবিতায় উন্নতি করতে হলে ছড়ায় হাত পাকাতে হবে আমাদের।

আষাঢ়, ১৩৪৮

কখনো ছবি আঁকছেন, কখনো ছড়া কাটছেন, কখনো গানে সুর দিচ্ছেন, কখনো নাচের মহড়া দেখছেন। শুনতে পাই গোপনে গোপনে রান্নার পরীক্ষাও চলে, আর হোমিওপ্যাথিক না বায়োকেমিক চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কর্মিষ্ঠতা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিলাইদহে যখন যাই সেখানে শুনি তিনি একবার নাকি মাটিতে মাছ পুঁতে নতুন রকমের সার তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পচা মাছের গন্ধে গাঁয়ের লোকের টেকা দায় হয়েছিল। চাষ করবেন তাঁর ছেলে, সেজন্যে তিনি তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি, একটা আস্ত চর কিনেছিলেন কিম্বা কিনতে যাচ্ছিলেন, ঠিক মনে নেই। শিলাইদহের কাছারিতে তাঁর হাতের খানকয়েক জমিদারি চিঠি পড়েছিলুম। সে সব চিঠিতে তাঁর যে পরিচয় তা একজন পাকা জমিদারের। তাতে সাহিত্যের স্বাদ ছিল না, তবে রচনার বাঁধুনি ছিল। পতিসরে তাঁর জমিদারি চালনার অনেক নমুনা দেখেছি, আর দেখেছি তাঁর প্রজাহিতৈষণার চিহ্ন। প্রজারা যে তাঁকে ভালোবাসত ও ভুলতে পারেনি তা আমি প্রজাদের মুখেই শুনেছি। একবার এক বৃদ্ধের মুখে তাঁর যৌবনের যেসব কাহিনী শুনেছিলুম তাতে তাঁর যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল তা যেমন সহৃদয় তেমনি তেজীয়ান। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছিল ও তিনি নিয়েছিলেন তা তিনি অকস্মাৎ ফিরিয়ে দিলেন। প্রজারা তো অবাক। তখন তিনি বললেন, "কী লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধ। আমি নেব তোদের উপহার!" এই বলে তিনি উল্টো তাদের কিছু দিয়েছিলেন, তা মনে পড়েছে না। চার বছর আগে আত্রাইতে তিনি তাঁর প্রজাদের যে সুখ্যাতি করলেন তা কেবল সেকালের একজন দরদী জমিদারের পক্ষেই সম্ভব। প্রজারা প্রধানত মুসলমান। তাঁকে দেখতে এসে বলে গেল, "পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি। আপনাকে দেখছি।"

কিন্তু কর্মিষ্ঠতা যদিও তাঁকে গ্যেটে ও টলষ্টয়ের সঙ্গে তুলনীয় করেছে তবু তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের যে চলা তা যেন স্রোতের গতি, তার যতি নেই। আর রবীন্দ্রনাথের চলা যেন পাখীর ওড়া, আকাশে ওড়ে, কিন্তু নীড়েও ফেরে।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

"যেন আমার গানের শেষে"
থামতে পারি সমে এসে"

রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই সমে আসার সাধনা। তাঁর শেষজীবন তাঁর প্রথম বয়সের সঙ্গে অন্বিত। তিনি আদির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন অবসানকে, উদয়ের সঙ্গে অস্তকে। তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত একটি উচ্ছল প্রবাহ আছে, কিন্তু তাই সব নয়। তাঁর জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে একটি গভীর সঙ্গতি আছে, একটি সুদৃঢ় ঐক্য। এক হিসাবে এটা একটা বাধাও বটে। পাখীকে বেশী দূরে উড়তে দেয় না তার নীড়। সে প্রতি রাত্রে ফিরে আসে তার কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাই প্রাচুর্য্য আছে, বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই, কিন্তু তাঁর পক্ষের বিস্তার সীমাহীন নয়, তাঁর জীবনের বাণী নিত্য বলেই পুনরুক্তিপরায়ণ। এই ত্রুটি কেবল তাঁর একার নয়, এটা তাঁর দেশেরও। আমাদের পক্ষের বিস্তার নেই—কি কায়িক, কি মানসিক। আমরা ছুটে গেলে ছুটে আসি, উধাও হতে পারিনে। পক্ষান্তরে অমন একরোখা গতি সদ্‌গতি নয়। ওতে শান্তি নেই। গ্যেটে বা টলস্টয়ের শেষজীবন শান্তির ছিল না। দ্বিধায় সংশয়ে পতনে উত্থানে ব্যাকুলতায় জটিলতায় ভরে ছিল। সেই নিগূঢ় অন্তর্ব্বিরোধ রবীন্দ্রনাথের যদি থাকে তা বেশ সুশাসিত। তিনি তাঁর শৈশবে তাঁর পিতার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন, যে শিক্ষা পেয়েছেন প্রকৃতির কাছে তাতে তাঁর তুলনা পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তথাপি আন্তর্জাতিক বর্ব্বরতা ও মানবের অসহায়তা তাঁর সেই শিক্ষাকেও প্রচণ্ড আঘাত করেছে। তাতে তাঁর শান্তির ব্যাঘাত ঘটেছে। কিন্তু তাঁর সাধনার বিরতি নেই। সাধনা সেই সমে আসার সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ কাজের লোক। কিন্তু তিনি ছুটির মানুষ। সে ছুটি তিনি উপভোগ করেন অন্তরে। কী করে যে এত রকম এত কাজের মাঝখানেও তিনি ছুটির আবহাওয়া পান, কোথায় যে তাঁর ছুটির উৎস, আমি তার সন্ধান পাইনি। যখনি তার কাছে গেছি তখনি তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা করেছেন যেন তাঁর হাতে দেদার ছুটি, এমনভাবে কথা কয়েছেন যেন তাঁর সময় কাটছে না। কিন্তু সে আর কত ক্ষণ! কয়েক মিনিট পরে

আর কেউ গিয়ে হাজির। আসলে তাঁর সময় সিকি পয়সাও নেই, তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত। অথচ তিনি তাঁর চার দিকে একটি ছুটির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাঁর ব্যস্ততা বা ত্বরা নেই। যিনি সমাপ্তির তটে বসে খেয়ার প্রতীক্ষা করছেন তাঁর কিসের বন্ধন ? তিনি মুক্ত পুরুষ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন একটি মুক্তির ইতিহাস। তাঁর জীবন শতদলের এক একটি দল খুলেছে, সেই সঙ্গে বন্ধনও খুলেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন। কালে তাঁর অন্যান্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু চিরকাল তাঁকে স্মরণ করবে জীবনজিজ্ঞাসুরা।*

* প্রবন্ধটি লেখকের "জীবনশিল্পী" নামক পুস্তকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম্ম

হুমায়ুন কবির

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক দেশ—তার স্থলভাগও তাই গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের বহু শতাব্দীর প্রবাহের ফল। নদীমাতৃক দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ বোধ হয় অনিবার্য্য, তাই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙলার মানসে যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেখি, ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে তার তুলনা মেলে না। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই বাঙালী চিরদিন বিদ্রোহী। বৌদ্ধ বিপ্লবের দিনে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ, তার প্রবলতাও তাই বিস্ময়কর। মগধে বা আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও বোধ হয় বৌদ্ধপ্রভাব এত গভীর ভাবে জাতির সংস্কার মধ্যে প্রবেশ করেনি। ইসলামের প্রাদুর্ভাবের দিনে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাণীর যে সাগ্রহ আমন্ত্রণ, বাঙলাদেশের মতন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তা বোধ হয় সম্ভব হয় নি। তাই সেই যুগ-সন্ধির দিনে বিপরীত-ধর্ম্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে বাঙালীরই কণ্ঠে প্রথম বেজে উঠ্‌ল মানব ধর্ম্মের জয়গান :

> শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।

বাঙালী মানসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন তাই মানবধর্ম্মের জয়গানে যে মুখর হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি ?

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সুরু এবং সারা এই একই সুরে গ্রথিত। অভিজ্ঞতার বিবর্ত্তনে তাঁর কাব্যধারায় বৈচিত্র্য এসেছে, দেশ দেশান্তরের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর অন্তরকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলেছে, বহুদেশের বহুমানুষের সংস্পর্শে তাঁর কাব্যের বিকাশ দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে হ'য়ে উঠেছে মানব-সভ্যতার চিরন্তন বিশ্বরূপের সঞ্চয়। এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কিন্তু তাঁর কাব্যের প্রকৃতি বদলায় নি, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তার মূলসুর মানবধর্ম্মের জয়গান।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর তাই চিরদিন সন্ন্যাস-বিরোধী। মানুষের সাধনার

ক্ষেত্র এই পৃথিবী, তাই পৃথিবীর সহস্র পরাজয় ও বঞ্চনা সত্ত্বেও এই সংসারের ক্ষেত্রেই মানুষকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা সংসারের সংঘাতে আতঙ্কিত হয়ে সে সংগ্রামকে এড়াতে চেয়েছে, তাদেরই জীবনে এসেছে অপরিমেয় ক্ষতি। দুঃখে কোনও ভয় নেই, ভয় রয়েছে দুঃখকে এড়াবার প্রচেষ্টায়। আপাতদৃষ্টিতে সংসারে যে পরাজয়, সে পরাজয়ে মনুষ্যত্বের হানি নেই, মনুষ্যত্বের হানি সেই পরাজয়ের ভয়ে সংসার-ত্যাগে। গানে কবিতায় গল্পে নাট্যে, কথা ও কাহিনীতে, উপন্যাসে আলোচনায় এই একই বাণী রবীন্দ্রনাথ সহস্র ঢঙে সহস্র ভঙ্গীতে বলেছেন, বারে বারে বলেও তৃপ্তি পাননি, তাঁর মনে ভয় রয়ে গিয়েছে যে হয়তো তাঁর অন্তরের মর্ম্মকথা তাঁর দেশবাসী গ্রহণ করতে পারল না।

জীবনে ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাই কর্ম্মযোগী। সেই কর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র পৃথিবী, তার ধর্ম্ম মানুষের আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন। তাই বৈরাগ্য-সাধনে যদি মুক্তি থাকেও, সে মুক্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের লোভ নাই। তাঁর সাধনা অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও যে মহানন্দময় মুক্তি, সেই মুক্তিলাভ। জীবনের সংগ্রামের শেষে হয়তো মৃত্যু, হয়তো ক্লান্ত আত্মা সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে আপনার নিঃস্বতাকে লুকোবার জন্যই মৃত্যুকে খোঁজে, তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমরা শুনি—

> "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সাধনা তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ। সে সাধনা কিন্তু কোনও নৈর্ব্যক্তিক অশরীরী মানুষের সাধনা নয়—সংসারের প্রতি মানুষের প্রতিদিনকার ছোটখাট সুখ দুঃখের পরিপূর্ণতায়ই সে সাধনা। কখনও কখনও মানুষের সে বিশ্বরূপও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন, বলতে চেয়েছেন যে মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, প্রতি মানুষের সঙ্গে এই বিশ্ব-মানবেরও সেই সম্বন্ধ। আমাদের দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুর স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে অথচ দেহের অংশ হিসাবেই তাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। ঠিক তেমনি ব্যক্তি হিসাবে আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকলেও বিশ্বমানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবেই আমাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বক্তৃতা ও সমালোচনায় এ মনোভাবের

বিচার তাঁর রচনায় মেলে, কিন্তু সে সমস্ত রচনাকেও পরীক্ষা করে দেখলে এ বিষয় সন্দেহ থাকে না যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই এই বিশ্বমানবের কল্পনার ভিত্তি। অসংখ্য কাব্য কবিতায় গানে গল্পে রূপকে জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখগুলি রসে ভরপুর হয়ে অমর হয়ে উঠেছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তি-গুলির এই মুহূর্ত্তিক প্রকাশের পরিপূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন জীবনের সার্থকতা।

গীতিকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ঝোঁকেরও ভিত্তি এই মানবধর্ম্ম। প্রতি মানুষের জীবনের মূল্য অপরিমেয় এবং সেই জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি মুহূর্ত্তের মূল্যও অপরিমেয়। জীবনের প্রতি এই দুর্ব্বার ভালবাসা না থাকলে এত যত্নে এত সাধনায় তার প্রতি মুহূর্ত্তটিকে অমর করে তোলবার প্রচেষ্টা কোনোদিন সার্থক হতে পারে না। অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে মানুষের সংঘাত ও পরাজয়ের নাট্যরূপে ট্র্যাজেডী, অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনীতে মহাকাব্য, ব্যক্তির মুহূর্ত্ত-সচেতন জীবনের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধির প্রত্যক্ষ ফল গীতিকাব্য।

গীতিকাব্যের বিষাদ-ঘন ছায়ার মধ্যেও তাই সর্ব্বত্রই আশাবাদের অন্তর্লীন সুর। গহনতম দুঃখেরও যে কাহিনী, তার মধ্যেও সান্ত্বনার আশ্বাস রয়েছে বলেই বিষাদ-গাথা এত মধুর—করুণ কথাটির কারুণ্যের মধ্যেই আশার আভাসের ছায়া। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম্মও তাই চিরদিনই আশাবাদী। জীবনের আপাতপরাজয়ের পেছনে তিনি দেখেছেন জয়ের নিশ্চিত ভরসা, লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধনের শেষে মুক্তধারার অবারিত প্রবাহ। কর্ম্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল তিনি পান নি, তাঁর সাধনা ও স্বপ্নকে দেশের মানুষ আজো যথোচিত মূল্য দেয় নি, কিন্তু ভগ্নদেহ ও বয়োজীর্ণ মন নিয়ে তিনি একা সংগ্রাম করে চলেছেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় যে বিশ্বভারতীর স্বপ্ন একদিন সফল হবেই। তাঁর অশীতিতম জন্মদিনের উপলক্ষে তাঁর যে অভিভাষণ, তার নৈরাশ্য, বিষাদ ও দুঃখের মধ্যেও তাই এ দৃপ্ত ভরসা তাঁর রয়েছে যে "মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরিচিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মানুষের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের মানব ধর্ম্মের চরম বিকাশ এই বিশ্বাসে, এবং এই বিশ্বাসের বলেই যৌবনতেজের আসন্ন অবসাদের দিনেও তিনি বলতে পেরেছেন :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

রবীন্দ্র-কাব্যের দৃশ্যপট

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর হ'ল রবীন্দ্র-কাব্যের সত্যিকারের সমালোচনা সুরু হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্র-কাব্যের নানা দিক্ নিয়ে, তার দর্শন, তার আঙ্গিক ও ছন্দ, মূলসূত্র ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নিয়ে একাধিক ভালো প্রবন্ধ বেরিয়েছে। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পর থেকে সাধারণ বুদ্ধিমান্ পাঠক আরো বেশী ক'রে তাঁর কবিতাকে কাছে পেয়েছে এবং নানা প্রবন্ধ ও আলোচনার ভিতর দিয়ে কবির বহুমুখী প্রতিভা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে। আরো সম্প্রতি নব-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন স্তরের কাব্য-অভিব্যক্তি স্পষ্টতর রূপ নিয়েছে। তাই রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে নূতন কিছু লিখতে যাওয়া কঠিন যা পূর্ব্বে আলোচিত হয়নি। তবে সুনিপুণ সমালোচনা বিজ্ঞান-সম্মত ও সম্পূর্ণ হলেও তার মধ্যে ফাঁক থেকে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমন কয়েকটি দিক্ আছে যা এখনও গভীরতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

এমন যুগ ও মনোভাব ছিল বাঙলাদেশে, বিশেষ ক'রে শিক্ষাভিমানী ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে, যখন রবীন্দ্র-কাব্যের কথা উঠলেই শ্লেষ-সূচক হাসি দিয়ে তাঁর বিশ্ব-প্রীতি ও ভূমানুরক্তি অঙ্গীকার ক'রে নেওয়া হত। তখনকার দিনে একটা মোটামুটি ধারণা ছিল যে কবির কাব্য এবং তার বিষয়-বস্তু যেমনি অস্পষ্ট তেমনি অবাস্তব—মাটির পৃথিবীর কল্পিত মায়া তাতে ধরা দিয়েছে মাত্র, কিন্তু তা অদৃশ্য। বিশ্বসঞ্চারী কবি-মন তত্ত্বদর্শী হতে পারে কিন্তু মাটিতে আর আকাশে অনেকখানি প্রভেদ থেকে যায়। শুধু সঙ্গীত-কাব্যের মধ্যস্থতায় স্বর্গের আর মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা সোনার সিঁড়ি গড়ে তোলা যায় এবং ঘরের গণ্ডীকে বৃহত্তর ক'রে বাইরের বড়ো পৃথিবীর ধোঁয়াটে বৃত্তাকারে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বাস্তব জীবনের মধ্যে কল্পনা-বিলাস ও দার্শনিক সংহতির স্থান কতোটুকু? সৌভাগ্যক্রমে এ মনোভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল তরুণতম কবি ও সমালোচক স্বীকার না ক'রে পারেন না যে একদা যে-প্রতিভা বিশ্বমুখীন এবং যে-কাব্য সার্ব্বজনীন ব'লে ইঙ্গিতে উপহসিত

হয়েছিল, সে-প্রতিভা ও কাব্য জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে শুধু অধরার সন্ধানেই আত্ম-নিবেদন করেনি।

কি রসে কি ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে সার্ব্বজনীন সুর প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান, এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু সে-সুরের প্রকাশ হয়েছে স্বদেশেরই আবহাওয়ায়। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অথবা প্রবন্ধাবলী খুললেই দেখা যায়, যে বাঙলা দেশের জল ও স্থল, তার বিশিষ্ট জীবনধারা, ক্ষীণায়মান আভিজাত্য কিংবা জাতীয় শিক্ষা ও ঐতিহ্য বারে বারেই তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্বপ্রীতির খাতিরে কবির সাহিত্যিক প্রতিভা জাতীয় জীবন ও সমস্যাকে এড়িয়ে কেবল অবাঙমনসগোচর রহস্যময় তীর্থলোকের আশ্রয় নেয়নি।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বাঙলা দেশের দৃশ্যের ছাপ এতো স্পষ্ট ও মূর্ত্ত তার একটা বড় কারণ হল যে কবি কিশোর ও তরুণ কালের অধিকাংশ দিন কাটিয়েছেন কলকাতায় ও পূর্ব্ববঙ্গে। যে বয়সে মন থাকে আবেগ-প্রধান, গ্রহণেচ্ছু আর বিস্ময়ের দৈব ঐশ্বর্য্যে ভরপুর সেই সময়টাই কবি থেকেছেন জোড়াসাঁকোয় বৃহৎ পরিবারের বিচিত্র পরিবেশে অথবা পদ্মা-বক্ষে ও নদীর তীরে, যেখানে বিস্তীর্ণ বালুর চর আর কাশবন আর দিনের পর দিন আকাশে আর মাটিতে নিত্য নূতন রঙীন্ মিতালি। আমাদের গদ্য-সাহিত্যে যে দুখানি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য-কাব্য সেই 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' এই বাঙলা দেশেরই চির-পরিচিত অথচ নতুন ক'রে দেখা খণ্ড দৃশ্যে ভরপুর। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদ থেকে দূর আকাশের হাতছানি, চামর-দোলানো নারিকেল গাছের বাঙ্ময় নিমন্ত্রণ, আবছা আলোয় অন্তঃপুরে মা-দিদিমার কাছে গল্প-শোনা, পিছনের পুকুরে স্নানার্থীর ভিড় ও পাতি-হাঁসের গুগ্‌লি-সাধনা, আর পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত নদীতীরে প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যময় মুখর সান্নিধ্য—এ সব দৃশ্য খাঁটি বাঙালী এবং এর পিছনে যে রসপিপাসু সন্ধানী মন, তা বাঙালী ছেলেরই স্বপ্নময় কল্পনা-প্রবণ মন। এই শিশু মনকে যে রবীন্দ্রনাথের ক্রম-বর্দ্ধমান প্রতিভা কখনো উড়িয়ে দিতে পারেনি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর নতুন বই 'ছেলেবেলা'।

রবীন্দ্র-কাব্যের দৃশ্যপট তাই বাঙলাদেশের নিজস্ব আল্‌পনা। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের খোলা নীল আকাশ, কাঁকর বিছানো ঢেউখেলানো পথ-ঘাট, আর

দিগন্তবিস্তৃত উদাসী প্রান্তর যেমন তাঁর দৃশ্যপটের প্রধান উপকরণ, তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের নদীতীর, বালুচর, আর দু'পাশের গ্রাম্য চিত্র তাঁর কবি-কল্পনার খোরাক জুগিয়েছে। এই দুই বিভিন্ন দৃশ্যের সমন্বয়ে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। এটা সত্যিই আশ্চর্য্যের কথা। যে ব্যক্তি চিরকালই নীড়-ভক্ত, ঘরের নিভৃত কোণেই যাঁর কাব্য-সাধনা তাঁর রচনায় না হয় এমনটি সম্ভব। কিন্তু যে কবি ভ্রাম্যমান, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁর দৈহিক ও মানসিক গতি, যাঁর প্রতিভা স্থিতিশীল নয়, জীবনের কোনও একটি খণ্ডচিত্র যাঁর মূলধন নয়, তাঁর লেখায় এমন ঘরোয়া সুর সত্যিই ভাববার কথা। রবীন্দ্রনাথ যাযাবর না হলেও একজন বড় পর্য্যটক। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে কতো দেশেই না তাঁর পদার্পণ ঘটেছে। এই চলিষ্ণু জগৎ আর বিচিত্র সমাজ মনের ছাপ তাঁর রচনায় কিছু কিছু অছে নিশ্চয়ই কিন্তু যেখানেই গেছেন, কবির মন বাঙলাদেশের বিশিষ্ট ছবি ও উপমা, তার স্বতন্ত্র ও নিজস্ব দৃশ্যের ভাষাকে ভোলেনি। কতো দেশ, কতো নদী ও সমুদ্র কবি অতিক্রম করেছেন কিন্তু মন বাঁধা আছে স্বদেশের নদী আর প্রান্তরে। এবং সে জল ও আকাশ তাঁকে যেমন বারবার ভাবিয়েছে, আবেগ-কম্পিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে নিত্য-নূতন রচনায়, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র ও পাহাড় নিয়ে দু' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কোপাই ও খোয়াই তাঁকে যেমন ভাবচঞ্চল করেছে, পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্র অথবা স্থাণু পাহাড় তেমন করেনি। জাহাজে-ব'সে-দেখা সন্ধ্যাতারা, আর জলের খেলা তাঁর মনকে টেনে নিয়ে গেছে তাঁর পুরানো গণ্ডীতে। বিদেশীয় দৃশ্য হয়তো তাঁকে চকিত-দীপ্ত করেছে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনি বাঙলাদেশের যুঁই-ফুলের ওপর কবিতা লিখেছেন। বিদেশী নাম-না-জানা ফুল আর মেয়েকে তিনি বাঙালী সাজ পরিয়েছেন, করেছেন বাঙালী প্রথায় নাম-করণ। যদি ভাবা যায় যে এ মনোভাব হল কবির ভাবাকুল স্বভাবের nostalgic প্রকাশ, তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। এ হল রবীন্দ্রনাথের মনের প্রকৃতি। প্রাকৃতিক দৃশ্যে সমুদ্র আর পাহাড়, আর কাব্যক্ষেত্রে সনেট্-রচনা,—এ তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম্মী নয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বোম্বাই অথবা বিলেত গিয়েছিলেন তখন তিনি

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে। এটা আশা করা যায়, যে ঐ সময়টা নতুন দৃশ্য, নতুন জগৎকে প্রসন্ন আর বিস্মিত মনে গ্রহণ করবার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু তাঁর রচনায় যে প্রবাস-স্মৃতি আমরা পাই, তাতে অল্প বয়সেও দৃশ্য বস্তুর প্রাধান্য নেই। এবং এ মনোভাবের ব্যতিক্রম হয়নি যখন পরবর্ত্তীকালে পরিণত বয়সেও কবি একাধিকবার বিদেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় য়ুরোপ তাঁকে তেমন ক'রে টানেনি, আপন ক'রে নিতে পারেনি। দু' একজন আধুনিক সাহিত্যিক, যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, যে বিস্মিত মনোভাব নিয়ে য়ুরোপ দেখেছেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে সে দৃষ্টিভঙ্গী নেই। অথচ মানুষ আর সমাজ, সভ্যতা ও ভবিষ্যৎ কিছুই এড়িয়ে যায়নি করিব চোখকে। 'পথে-প্রবাসে' হল সেই জাতীয় রচনা যাতে য়ুরোপ-দর্শন, বিদেশকে চোখ-কান খুলে দেখার ও বোঝার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের চোখে য়ুরোপের মায়া ও সাজ যথেষ্ট পরিমাণে মোহিনী হয়নি। এর কারণ বোধ হয় ঠাকুরবাড়ীর আবহাওয়া। ছেলেবেলায় তিনি যে মানসিক স্বাধীনতা, আলোচনা, শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে গড়ে উঠেছিলেন সেগুলো তখনকার দিনে ছিল অত্যাধুনিক, য়ুরোপীয় চিন্তাধারার কোল-ঘেঁসা। তাই এতো কাঁচা বয়েসেও তাঁর জিজ্ঞাসু মন আর বিশ্লেষণী বৃত্তি তাঁকে মোহগ্রস্ত হতে দেয়নি।

এ অবস্থায়, এই রকম মানসিক গঠনে রবীন্দ্র-রচনায় বাঙলার দৃশ্যপট হয়েছে একটা নীরব ভূমিকা নয়, মাত্র একটা উচ্ছ্বাসবহুল স্বাদেশিকতাও নয়—সে হল পরোক্ষ কিন্তু শারীর উপস্থিতি, অনেকটা প্রচ্ছন্না নায়িকার মতো। বিদেশের দেখা দৃশ্য ক্বচিৎ কখনো তাঁর লেখায় ধরা দিয়েছে—যেমন 'শেষের কবিতা'য় অক্সফোর্ডের এক অবিস্মরণীয় রজনীর স্মৃতি। কিন্তু মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন বাঙালী কিশোর ও বাঙালী কবি, যার প্রথম ও শেষ প্রেম বাঙলা দেশের মাঠ আকাশ আর নদী। তাই এতোদিন পরেও অশীতিপর কবি 'ছেলেবেলায়' সেই হৃতস্বপ্ন পুরানো দিনের জের টেনে এনেছেন তাঁর অপরূপ ভাষায়। আজও ভুলতে পারলেন না সযত্নে পরিবেশন-করা সেই নিতান্ত বাঙালী খাদ্য,—পান্তাভাত, চিংড়ীমাছ আর কাঁচালঙ্কার আমেজ।

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প

জ্যোতির্ম্ময় রায়

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের-প্রতিভাবানদের মধ্যেও এক অভিনব আবির্ভাব, যাঁর সৃজনী-শক্তি রূপ ও রস-সৃষ্টির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে প'ড়ে তার আনাচ-কানাচ তুল্যরসে প্রাণবান করেছে। কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কৌতুক, এবং প্রতিটিরই আবার রকমারী তো আছেই, তা ছাড়া রয়েছে শিশু-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক—তাঁর কলমের আঁচড়ে সব কিছু পরম সমৃদ্ধিতে হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

প্রাক-রাবীন্দ্রিক বাঙলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো এতটা উন্নত ছিল না বটে কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট উন্নতির আভাস তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস—বাঙলা সাহিত্যে ছিল সবই, ছিল না শুধু ছোট-গল্প। বঙ্কিমবাবুর 'ইন্দিরা'র মতো উপন্যাসধর্ম্মী বড়-গল্প বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র মতো বিরল ক্ষমতার পরিচায়ক সার্থক নক্সা (স্কেচ্) এবং ছোট উপন্যাস ছিল, কিন্তু ছোট-গল্প বলতে আজ আমরা যা বুঝি সে-জিনিষ মোটেই ছিল না। চলমান জীবনের যেখান-সেখান থেকে এক ফালি ঘটনা নিয়ে তার খণ্ড-অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত বৃহৎ সত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়েছেন। ছোট-গল্পের সমৃদ্ধি শুধু নয়, গোড়াপত্তনও তাঁর হাতে। রবীন্দ্রনাথের আগে যে-সব বড়-গল্প লেখা হয়েছে, সবই উপন্যাসের ধরণে, ছোট-গল্পের আধুনিক আঙ্গিক ও তার পরিণত প্রকাশ বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-রচনাতেই প্রথম। বাঙলা সাহিত্যের এই অঙ্গপূরণের কাছে বিশেষ ক'রে বিদগ্ধ সমাজ একান্তভাবে ঋণী: যন্ত্র-যুগের ঘড়ি-ধরা ব্যস্ততায় রস-সৃষ্টির এই সংক্ষিপ্তসারই আজ সব চাইতে বেশি মনের খোরাক যোগাচ্ছে তাদেরই। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্য খুব বেশি পরিণতি পেয়েছে ছোট-গল্পে, কিন্তু বাঙলা ছোট-গল্পের আলোচনায় এখনো যে রবীন্দ্রনাথের গল্পের কথাই সকলের আগে বলতে হয় তার কারণ ঐতিহাসিক নয়, সাহিত্যিক।

সমালোচকদের মতে ছোট-গল্পের ভাষা হওয়া উচিত নিছক একটা

অবলম্বন : উপমা হিসেবে বলতে পারি, তার অস্তিত্বটা চান তাঁরা 'ইথর'-এর মতো, সে থাকবে কিন্তু নিজেকে জাহির করবে না। রবীন্দ্রনাথের গল্প এ-অনুশাসন অমান্য ক'রেও সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। তাঁর ভাষার কারুকার্য্য ও উপমার অলঙ্করণ গল্পকে সামান্যতম ব্যাহত করে নি। অজস্র মরসুমী ফুলের স্বাভাবিক সমারোহ চলার পথে আনে একটা ব্যাপ্ত আনন্দ, টবে-পোতা গুঁজে দেওয়া রূপের মতো চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ হয় না। শুধু ছোট-গল্প কেন, রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাই শুধু সমগ্রতায় সার্থক নয়। তার প্রতিটি অংশের সত্তাও দুর্নিবারভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্যের খুব উন্নত পর্য্যায়ের রচনায়ও দুটো ধরণ আছে : পাথরের ও সোনার দুটো বহুমূল্য মূর্ত্তির সঙ্গে তাদের তুলনা চলতে পারে : পাথরের মূর্ত্তিটির মূল্য তার সমগ্রতায়, ভেঙে টুকরো হয়ে গেলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে, কিন্তু অন্য মূর্ত্তিটির উপাদানেরও নিজস্ব একটা মূল্য আছে, যা তার প্রতিটি অংশে বিদ্যমান এবং গঠনের উপর নির্ভরশীল নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোট-বড় সব রচনাই ঐ স্বর্ণ-মূর্ত্তির মতো : এমন কি তাঁর ছোট-গল্পের একখানা পাতা ছিঁড়ে চার টুকরো করলে তার যে-কোনো টুকরো থেকে মনকে নাড়া দেবার মতো কিছু-না-কিছু মিলবে।

এইচ্, জি, ওয়েলস্ ছোট-গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এতে লেখকের অবসর এত কম যে বাঘের মুখে প'ড়ে ছোটার মতো তাকে ছুটতে হয়, চারদিকে চোখ মেলে নিরীক্ষণ করবার অবসর তার থাকে না। উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্যে প্রাণের দায়ে ছুটলে তা থাকে না বটে, কিন্তু আনন্দের দুরন্ত বেগকেও খোলা-চোখের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয়, সময় অভাবে ব্যাপ্ত পারিপার্শ্বিক সেখানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু একেবারেই উহ্য বা অবলুপ্ত নয়। ছুটন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে আমরা দেখিনে কিছুই, আবার সবই দেখি। অপস্রিয়মান বঙ্কিম রেখাটিতে পাই পথের ইঙ্গিত, দূরে দীর্ঘায়িত মসীরেখায় থাকে গ্রামের পরিচয়। পাঠক যে আগ্রহের আতিশয্যে গল্পের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে তার কথা আমি বলছিনে, আমার আলোচ্য বিষয় ছোট-গল্পের লেখক ও তার বিষয়-বস্তুর সম্পর্ক ; বিশ্লেষণের অবসর সেখানে নেই, গল্পকে ধরতে হয় সংশ্লেষণের ভেতর দিয়ে—বিস্তারিত স্পষ্টতায় ঢোকবার অবসরটাই হলো মন্থরতা। ছোট-গল্প লিখতে ব'সে তাড়াহুড়োকে লেখকের মেনে নিতেই হয়, তারই

মধ্যে দক্ষ-ক্ষিপ্রতায় রবীন্দ্রনাথের পরিবেশনটি হয় দ্বিধাহীন অকৃপণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের উপর দিয়ে উদ্দেশ্যমুখী হয়ে প্রাণের দায়ে ছোটেন নি: তাঁর অবসরের স্বল্পতায় বস্তু আভাসে-ইঙ্গিতে যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত সত্তায় পাঠক পরিবেশে ব্যাপ্ত ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বহুবিধত্ব ও বৈচিত্র্য খুবই লক্ষ্য করবার বিষয়। 'গুপ্তধন'-এর মতো প্লট ফাঁকানো গল্প যেমন আছে তেমনি আছে 'পোষ্ট-মাষ্টার'-এর মতো একফালি অতি সাধারণ ঘটনার গল্প, আবার 'উদ্ধার'-এর মতো গল্পও আছে যা ভাষার অলঙ্করণ এবং ঘটনার ঘোরপ্যাচ ছাড়াই একেবারে সোজা এসে মনে তীব্র তীক্ষ্ণভাবে ঘা দেয়। তাঁর গল্প সমাজ-জীবনের বিশেষ-কোনো একটা দিকে ঝুঁকে পড়েনি, তার বিভিন্ন দিকের বিবিধ অবস্থায় সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। মনস্তাত্বিক বা হাসির গল্পেরও অভাব নেই; তা ছাড়া সংখ্যার প্রাচুর্য্যও বিস্ময়কর। এক সময়ে এত গল্প তাঁর মনে আসতো যে নিজে লিখেও যেন কুলিয়ে উঠতে পারতেন না: গল্পের অনেক বিষয়বস্তু স্নেহাশ্রিত সাহিত্যিকদের বিলিয়েছেন, সেটা তাঁদের স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প বলার ধরণটি শান্ত, পাঠককে আস্তে ধ'রে ধীর-আকর্ষণে টেনে নিয়ে আলতো ভাবে ছেড়ে দিয়ে যান—মোপাসাঁর মতো খপ্ ক'রে ধ'রে হিঁচড়ে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দেবার মতো গল্প তাঁর রচনায় নেই। অধিকাংশ গল্পের ভাষা, এমন কি কথোপকথন পর্য্যন্ত সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই অতি-আধুনিক মনের অনভ্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আজও তা বেশ অন্তরঙ্গ এবং ঘরোয়া হয়ে ওঠে। 'গল্পগুচ্ছে'র ভাষা, ভঙ্গী ও বিষয়বস্তু বাঙলার সাহিত্যিকদের বহু দিন পর্য্যন্ত একেবারেই আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। বাঙলা উপন্যাসকেও নানা দিক দিয়ে নতুন পথের সন্ধানও দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প। শরৎবাবু দু'এক দিক দিয়ে মাথা তোলবার চেষ্টা ক'রে আংশিক সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ-বৈশিষ্ট্য দাবী করবার কল্পনাও যেন করতে পারেন নি। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত হবার জন্যে বাঙলার সাম্প্রতিক সাহিত্যের আপ্রাণ চেষ্টা আজও তাঁর দুরতিক্রম্য প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প উপন্যাস মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা: বিশেষ

ক'রে ছোট-গল্পে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। অধুনা একটা নালিশ শুনতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নি। তাঁর আজন্ম ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টন তাঁকে গরীব মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেয়নি ব'লে তাঁদের চরিত্র এবং পরিবেশ হয়ে পড়ে নাকি নিছক কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গল্প যে-সময়ের লেখা তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থিক অবস্থার তারতম্যের উপর ভিত ক'রে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত নাম নিয়ে ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েনি। যান্ত্রিকতার জাঁক নিয়ে সহুরে সভ্যতা বেড়ে ওঠবার পর তার পরিণত যৌবনের যমজ সন্তান হলো এই নিম্নমধ্য-বিত্ত ও শ্রমিক। অর্দ্ধনারীশ্বরের মতো আজকের এই মধ্যবিত্ত, যার আদ্ধেকটা গ্রাস করেছে শ্রমিকের দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘন অন্ধকার, অন্যার্দ্ধে নীলরক্তীয় আভিজাত্যের ও সম্পদের মেকি ঝলকানি : এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত, যার সত্তার একমাত্র গৌরব 'ভদ্রলোক' নামে, তাদের মন সেই দিনের মধ্যবিত্তকে জমিদার বা ধনী ব'লে ভুল করলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প সেই সময়ের লেখা যখন মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য ও জীবিকা-সংগ্রামটা এত তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি; তাই আজকের মধ্যবিত্তের যেটা খাঁটি বা একমাত্র পরিচয় সেটা তাঁর গল্পের উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায় নি। পরবর্ত্তী বা শেষের দিকের গল্পে উপন্যাসে এ দিনের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তকে তাদের শিক্ষা, সমস্যা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের বাইরে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের চরিত্র গড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ঘটনার জোরে অতি-বাস্তব হয়ে ওঠেন নি, এমন ঘটনা বিরল নয় : সে-সব ক্ষেত্রে চরিত্র বা পরিবেশকে আংশিকভাবে কাল্পনিক বলা যেতে পারে। কিন্তু কাল্পনিক ব'লেই তারা ব্যর্থ নয়, কারণ তাঁর রচনায় মৌলিক সত্য কোথাও ব্যাহত হয় নি। সেক্সপীয়র সৈনিক বা নাবিক ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথও কুলি বা কেরাণী ন'ন, কিন্তু এঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং অপরিসীম কল্পনাশক্তি যে-কোনো রাস্তা ধ'রে বাস্তব-সত্যের সীমান্তে গিয়ে পৌছয় ব'লেই তো এঁরা প্রতিবাবান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এঁদের কাছে অপরিহার্য্য নয়, কারণ এঁরা হলেন দ্রষ্টা। এঁদের কল্পনা সব ক্ষেত্রেই বাস্তবের আড়ালে

গা ঢাকা দেয় না, কোথাও কল্পনা আত্ম-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই বাস্তবের হাত ধ'রে এগিয়ে চলে। পাঠককে তার জ্ঞাতসারে কল্পলোকে রেখে বাস্তবের স্বাদ-গন্ধ পরিবেশন করতে পারে একমাত্র বিরল প্রতিভা। সাম্প্রতিক ঘোর বাস্তব-ধর্ম্মী মন আমাদের কল্পনার আভাস পেলেই বাহুল্য বিলাস মনে ক'রে আঁৎকে উঠতে শিখেছে, তাই এ নালিশ।

রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পেই তিনি শ্রেণী-চেতনা বা শ্রেণী-বৈষম্যকে বড় ক'রে দেখাতে প্রয়াস পান নি, বেশির ভাগ গল্পেরই পশ্চাৎপট ব্যাপ্ত ও সার্ব্বজনীন। বোষ্টমী, কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, গুপ্তধন, কাবুলীওলা: এসব গল্পে শ্রেণী বা জাতিটা নেহাৎই যেন আকস্মিক ও অকিঞ্চিৎকর—মানুষের কথাটাই বড়। মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে গল্পগুলো এমন তাজা, মনে হয় প্রতিটি চরিত্র গা ঘেঁসে ঘোরাফেরা করছে। 'স্ত্রীর পত্র'-খানি বাঙলা সাহিত্যের এক অনবদ্য বস্তু। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মতো এ যেন বাঙলার মেয়েদের এক মর্ম্মন্তুদ ম্যানিফেস্টো। সমগ্র চিঠিখানি জুড়ে গভীর আবেগ ও দরদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও যুক্তির কী অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! 'হালদার গোষ্ঠী'র মতো গল্পে পাই ক্ষয়িষ্ণু ধনী পরিবারের পরিচয়, 'শাস্তি'র মতো গল্পে ফুটেছে নিম্নশ্রেণীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। চলতিভাষায় লেখা পরবর্ত্তী রচনায় 'পয়লা নম্বর', ও 'পাত্র ও পাত্রী' অতি আধুনিক গল্প-ভাণ্ডারেরও অপূর্ব্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের আলোচনায় 'চতুরঙ্গ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চতুরঙ্গ' ছোট উপন্যাস হলেও লেখা ছোট-গল্পের আঙ্গিকে। 'জ্যাঠামশায়ে'র অংশটি একটি নিটোল ছোট-গল্প হিসেবেই তুলে নেওয়া যেতে পারে। ছোট-গল্পের আঙ্গিকে এ ধরণের উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে 'চতুরঙ্গ'ই প্রথম—ছোট-গল্পের আসরে এও রবীন্দ্রনাথের এক নতুন দান।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে বণিক সভ্যতার ইতিহাস বিচিত্র। এর জন্মের সময়ই দেখা গেল জরার লক্ষণ। কারণ, পৃথিবীর যে-দেশ থেকে এ সভ্যতা এল সেখানেই ততদিনে তার ঐতিহাসিক ব্রত প্রায় উৎযাপিত হয়ে গেছে, সে সভ্যতা হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ অথর্ব্ব। অপরদিকে আবার বণিকসভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি, কৃষিসভ্যতার অনেক মিশেল থেকে গেছে। কারণ, আমাদের দেশ দাস দেশ। পশ্চিমের সওদাগর-কর্ত্তাদের সঙ্গে স্বদেশী সওদাগরদের স্বার্থসংঘর্ষ অনিবার্য্য, ফলে তাঁরা ভারতবর্ষে নির্জলা বণিকসভ্যতা সইতে পারেন না। মোটের উপর ফল হল এই যে এ সভ্যতা একরকম বিকলাঙ্গ রূপ নিয়ে জন্মালো আমাদের দেশে: একদিকে তার জরার লক্ষণ, অপরদিকে ভ্রূণাবস্থার অসম্পূর্ণতা। তবু বিকলাঙ্গ শিশুও বেড়ে ওঠে, তার জীবনেও একরকম অগ্রগতি খোঁজা নিষ্ফল নয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কস্‌এর পত্রাবলী এ বিষয়ে আলোকপাত করে। অবশ্য এই অগ্রগতি খুবই অসম্পূর্ণ ও অল্পস্থায়ী। ভাঙন অল্পদিনের মধ্যে দেখা দিতে বাধ্য।*

সাহিত্যে সমাজের ছায়া প্রত্যক্ষ। এখানকার পরিবর্ত্তনের মূল কারণ সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্ত্তন—"Progress and decadence of bourgeois literature in Bengal" থিসিসের বিষয়বস্তু হিসেবে অনর্থক বা নিরর্থক নয়। এই থিসিসের মালমশলা প্রধানতঃই রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে পাওয়া যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন প্রায় ১৮৮৭ থেকে আজ পর্য্যন্ত। তখন বুর্জোয়া সভ্যতার পত্তন ভাল করে হয়নি, সবে সুরু হয়েছে। তারপর ক্রমশঃ সে সভ্যতার যা অগ্রগতি হবার ছিল তা হল। তারপর ক্ষয় সুরু হল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই সমস্ত পর্য্যায়গুলির ছায়া ধরা যায়। পৃথিবীর কোনো লেখক কি এত দীর্ঘ দিন ধরে, এতরকম সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন? পি-এইচ-ডি-লোলুপ অনেক ভদ্রসন্তান ত আজকাল

* বিকলাঙ্গ শিশুর উপমাটা স্ট্রেচি থেকে পাওয়া। এটা অবশ্য নেহাতই উপমা, তার বেশী চাপ দিতে গেলে ভেঙে পড়ে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে লিখছেন। থিসিস্‌কে ভাবালু বিশেষণে ভারাক্রান্ত না ক'রে তাঁরা এ-ধরণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন না কেন?

অবশ্য কয়েকটা মূল ভ্রান্তি কেটে যাওয়া দরকার। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলাটা অপবাদ দেওয়ার সামিল নয়, একটা ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ মাত্র। এবং এটা অনিবার্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বণিকসভ্যতা যে রকম অনিবার্য্য ছিল সেই রকমই তাঁর পক্ষে বুর্জোয়া কবি হওয়াও অনিবার্য্য ছিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ সভ্যতা থেকে বৈশ্য সভ্যতা একটা প্রকাণ্ড সামাজিক অগ্রগতিই। বাংলা সাহিত্যে এ অগ্রগতির কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ—কথাটা এত বেশী স্পষ্ট যে লিখতে লজ্জা হয়।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারে খুব বেশী সতর্ক থাকা দরকার। তাঁকে নিছক বুর্জোয়া বললে অতিসারল্য হবে। করাণ, তাঁর লেখায় বিবিধ ভাবধারার মিশ্রণ হয়েছে—উপনিষদ (ফিউড্যাল), হেগেল (বুর্জোয়া), বার্গসঁ এবং আরো অনেক। (কারণ আমাদের সমাজ কোনোদিনই নির্জলা বুর্জোয়া সমাজ নয়।) অবশ্য এ সমস্ত দর্শনের উপরও সব চেয়ে বড় কথা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও প্রতিভা। এই ব্যক্তিগত দিকটাকে সামাজিক ক্যাটিগরির ব্লটিং কাগজ শুষে নিতে পারে না, অন্ততঃ যতক্ষণ আপনি মার্ক্‌স্‌বাদ মানেন। (এঙ্গেল্‌স্‌এর পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।) তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যদিও প্রধানতঃই আভিজাতিক সাহিত্যিক, এবং তাঁর রচনাবলী অধিকাংশই অভিজাত সমাজেরই মুখপত্র, তবুও ভুললে চলবে না মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়েও তাঁর লেখা প্রচুর। সমাজতত্ত্বের ছাত্র হয়ত বলবেন এর কারণ ভারতীয় ধনিকশ্রেণী মধ্যবিত্তের সহায়তা খোঁজে। সে যাই হোক, মোট ফল এই যে রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধুই বনেদী ইমারতের ছবি নেই, গৃহস্থপাড়ার আঙিনাও বাদ পড়ে নি।

উপস্থিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমস্ত স্তর এবং সমস্ত দিকের আলোচনা অসম্ভব। একটা কাঠামোও করা চলে না: তার জন্যও হয়ত দুশো পাতা দরকার। তবু একটা উদাহরণ দেবার উৎসাহে তাঁর কাব্যের শুধু একটা বিশেষ স্তরের কথা তুলতে চাই—তাঁর গদ্য কবিতা। এখানেও আলোচনা করব শুধু তার প্যাটার্ন নিয়ে, খুঁটি-নাটির কথা তোলা অসম্ভব।

গদ্যে কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে খুবই অভিনব পরিবর্ত্তন। গদ্য কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতবাদটাই ধরা যাক। এই মতবাদ আমার মনে হয় সব চেয়ে স্পষ্টভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন "পুনশ্চ"র প্রথম কবিতা "কোপাই"তে।

পদ্মা কোথায় চলেছে বয়ে দূর আকাশের তলায়
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্ব্বতের স্মৃতি, অপর দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

* * *

একদিন ছিলাম ওরই ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
তারপর যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

* * *

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,
তাকে সাধুভাষা বলে না।

* * *

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে

আষাঢ়, ১৩৪৮

পার হয়ে যাবে গরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

এই উদ্ধৃতি থেকেই গদ্য কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিমত খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর লেখা আগের কবিতায় তিনি একটা আভিজাত্য স্বীকার করছেন: ছন্দ, মিল আর কাব্যিক কথার অলঙ্কারে ঝলমল করে তার অঙ্গ। আর তা ছাড়া সে কবিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবিতা—আভিজাত্যের অভিমানে সে নিঃসঙ্গ। অপরদিকে গদ্য কবিতার নিরভিমান রূপ, "তার ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা," তার নেই ছন্দের জাঁক-জমক। আর তার গোত্র-গরিমা নেই বলেই মেলামেশা সকলের সঙ্গে। তাঁর পূর্ব্ব কবিতার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচিত, তার কৌলীন্য আছে, চলতি পৃথিবীকে আমল দেয় না, সৌখিন তার বক্তব্য। আর গদ্য কবিতা ভবঘুরে কুকুর, ছেঁড়া কাঁথা, বা মাসিক তিন টাকা বেতনের পণ্ডিতকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না। পদ্মা হল তাঁর পূর্ব্ব কবিতার প্রতীক, আর কোপাই গদ্য কবিতার।

গদ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই মধ্যবিত্তকে গ্রহণ করতে চান, প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই। দৃষ্টিভঙ্গির একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ। এই দৃষ্টি পরিবর্ত্তনের কারণ অন্বেষণই আমার উপস্থিত উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ দুটো সময়ে গদ্য কবিতার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন—"লিপিকা" এবং "পুনশ্চ"। "লিপিকা"র প্রকাশ তারিখ ১৯২২-২৩ আর "পুনশ্চ"র ১৯৩২-৩৩। আমাদের দেশের ইতিহাসে এ দুটো সময়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল ১৯১৯ থেকে মার্চ্চ ১৯২২ পর্য্যন্ত গান্ধিজী প্রথম অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালান। তারপর আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেকদিনের মন্থরতা এল। ১৯২৯এর শেষ নাগাদ গান্ধিজী আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করলেন। এই আইন অমান্য চলেছিল অনেকদিন ধরে, এবং ক্রমশঃ রীতিমত ব্যাপক হয়ে পড়ছিল। দু-দুটো গোল

টেবিলে যখন কিছু হল না, ১৯৩১এ কংগ্রেস নতুন উদ্যমে সংগ্রাম চালান। ক্রমে সমস্তটা একটা জন-আন্দোলনের রূপ পাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়, ১৯৩৪এ গান্ধিজীর সহসা নির্দ্দেশে এ আন্দোলন বন্ধ হল।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই দুটোই মূল আন্দোলন, এবং ভুললে চলবে না দুটোই বুর্জোয়া আন্দোলন। অর্থাৎ এর স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া স্বার্থ। স্বদেশী সওদাগরদল বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিল, তাই আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল বিদেশী পণ্যের বিসর্জন ও স্বদেশী পণ্যের প্রচার। তবু ভারতীয় বুর্জোয়া উভয় আন্দোলনেই খুঁজেছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তা—অবশ্য নেহাৎ র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল হিসেবেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উভয় আন্দোলনকে চালিয়েছে, তাদের প্রয়োজন ছিল অনিবার্যভাবেই। রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতায় নিম্ন-মধ্যবিত্তকে যে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন আমার মতে তার কারণ সমাজেও বুর্জোয়া চেয়েছিল নিম্ন-মধ্যবিত্তকে নিজের দলে। অর্থাৎ ১৯১৯-২২ এবং ১৯২৯-৩৪এর আন্দোলনে মধ্যবিত্তের সহায়তা ও তার ঠিক পর পরই কাব্যে মধ্যবিত্তকে গ্রহণ করা—এ ঘটনাগুলির একত্র সমাবেশ নিছক আকস্মিক নয়। তা ছাড়া বিশেষ করে লক্ষ্য করবার কথা লিপিকার সময় রবীন্দ্রনাথের কিছু দ্বিধা ছিল গদ্য কবিতা সম্বন্ধে—"ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।" তা ছাড়া এ সময়ে তিনি গদ্য কবিতার মাত্র একখানি বই লিখলেন; ১৯১৯-২২এর আন্দোলন খুব দীর্ঘও হয় নি, গভীরও হয় নি। তারপর অনেক বছর গদ্যে তিনি কবিতা লেখেন নি—সমাজে মধ্যবিত্তদের করার কিছু ছিল না বলেই বোধ হয়। তারপর "পুনশ্চ"র সময় গদ্য কবিতায় তাঁর আর দ্বিধা নেই, এবং এবার পরের পর তিনি অনেক কাব্যগ্রন্থ লিখলেন গদ্যে—"পুনশ্চ", "পত্রপুট" "শেষসপ্তক", "শ্যামলী"। ১৯২৯-৩৪এর আন্দোলন দীর্ঘ ও গভীর ছিল বলেই কি?

পরিশেষে কয়েকটি ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার মূল্য বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। সে শিক্ষা নেই, সে ধৃষ্টতাও নেই। তা ছাড়া শুধুই কতকগুলো ভাবালু বিশেষণে তাঁর মহত্ত্বকে আমি ঘোলাটে করতে চাই নে। বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে তা

মূল্যহীন এবং নির্ব্বুদ্ধির কাছে কোনো কিছুরই অর্থ নেই। আমার বিশ্বাস সাহিত্যের কাঠামো নির্দ্ধারণ করে সামাজিক অবস্থা—প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক দু'দিক থেকেই। মহৎ সাহিত্যের বিচারে তা ধরা পড়ে। কিন্তু এটা নিতান্তই উৎস নিয়ে বিচার—গুণগান বা দোষারোপ নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শুধু একটা অংশ নিয়ে মোটামুটি এই রকম একটা বিচারের কাঠামো করতে চেয়েছি। খুঁটিনাটির দিকে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকা অসম্ভব নয়। পরিসরও অল্প। তবে কাঠামোটা টেঁকসই হলেই আমার উদ্দেশ্য সফল।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

অজিত দত্ত

আগে কানু বিনে গীত ছিলো না, আর গীত বিনে ছিলো না ছন্দ। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের মত বড় বড় কাব্যও তখন আসরে গান করা হোতো, আর পড়াও হোতো সুর করে'। কিন্তু ছন্দকে সুরে ফেলার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে শব্দের নিজস্ব ওজন তাতে অনেক সময় হারিয়ে যায়। প্রাক্-রবীন্দ্র ছন্দে স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী কথার প্রকৃত ওজনের মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। যে শব্দে এক বা একাধিক যুক্ত অক্ষর আছে তার ওজন যে স্বভাবতই স্বরান্ত-সর্বস্ব শব্দের চেয়ে বেশি—সে কথা উচ্চারণ করতে যে বেশি সময় না লেগেই পারে না—এই অত্যন্ত সহজ সত্যটাই কবিরা তখন উপেক্ষা করতেন। একশো বছর আগেকার বাংলা ছন্দের সে সুরের রেশ আমাদের কানে আজও বাজছে; তাই কবিতা আমরা এখনও পড়ি সুর করে', এবং সেইজন্যই গদ্য-কবিতা আমাদের কাছে এত বিসদৃশ, এত বিজাতীয় লাগে। আমাদের পয়ার ছন্দ সেই সুরের ভিত্তির উপরই গড়া। তাই এ-ছন্দ অনেক হাল্কা থেকে অনেক ভারী ওজন সহ্য করতে পারে, সহজে ভেঙে পড়ে না; সুর তাকে টিঁকিয়ে রাখে।

অক্ষরের স্বাভাবিক মর্যাদাকে প্রথম ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে প্রত্যেক শব্দকে তার স্বাভাবিক মূল্য দিলে বাংলা ছন্দ অসংখ্য বিস্ময়কর নতুন সম্ভাবনায় ধনী হ'য়ে ওঠে। তাঁর সুদীর্ঘ কবি-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনাকে যে কতদিকে, কতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রকাব্য যে আংশিকভাবেও পড়েছে সেই তা জানে।

"ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী চরণপদ্মে নমস্কার" আজ এ কবিতার ছন্দ আমাদের কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ, চেনা। কিন্তু যেদিন এ-ছন্দ বাংলায় প্রথম লেখা হয়েছিলো সেদিন সে এনেছিলো কী অপূর্ব বিস্ময়! বাংলা ভাষাতত্ত্বের একটা অত্যন্ত সোজা কথা—যুক্ত-অক্ষরের পূর্ব স্বরকে আমরা গুরু বা দু'মাত্রায় উচ্চারণ করি—বাংলা ছন্দে সেই প্রথম স্বীকৃত হোলো। ছন্দ রচনার একটা নতুন সূত্র আবিষ্কৃত এবং প্রযুক্ত হয়ে গেলে

তারপর সেই নিয়মে নানা ছন্দ তৈরি করা সহজ। তাতে সৃষ্টির গৌরব নেই, আছে কৌশলের পরিচয়। এই জন্যই অসংখ্য ছন্দে পদ্য লিখেও সত্যেন্দ্র দত্ত কোনোদিন ছন্দ-স্রষ্টার গৌরব দাবী করতে পারবেন না, এবং রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ঋষির মত সত্যদ্রষ্টার সম্মান পাবেন।

ভেবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে যা দিয়েছেন, মাইকেলের দানের তুলনায় তা অনেক বড়। মাইকেলের আগে ছন্দ ছিলো নিয়মের অন্ধকূপে আবদ্ধ। নড়বার চড়বার তার জায়গা ছিলো না, 'আট ছয়, আট ছয়' এই ছিলো পয়ারের চাল। পর্বাংশের মধ্যে যেটুকু স্বাধীনতা, সেইটুকুই ছিলো পয়ারের সর্বস্ব। মাইকেল এসে বাঁধা যতি থেকে পয়ারকে মুক্তি দিলেন, যেখানে সেখানে যতি ফেলে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিকে তিনি টুক্‌রো করে দিলেন। যা ছিল স্থির, অনমনীয়, ঋজু, মাইকেল তাকে বাঁকালেন ধনুকের মত। পদ্যের সমস্ত পংক্তিকে বিশ্লেষণ করে মাইকেল আমাদের চোখ খানিকটা ফোটালেন বটে, কিন্তু ছন্দের ন্যূনতম পর্বাংশগুলির মধ্যেও যে কত বৈচিত্র্য আনা যায়, সেদিকে তিনি নজর দিলেন না। বাংলা কবিতায় চালের নতুনত্ব এলো, কিন্তু চলন বদলালো না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে নতুন চলন শেখালেন। সে আর আগেকার মতো ঢিমে তেতালা চলনই আঁকড়ে থাক্‌লো না। বাংলা ছন্দে এলো দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রার চলন। রবীন্দ্রনাথের এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার যে বাংলাতেও লঘু গুরুর ভেদ আছে; তবে তা সংস্কৃতের লঘু-গুরু নয়। বাংলায় আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরের ওজন বেশি নয়, কিন্তু যুক্ত অক্ষরের আগের বর্ণের ওজন ভারি। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর কাছে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোনো ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। একথা যে কত সত্য তা সত্যেন্দ্র দত্ত রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার অনুসরণ করে' তাঁর মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তরে দেখিয়েছেন।

চৌদ্দ অক্ষরে যা ছিলো শুধু পয়ার, তাকেই রবীন্দ্রনাথ ভেঙেছেন কত ভাবে। "শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে" "ছিলাম নিশিদিন আশাহীন, প্রবাসী" এরা চৌদ্দ অক্ষরেরই ছন্দ, কিন্তু তার চলনে আর জড়তা নেই, যেমন খুশি পা ফেলে সে চল্‌তে পারে। "আবার মোরে পাগল করে' দিবে

কে," চলেছে পাঁচের ছন্দে, আবার "নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি" চলেছে, ছয়ের চলনে, এম্‌নি সহস্র নতুন রূপ, নতুন গতি। পুরোনো দিনের ত্রিপদী, চৌপদী পর্যন্ত পুরোনো বেশ ছেড়ে নতুন রূপে এসে দেখা দিলো। যে ত্রিপদী ছিলো বিলাপের বাহন, পুরস্কারে সে-ই তরবারির মত তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ সম্ভব হোলো শুধু যুক্ত অক্ষরকে তার সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে।

সে কালের ছন্দের চলনে নতুনত্ব ছিলো না বলেই বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ছন্দ মার্কা মারা ছিলো। পয়ার ছিলো বর্ণনার ছন্দ, ত্রিপদী চৌপদী আরো মন্থর বলে তারা নির্দিষ্ট ছিলো বিলাপের জন্য, ভঙ্গ পয়ারে প্রকাশ করা হোতো bathos কেননা এ ছন্দ একটু বেশি ঢিলে হয়ে আবার একটু দ্রুত চল্‌তে চায়। ছন্দে বৈচিত্র্য ছিলো না বলেই এত কানুন। কোনো সত্যিকারের শিল্পীই এত সংস্কার বন্ধনের মধ্যে নিজের শক্তিকে মুক্তি দিতে পারে না। তাই ভারতচন্দ্র সংস্কৃত থেকে ছন্দ আমদানি করেছেন। ভারতচন্দ্রের সে সব ছন্দ বাংলায় অস্বাভাবিক; বাংলা ভাষার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ নেই, তাই বাংলার কবিরা তাকে গ্রহণ করলো না। আজ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে উচ্চারণকে বিকৃত না করেও বাংলায় তোটক ও ভুজঙ্গপ্রয়াত লেখা চলতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বদাই এগিয়ে চলেছেন। কোনোদিন একমুহূর্তের জন্যও তাঁর সত্যজিজ্ঞাসু মন কোথাও এসে থম্‌কে দাঁড়ায় নি। ছন্দেও রবীন্দ্রনাথের দান নিত্যই নতুন। তিনি আমাদের দিয়েছেন সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা; দিয়েছেন বলাকা, যেখানে পংক্তির নির্দিষ্টতার শাসন ভেঙে ছন্দ ভাবস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে; আর দিয়েছেন পলাতকা যেখানে সেই অসম-পংক্তির ছন্দই কাহিনীর কখনো ঢিলে কখনো দ্রুতগতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ছড়ার ছন্দের নতুন রূপ, পেয়েছি লিপিকা, পুনশ্চে গদ্য ছন্দ।

গদ্য ছন্দ যে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কত বড় দান, তা ভালো করে এখনো আমরা যেন বুঝতেই পারিনি। পদ্যের ভাষা এককালে ছিলো বাংলাভাষার এক বিকৃত রূপ। তার একটা আলাদা সুরও ছিলো। পদ্যের

আষাঢ়, ১৩৪৮।

ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ করে দিলেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষার সঙ্গে অভিন্ন। তিনিই দেখালেন, পদ্যের সংস্কারানুযায়ী syntax বিকৃত না করে, সোজা মুখের কথায়, অর্থাৎ গদ্য ভাষাতেও কাব্য রচনা করা চলে। মিল? সে তো একটা অলঙ্কার মাত্র। চল্‌তি ভাষাকে সাজাতে জান্‌লে তারও একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ আছে; সে-ছন্দ বাঁধা নিয়মের তাল মেনে চলে না। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, বরং ছন্দে যদি অনিয়মের বৈচিত্র্য আসে তবে তো ভালোই। পদ্যের বিকৃত ভাষায় কবিতা না লিখে সহজ স্বাভাবিক মুখের ভাষায় লেখ্‌বার আরো একটা সুবিধে এই যে এ-ভাষা মর্মে প্রবেশ করতে পারে সহজেই।

গদ্য ছন্দ সৃষ্টি করে' রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন আজকের দিনের কবিদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, অপর দিকে বাংলা ছন্দের সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রচুর। কাব্য হিসেবে লিপিকা-পুনশ্চ কত বড় তার বিচার ভবিষ্যতের সমালোচকদের আজন্ম সাধনায় করতে হবে। আমার শুধু মনে হয় লিপিকার প্রকাশের মত এত বড় বিপ্লব বাংলা ছন্দের জগতে আর কখনো ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

প্রভু গুহঠাকুরতা

নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমাদের চলতি ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের নতুন ব্যবস্থার পক্ষে তা হয়তো উপযোগীও নয়। কারণ নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়ে তার গীতিধর্মের দিকেই রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক। তিনি নাটকের সাঙ্গীতিক সম্ভাবনাকেই উজোড় করতে চান, অন্য সব দিকে তেমন নজর দিতে রাজি নন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে সুরু করে 'রক্ত করবী' ও 'মুক্তধারা' পর্য্যন্ত এই একই কথা। অবশ্য প্রথম নাটকগুলিতেই তাঁর নাট্যকার-প্রতিভার মূলসূত্র। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রাণী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও এমন কি তাঁর প্রতীকী নাটক 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী'তে তিনি নাটকীয় সংলাপ নিয়ে যে সব পরীক্ষা করতে চেয়েছেন তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর প্রথম নাটকগুলিতেই।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় মনের পরিচয় দেওয়া দরকার। পিরান্দেল্লো যে বলেছেন Drama is action, sir, action, not confounded philosophy"—একথা রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল কথা হ'ল হৃদয়াবেগ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নয়। কথাটা একবার ধরতে পারলে তাঁর নাটকের আঙ্গিক ও প্রসঙ্গ দুটো দিকই পরিষ্কার বোঝা যাবে। অতীত ও বর্ত্তমানের অন্য সব লেখকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ যদিও সব চেয়ে বেশী বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রধানতই গীতি-কবি; তাঁর গ্রন্থে যত গান আছে তার চেয়ে অনেক বেশী গান তাঁর মনে। এদিক থেকে তাঁর রচনা অগ্রসর হয়েছে নিজের পথে, এবং এপথ প্রচলিত বাঙালী নাট্যকারদের পথ নয়। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নাটক লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন। সাধারণ দর্শকদের জন্যে তিনি লেখেন নি, বরং একদল দর্শক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর নাট্যপ্রতিভার প্রধান পরিচয় সাঙ্গীতিক ধর্ম্মে।

ছেলেবেলা থেকেই গানের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ, গানের আবহাওয়াতেই তিনি নাটক লিখতে সুরু করেন। আর আজ পর্য্যন্ত তাঁর

নাটক প্রধানতই অগ্রসর হয়েছে এই সাঙ্গীতিক ভাবাবেগের পথে। 'নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি গানে পরিণত করলেন। এবং তাঁর সমস্ত শক্তি, কথার কাজ, উপমার দক্ষতা সব কিছুরই উদ্দেশ্য এই। এই কারণেই তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর নিজের মত কবি চরিত্র—কবির নিজের জীবনের আদর্শই নাট্যরূপ পেল তাঁর হাতে। তাই তাঁর নাটকে গান ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে।

এই তো গেল গানের কথা। এবার তাঁর দর্শনের আলোচনা করা, দরকার—জীবনকে তিনি কীভাবে দেখতে চান। 'জীবনস্মৃতি'তে 'প্রকৃতির পরিশোধ' নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কারণ তাঁর মতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হ'ল তার সমস্ত লেখা বোঝবার পক্ষে ভূমিকা। তিনি বলেন তাঁর সমস্ত লেখার মূল সমস্যা সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া। যে সময়ে তাঁর কাব্যে জীবন-দেবতার বাণী রূপ নিতে আরম্ভ করে এ নাটকটি সে সময়কার। সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বশক্তির লীলা—এই হল তাঁর বাণী; এবং এই বাণী চরম প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম নাটকগুলিতে। যেমন 'শারদোৎসব' 'অচলায়তন' বা 'ডাকঘর'। এই নাটকগুলিকে সাধারণ নাটকের আদর্শে বিচার করা চলে না। কারণ এগুলির মূল প্রেরণা সৌন্দর্য্যবোধ এবং সৌন্দর্য্য বোধের দিক থেকেই এগুলি বিচার্য্য। ঘটনার নাটক এগুলি নয়—অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাই হল এদের সর্ব্বস্ব। আধুনিক ইয়োরোপীয় নাটকেও এ ধরণের রচনা পাওয়া যায়, যেমন হাউপ্‌টমান এর Hanneles Himmelfahrt স্ট্রিন্ড্‌বার্গএর dream Play, মেটারলিঙের ব্লু-বার্ড আর ইবসেনের When We Dead Awaken. রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি ততটা রক্তমাংসের মানুষ নয় যতটা কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতীক। এরা যেন বিশ্বশক্তিরই কয়েকটি অংশ—স্থূল জড়জগতে নয়, অধ্যাত্ম জগতে ক্রিয়াশীল। এমন কি একথাও বলা চলে যে এগুলি প্রায় রবীন্দ্রনাথের হাতের পুতুল, এবং এগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ করছেন—এরা যেন বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে জড়িত মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের অসীম কৃতিত্ব এখানেই যে তাঁর প্রতীকী চিন্তাধারা নাটকের রসকে কোথাও ব্যাহত করে নি; এ চিন্তা কোনোখানেই এতখানি নির্দ্দিষ্ট হয়নি যা গল্পাংশের গতিকে

ধাধা দিতে পারে। অন্তত এই প্রথম তিনটি প্রতীকী নাট্যে—কয়েকটি ছোটো ছোটো নাটকীয় কৌশলের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দর্শকের কৌতূহল বজায় রাখা হয়েছে অপর দিকে তেমনি একটা চরম পরিণতিতেও পৌঁছুনো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকে 'ফাল্গুনী' আর একটু পরিণতি আনলো। এ নাটক নিছক ফ্যাণ্টাসি নয়। একটি বিস্তৃত রূপকের মধ্যে দিয়ে এখানে একটা বুদ্ধিগত সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে। 'ফাল্গুনী' 'রক্তকরবী' আর 'মুক্তধরা'র গূঢ় অর্থ অতীন্দ্রিয়। হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। অথবা বলা যায় যে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এ অর্থ ধরা যায় না। কারণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের সমস্ত সমস্যা থেকে এ আমাদের মুক্তি দেয়। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ হৃদয়হীন যান্ত্রিক সভ্যতার তীব্র সমালোচক হিসেবে দেখা দিলেন। 'রক্তকরবী' তার চরম পরিচয়। জড়বাদী সমাজের হৃদয়হীন কুশ্রীতার বিরুদ্ধে এই তীব্র বিদ্রূপও যে তিক্ত হয়ে ওঠে নি তার অকমাত্র কারণ রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য সুকুমার রসবোধ। তিনি যদি লুব্ধ জড়বাদকে চাবুকই মেরেছেন তবে রেশমী চাবুকই মেরেছেন। মহত্ত্ব ও প্রেমের প্রতীক হিসেবে এই নাটকে নন্দিনীর চরিত্র অতি স্পষ্ট। মানবিক বন্ধনের মায়াজালের মধ্যে দিয়ে সে যেন একটি লাল সুতোর মত চলে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন আবেদনে তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি আমাদের বোধশক্তি ও অনুকম্পার জগত অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। সভ্যতার নিষ্ঠুরতাকে তিনি হালকা করেন বেপরোয়া দায়িত্বহীন ফুর্ত্তির হাওয়ায়, মুক্তবায়ুবিহারি মুক্তমানুষের সৌরভে এবং এর জন্য একটি স্বভাবকবি ভবঘুরে সর্ব্বদাই আবিষ্কার করেন। 'ফাল্গুনী'র বাউল, 'রক্ত করবী'র বিশু পাগল, 'শরোদোৎসবে'র ঠাকুর দাদা, 'অচলায়তনে'র দাদাঠাকুর এরা এই ভবঘুরেরই বিভিন্ন রূপ। তাদের মধ্যে একরকম বেদুইন ভাব আর তাদের অন্তরে বাঁধাধরা জীবনের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা; সম্ভবতঃ তারা সবাই রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তারই এক অংশ, কারণ তারা সকলেই যৌবনের দীপ্ত উদ্দীপনা ও সহজ আনন্দে উজ্জ্বল—যে উজ্জ্বলতা অজস্র গানে গানে প্রকাশ পেয়েছে।

সুরকার রবীন্দ্রনাথ

হিমাংশুকুমার দত্ত

সুরকার (composer) হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব আমরা ক্রমশই উপলব্ধি করতে শিখছি এবং যত দিন যাবে ততই আরো বেশী উপলব্ধি করতে পারবো। কিছুদিন আগেও ওস্তাদ মহলে রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে ঈষৎ অবজ্ঞার ভাব ছিল। কিন্তু আজকাল ওস্তাদরাও মুখে অন্তত রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য মানেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের গানগুলি হয় কোনো-না-কোনো বিখ্যাত হিন্দি গানের অনুকরণে, নয় প্রচলিত রাগ রাগিণীর অনুসরণে রচিত; এই পর্য্যায়ের গানগুলো সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না কারণ তখন পর্য্যন্ত তাঁর সুরের বৈশিষ্ট্য কিছু ফোটেনি। কিন্তু প্রচলিত সুরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে নতুন ও নিজস্ব সুর সৃষ্টি করতে লাগলেন, সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর সুরের একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্য কী? তিনি আমাদের রাগ-রাগিণীর বাঁধা পথ ছেড়ে নিজস্ব সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকে নতুন নতুন মিশ্রণ ও ঢঙের প্রবর্ত্তন করেছেন। যে সময়ে তিনি এসব করতে আরম্ভ করেন সে সময়ে খাঁটি সাঙ্গীতিক মহলে এর সম্বন্ধে অবহেলা এবং বিরোধিতার ভাব ছিল, তার কারণ আমাদের প্রচলিত সুরের সঙ্গে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছিল। তখন আমাদের অনভ্যস্ত কানে যে সব সুর ভালো লাগেনি আজ কুড়ি পঁচিশ বছর পরে সে সব গান লোকের মুখে মুখে ফিরছে, এতে বোঝা যায় যে ভালো জিনিষ কখনো চাপা থাকে না, তার যোগ্য সমাদর শুধু সময়সাপেক্ষ। বাংলা দেশের বাউল ও উত্তর ভারতের ভজন গানের যে বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বও সেই সুরের। বাউল ভজন রচনা করেছেন যে সব সাধুসন্তরা তাঁরা ভাবাবেগে প্রচলিত সুর থেকে বিচ্যুত হলেও তাঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধের ফলে সেই বিচ্যুতিগুলোও শুধু যে মধুর হয়েছে তা নয়, জনসাধারণ সেগুলো সাগ্রহে মেনে নিয়েছে এবং সেগুলো স্থায়ীও হয়েছে। দাদুর একটি কথা আছে—

অনুভব জঁহাহৈ উপজৈ শবদকিয়া নিবাস।

সঙ্গীতের উৎস অন্তরের অন্তঃস্থল, রবীন্দ্রনাথ অন্তরধনে এতই ধনী যে নিত্য নতুন সুরের উৎস তিনি তাঁর নিজের মনেই পেয়েছেন।

আষাঢ়, ১৩৪৮

বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কতগুলো নতুন রাগ রচনা করেছেন। তার মধ্যে হেমন্তরাগ খুব প্রসিদ্ধ। এই রাগের জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ, আরোহাবরোহস্বরূপ স গ ম ধ ন র্স, র্স ন ধ প ম গ র স; রাগপরিচয়াত্মক স্বরবিন্যাস স গ র স, ম ধ ন র্স ন ধ প ম, গ প ম, গ র স। এটি অতি শান্তরসাত্মক রাগ। আমাদের দেশে প্রচলিত পুরোনো ধ্রুপদাঙ্গের সোহিনী রাগের সহিত রিখাব ও পঞ্চম (অবরোহণে) যোগ ক'রে এই রাগের সৃষ্টি করেছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। এবং এই রিখাব ও পঞ্চমের ব্যবহার অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে, এজন্যে এই নতুন রাগের সৃষ্টি সার্থক। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি শুনেছেন তাঁরা সুরটি বিশ্লেষণ করলে দেখবেন এতে সেই হেমন্ত রাগই রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন রাগ, রাগিণী, মেল, জাতি, আরোহ, অবরোহ, বাদী, সম্বাদী বিচার ক'রে যা সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ শুধু সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকে তাই সৃষ্টি করেছেন। ইওরোপীয় সংগীতে D Major Keyতে দু'টি sharp ব্যবহার হয়। আমাদের ভারতীয় সংগীতে কল্যাণ ঠাটে একটি কড়ি (sharp) ব্যবহার হয়। একাধিক কড়ির ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথের 'আমার একটি কথা' এই গানটিতে তিনি পাশাপাশি দুই রিখাব লাগিয়েছেন। এই দুই রিখাবের কোমল রিখাবটি আর কিছু নয়, D Major Key-র C sharp (কড়ি স)। ইওরোপীয় সংগীতপদ্ধতির এই প্রয়োগ এখানে খুবই নিপুণ। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বাউল ঢংয়ের সুর 'কবে তুমি আসবে ব'লে' এবং বিখ্যাত ভাটিয়ালি সুরের গান 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' এই দুটি গানেই আ—আ—আ ব'লে যে টান আছে তাতে স্বরোচ্চারণ সম্পূর্ণ ইওরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী। অনেকে বলতে পারেন বাউল ভাটিয়ালির সঙ্গে ইওরোপীয় ঢংয়ের সংমিশ্রণ হাস্যকর, কিন্তু গান দু'টি মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে যে এক্ষেত্রে তা তো হয়ইনি, বরং এই মিশ্রণের ফল অতি সুন্দর হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে বড় প্রতিভার নিপুণ হাতে বিভিন্ন আপাতবিরোধী জিনিষেরও মিশ্রণের ফলে নতুন সৌন্দর্য্য জন্ম নেয়।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী

প্রভাব নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে সেগুলির সমন্বয় সাধন করেছেন, এবং তাঁর সুরের অভিনবত্বের এই হচ্ছে মূল কথা। ছেলেবেলা থেকে নিজের বাড়িতে তিনি দিশি বড় বড় ওস্তাদ সকলের গানই শুনেছেন, তারপর তাঁদের পরিবারের সংস্কৃতি এতই উন্নত ছিল যে ইওরোপীয় সংগীতেও তিনি বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্ত, তাছাড়া বাউল ভাটিয়ালি ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব সুরগুলির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। এই ত্রিস্রোত গিয়ে মিশেছে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে, তাঁর মনের রসায়নে মিশে রূপান্তারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে আজকাল যাকে আমরা রবীন্দ্রসংগীত বলি। রবীন্দ্রসংগীতে এই তিনধারার কোনো ধারাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে নেই, অথচ প্রচ্ছন্নভাবে এই তিনটি ধারাই আছে। এদেরই সমন্বয়ের ফলে যে অভিনব সৃষ্টি হয়েছে সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এখানেই পরিচয়। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ব'লেই তাঁর সুরের বৈচিত্র্য এত বেশী। অবশ্য একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গান একঘেয়ে। এর মত ভুল কথা আর আর নেই। সাধারণ লোকের এরকম ধারণা হবার কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের অফুরন্ত সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যিনি প্রায় দু'হাজার গান লিখেছেন তাঁর কিছু-কিছু গান এক ঢংয়ের হতে বাধ্য; গায়ক-গায়িকারা অনেক সময় পর-পর অনুরূপ ঢংয়ের গান করেন ব'লে শ্রোতাদের মনে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথের গান একঘেয়ে। আসলে তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্য যত বেশী কোনো ভারতীয় সুরকারের রচনায় আজ পর্য্যন্ত ততটা দেখা যায়নি; তাঁর বিভিন্ন গানগুলোর সুর বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে।

একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় composer. সদারঙ প্রভৃতি প্রাচীন সুরকারদের ইওরোপীয় আদর্শে ঠিক composer বলবার উপায় নেই, কারণ তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিগুলোকে নির্দ্দিষ্টভাবে বেঁধে যেতে পারেন নি। এখন আমাদের হাতে যা প্রমাণ আছে তা থেকে তার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তাঁদের রচিত সুরগুলি এত বিভিন্ন ও বিকৃতভাবে পাই যে তা থেকে তাদের মূল রূপ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা যায় না, এবং এই বিকৃতির জন্য দায়ী আমাদের দেশের 'গায়কী' পদ্ধতি।

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই 'গায়কী' পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করেন—আমাদের দেশে তিনিই প্রথম জোর দিয়ে বলেন যে সুরকারের সৃষ্টি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়, তার উপর একচুল অদল-বদল করবার অধিকার কোনো গায়কের নেই। সুরের এই নির্দ্দিষ্ট রূপের উপর জোর দেয়াটাই composer-এর প্রথম লক্ষণ। কবির রচিত কবিতা যেমন একটি সম্পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় জিনিস, অতি বড় ভক্ত পাঠকেরও অধিকার নেই নিজের পছন্দমত কবিতার কথা বদ্‌লে নেবার, তেমনি গানের সুরও যে সুরকারের নির্দ্দিষ্ট একটি সৃষ্টি তাতে কোনো রকম অদল-বদলই চলে না এ ধারণা আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না, রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের মাথায় একথা ঢুকিয়েছেন। দশ পনেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার' ইমনকল্যাণ থেকে ভৈরবীতে পরিবর্ত্তিত হয়ে রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং 'একটা তুমি প্রিয়ে'র ঝাঁপতাল থেকে দাদরায় পরিবর্ত্তন ঘটে—সেও রেকর্ড। কিন্তু আজ রেকর্ড-কোম্পানীগুলো রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুমোদন ব্যতীত তাঁর কোনো সুর প্রকাশ করতে সাহস পায় না; সুরকারকে এতখানি স্বীকার করা রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে, এবং এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতের সুরকারদের পথ তিনিই সুগম করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যতটা সমাদৃত হয়েছে তাঁর সুর এখন পর্য্যন্ত ততটা হয়নি তার কারণ সাহিত্যের দিকে বাংলাদেশ যতটা অগ্রণী সংগীতের দিকে এখনো ততটা নয়। তবে এ-কথাও সত্য যে গত পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের আদর আমাদের দেশে অনেকটা বেড়েছে তার কারণ সংগীতরসবোধ বাঙালীদের মধ্যে বাড়ছে। এমন আশা করা অন্যায় হয় না যে কবিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান যতখানি সম্মান পেয়েছে, তাঁর সুরও একদিন ততখানি সম্মানই পাবে।

রবীন্দ্রনাথের গান

বুদ্ধদেব বসু

দ্বিতীয় সংস্করণ গীত-বিতানে রবীন্দ্রনাথের ১৪৫০টি গান আছে। এ ছাড়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'মায়ার খেলা' ও কবির আধুনিক গীতি-নাট্যগুলি মিলোলে কোন না আরো দু'তিনশো গান হবে। সব সুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দু' হাজারের কাছাকাছি ; একটু কষ্ট ক'রে কিছু গণনা করলে কয়েক মিনিটেই ঠিক সংখ্যাটি বেরিয়ে আসে।

সংখ্যা জিনিসটা তুচ্ছ নয়। মোপাসাঁ কি মোপাসাঁ হ'তেন যদি সারা জীবনে দশ-বারোটি ছোটো গল্প লিখতেন, শেক্সপিয়র যদি মাত্র তিন-চারখানা নাটক লিখতেন তাহ'লে সে-সব গল্প ও নাটক উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হ'লেও তাঁদের এই বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি কি হ'তো? কিছুতেই হ'তো না। যে-সব লেখক খুব ভালো অথচ খুব কম লিখেছেন, তাঁদের খাতির লেখকমহলে যতটা, জনসাধারণে ততটা নয়। সত্যি বলতে এ-রকম বড়ো লেখক ক'জন আর আছেন যাঁর রচনারাশি অজস্র, অন্তত প্রচুর, নয়? নেই বললেই চলে। ফরাসি প্রতীকী কবিদের মধ্যে দু' একজন আর আধুনিক ইংলণ্ডে ফর্স্টর ছাড়া চট ক'রে নাম মনে করা শক্ত। জয়স-এর একখানা বই-ই তো একশো বই। বরং এটাই দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা সর্বদাই অজস্রপ্রসবী। যে-সব কবি কম বয়সে মারা গিয়েছেন—যেমন শেলি, বায়রন, কীট্‌স্‌, হাইনে—তাঁদেরও রচনার প্রাচুর্য আমার এ-কথা প্রমাণ করে। শিল্পকলার যে-কোনো ক্ষেত্রেই এ-কথা খাটে। রাশি-রাশি ছবি আঁকেননি কোন বড়ো শিল্পী? পুরো একটি বছর ধ'রে অবিশ্রান্ত শুনলে তবে নাকি বেইঠোফেনের সমস্ত রচনা শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন আমাদের সৌভাগ্য; পৃথিবীর সৌভাগ্য। কথাটা ফাঁকা স্তুতি নয়। এর তাৎপর্য এই যে তিনি জীবনের প্রতিদিন বেড়েছেন, এখনো বাড়ছেন। পঞ্চাশ বছরে তাঁর জীবন শেষ হ'লে তিনি এত বড়ো হতেন না, যাট কি সত্তরে হ'লেও না। গত দশ বছরেই কি তিনি কম নতুন উপঢৌকন দিয়েছেন তাঁর দেশকে, এই জগৎকে। যেমন বিচিত্র তেমনি

মহামূল্য সে-সব উপহার। এখন তাঁর শরীর জীর্ণ, কিন্তু মন অক্লান্ত, বুদ্ধি বিশ্রামবিমুখ। গান্ধিজির কথা যদি সফল হয়, যদি তিনি শতজীবী হন তাহ'লে আরো অনেক জিনিস তাঁর কাছ থেকে পাবো তাতে সন্দেহ নেই। তা-ই যেন হয়।

এ-রকম ধাত সব কবির হয় না। শেক্সপিয়র জীবনের শেষ ক'বছর কলম ছুঁয়েছেন এখন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ শেষ জীবনে যা লিখেছেন না-লিখলেই ভালো ছিলো। রবীন্দ্রনাথ চির নবীন, চির অক্লান্ত, বিশ্রামের প্রয়োজন তাঁর নেই, কারণ কাজই তাঁর আনন্দ, আনন্দই কাজ। দুঃসহ রোগের কাছেও হার মানেননি, রোগশয্যার শুয়ে-শুয়েও কবিতা লিখেছেন। প্রতি মাসে তাঁর নতুন বই বেরুচ্ছে। নতুন বই, তাছাড়া নতুন রকমের। হ্যাভলক এলিসকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এত কাজ করবার সময় আপনি কখন পান?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন 'কাজ? কাজ তো আমি কখনো করিনে, এ তো আমার খেলা।' রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই। শিশু খেলা করে, সেই খেলাই তার সৃষ্টি। মেয়েরা সংসারের কাজ করে, সে-কাজে তারা নিজেদের ফোটায়। আপিসের আইন-মাফিক ঘড়িধরা কাজে বিরাট গাম্ভীর্য, তাই অসীম ক্লান্তি। লেখায় ছবিতে গানে রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত খেলা। তাই তিনি অক্লান্ত। তাঁদের জীবনই ধন্য যাঁরা কাজ করেন না, সৃষ্টি করেন, অতএব খেলা করেন। সব চেয়ে ধন্য তাঁদের জীবন যাঁরা একটার বেশি খেলা জানেন, অর্থাৎ একাধিক শিল্পের যাঁরা অধিকারী। যেমন রবীন্দ্রনাথ। শেষ বয়সে ছবি এঁকে তিনি কী আনন্দই না পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শেখালেন ছবি দেখতে, ছবি বুঝতে।

তবে এটা বোধ হয় সত্য যে কবির গানের ফসল ফুরিয়েছে। কথাটা লিখতে শুনতে ভাবতে কষ্ট হয়, কিন্তু 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' কি 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' এ-সব গানের পরে আর গান হয়নি, তাঁর গানের যাঁরা ভাণ্ডারী তাঁদের মুখে এই রকমই শুনেছি। বহু ও বিচিত্র প্রতিভার মধ্যে যে-প্রতিভা তাঁর নিজের সব চেয়ে প্রিয়, তার উৎস কি রুদ্ধ হ'লো এতদিনে? তাঁর বিচিত্র ও অজস্র রচনাবলীর মধ্যে যে-রচনা সব চেয়ে অতুলনীয়, সব চেয়ে স্থায়ী, তার ভাণ্ডার আর কি বাড়বে না? অবশ্য প্রায় দু'হাজার গান যিনি

দিয়েছেন তাঁর আর না-দিলেও বোধ হয় চলে, কিন্তু মানুষের লোভ অপরিসীম, এত পেয়েও আক্ষেপ থাকে আরো কেন হ'লো না, হ'তে তো পারতো।

নিঃসন্দেহে বলা যায় গানের ক্ষেত্রে বিশ্বে অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথ। এখানে দেশে ও বিদেশে অতীতে ও বর্তমানে কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে না। এক হাতে এত গান, এত ভালো গান, এত রকমের গান কখনো বাঁধেননি জগতের আর-কোনো কবি। এক রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে বাংলা ভাষা এ-বিষয়ে আজ পৃথিবীতে অগ্রণী। তুলনায় এত বড়ো জাঁকালো ইংরেজি সাহিত্যও কী দরিদ্র! স্বয়ং শেক্সপিয়র গান বেঁধেছেন, আশ্চর্য সে-গান, কিন্তু সংখ্যায় আর ক'টি! দুটি মৃত্যুর, দুটি প্রেমের, একটি বসন্তের ও একটি শীতের গানেই প্রায় পুঁজি শেষ। অত বড়ো কবিত্বশক্তির গানে কী কৃপণতা! তার কারণ গান বাঁধবার স্বাভাবিক প্রতিভা শেক্সপিয়রের ছিলো না, তবে তিনি জাত-কবি ছিলেন ব'লে নাটকের জন্য যে-ক'টি গান লিখতে হয়েছে সে ক'টিই অসাধারণ উৎরে গেছে। বেন জনসন-এর দু'একটি ও অন্যান্য এলিজাবীথানদের কিছু গান আছে যা এখনো পড়া হয়, গাওয়া হয় ও কাব্যসংগ্রহে স্থান পায়, তবে সংখ্যায় তা এতই অল্প যে ইংরেজের মতো দাম্ভিক জাতও তা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পায় না। বর্ন্‌স্‌-এর অবশ্য সাঙ্গীতিক প্রতিভাই ছিলো, তাঁর স্কচ গানগুলি সুন্দর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এক মুঠো। গিলবর্ট-ও'সুলিভনের অপেরার গানগুলি নিয়ে ইংরেজরা মাতামাতি করে, কিন্তু সে-গান, আজকের দিনের নোএল কোআর্ডের গানের মতো, কাব্য হিসেবে অনেকখানি নিচু স্তরের, তা ছাড়া তার মনোভাব এমনই খাস ইংরেজ যে অনিংরেজের পক্ষে তা থেকে কোনো রস পাওয়া অনেক সময়ই শক্ত; গানের বিশ্বজনীন গুণটিই তাতে নেই। তা ছাড়া মিউজিক হল্‌-এর কি আজকালকার ফিল্‌মের যে-সব চলতি 'জনপ্রিয়' গান, সে-সম্বন্ধে কিছু না-বলাই ভালো, কাব্য হিসেবে সেগুলো গণ্যই নয়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ইংরেজদের খ্যাতি অবশ্য কোনোকালেও নেই। ইওরোপের অন্যান্য দেশে, ইতালি, জর্মানি, ফ্রান্স, স্পেনে নানা সময়ে এমন

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

অনেক কবি জন্মেছেন যাঁরা গান লিখেছেন, এমন অনেক সাঙ্গীতিক জন্মেছেন যাঁরা সুরের উপযোগী কবিতা রচনা করেছেন। শোপ্যাঁ ও মোৎসার্ট নিজেরা গানও বেঁধেছেন, বেইঠোফেনেও মাঝে-মাঝে বাণীসংগীত আছে, তবে ইওরোপীয় ধ্রুপদী সংগীত প্রধানত যন্ত্রনির্ভর ব'লে এ-সব গীতস্রষ্টাদের গলার গানের উপর বেশি ঝোঁক ছিলো না। বাণীপ্রধান গানের চর্চায় বোধ হয় ইতালি ইওরোপে অগ্রণী; প্যালেস্ট্রিনা, যাঁকে আধুনিক ইওরোপীয় সংগীতের প্রবর্তক বলা হয়, তাঁর অনেক গানই আজো অম্লান আর ইতালির ক্লাসিকাল অপেরা তো সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রসিদ্ধ। তবু কোনো একজন মানুষ এত বেশি, এত ভালো ও এত রকমের গানের জন্ম দিয়েছেন, এ-ঘটনা আগে কখনো ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। এখানে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরাট কবিপ্রতিভা ও গীতপ্রতিভার যে-অদ্ভুত মিলন হয়েছে, এ মিলনই বোধ হয় এর আগে কোনো মানুষে কখনো হয়নি। এত বড়ো কবি গান গেয়েছেন কবে, আর-কোন দিগ্বিজয়ী কবিপ্রতিভা গান বাঁধবার নেশায় ক্ষেপেছে! এ দুয়ের সম্মিলন হয়েছে, এমন আর যে ক'জনের কথা মনে করা যায়, সকলেই ছোটো কবি। গানে তাই রবীন্দ্রনাথ রাজা, এ তাঁর এমন সৃষ্টি যেখানে কোনো প্রতিযোগী নেই। কবিতায় গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে সমালোচনায় তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন, নানা দিক দিয়ে তাঁর তুল্য অনেকেই; গানে তাঁর মতো কেউ নেই। গান তাঁর সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট সৃষ্টি; সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে গানগুলি সব চেয়ে রাবীন্দ্রিক।

না-বললেও চলে, তবু পাছে কোনো অতি সতর্ক পাঠক ভেবে বসেন যে আমি অনধিকারচর্চা করছি সেইজন্যে এখানে ব'লে রাখি যে গানের যেটা কবিতার দিক এখানে তারই শুধু আলোচনা হচ্ছে। বাংলা গান বাণীপ্রধান, আপনি যতই সুরজ্ঞ হন, বাংলা গান শুনতে হ'লে কথার দিকে কিছু মন না-দিয়ে উপায় নেই, এবং কথা খারাপ হ'লে উপভোগে কিছু অন্তত ব্যাঘাত যার না হয় বলতেই হবে তার অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত নয়। সেইজন্যে বাংলা গানের ভালো কবিতা হওয়া দরকার। বাংলা গান এমন হওয়া উচিত যা

ছাপার অক্ষরে প'ড়েও ভালো লাগে। এ রকম কিছু গান লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম—তাঁদের সুখ্যাতি নিশ্চয়ই করবো ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানের ছলে কাব্যের যে চোখ-ধাঁধানো, প্রাণ-কাড়ানো হিসেব-হারানো ঐশ্বর্য আমাদের ঘরের আঙিনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার কথা আমরা কী বলবো ? এ-গানগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা, রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। আশ্চর্য এই যে দেড় হাজার দু'হাজার গানের মধ্যে প্রায় প্রতিটিই কবিতা হিসেবে সার্থক, বেশির ভাগই অনিন্দ্য। সম্প্রতি তিনি তাঁর অনেক কবিতায় সুর দিয়েছেন, সেগুলি গীত-বিতানে স্থানও পেয়েছে ; এ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে তিনি নিজের মনে তাঁর গানে ও গীতিকবিতায় জাতের কোনো তফাৎ মানেন না, যদিও এখন পর্যন্ত তাঁর নিজের কোনো কাব্যসংকলনেই এমন কোনো রচনা স্থান পায়নি যা নিছক গান।

রবীন্দ্রনাথ যে গীতিকবি হিসেবেই সব চেয়ে বড়ো এ-কথা আজকাল সবাই মানেন , আমি এতে আরো একটু যোগ করতে চাই, বলতে চাই যে তাঁর লিরিক প্রতিভার চরম ব্যঞ্জনা তাঁর গান। কেন তা বলি। রবীন্দ্রনাথের মন স্বভাবতই দুর্বার-উচ্ছ্বাসী, উতরোল বাণী-বন্যায় তিনি নিজেই অভিভূত, ফলে কবিতাগুলি প্রায়ই তাঁর একটু বেশি দীর্ঘ হবার দিকে ঝোঁকে। লোকেন পালিতের প্ররোচনায় কোনো-কোনো কবিতার কিছু অংশ বাদ দেয়ায় কবিতাগুলির লাভই হয়েছিলো, পরবর্তী অনেক কবিতা অতি-দীর্ঘতার জন্য হয়তো একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এ-কথা 'রচনাবলী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে আমি লিখেছিলাম। এ-কথাও উল্লেখ করেছিলাম যে ক্ষুদ্র পরিসরে কবিতা লিখতে রবীন্দ্রনাথ কখনোই আরাম পাননি, তাঁর মেজাজই সে-রকম নয়। ব্যতিক্রম শুধু গান—যেখানে কথার স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ করেছে সুরের বিস্তার। এ-কথা ঠিক যে সুরের সাহায্য পেয়েছেন ব'লেই ও-রকম অতি আশ্চর্য গীতিকবিতা রাশি-রাশি সৃষ্টি করতে তিনি পেরেছেন, কিন্তু সুর ছেড়ে দিলেও, এমনকি পদ্যের ছন্দ বাদ দিলেও রচনাগুলো যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ তো ইংরেজি গীতাঞ্জলি। অমন ক্ষুদ্র, আপাতত অমন সুকুমার ঐ রচনাগুলির মধ্যে কী শক্তি ছিলো যাতে ইএট্‌স্ ওর পাণ্ডুলিপি পকেটে ব'য়ে বেড়াতেন, আর

বাস্-এ ব'সে ভয়ে-ভয়ে বা'র ক'রে পড়তেন, পাছে কেউ লক্ষ্য করে তিনি কতটা অভিভূত হয়েছেন।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র আমি ভক্ত, তাকে অনুবাদ-সাহিত্যের একটি মিরাকল্ মনে করি, কিন্তু তার আলোচনা এখানে করবো না। আমার এতটা যখন সৌভাগ্য যে বাঙালি হ'য়ে জন্মেছি, আমি যে-ভাষায় কথা বলি রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষায় লেখেন, তখন তার দরকারও করে না হয়তো। ইংরেজি গীতাঞ্জলির উল্লেখ করতে হ'লো শুধু এ-কথা বোঝাতে যে রবীন্দ্রনাথের গানের মহিমা ওর অন্তর্নিহিত কবিত্বেই যা অনুবাদের অগ্নি-স্নান পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। তবে বাংলা না-জানলে, বাংলায় না-পড়লে রবীন্দ্রনাথ কিছু পড়াই হয় না, যতবার তাঁর গানের বই খুলি ততবার এ-কথা মনে হয়। হয়তো যে-কোনো কবিকেই নিজের ভাষায় না পড়লে ঠিক চেনা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো যে-সব কবির ধ্বনির বিচিত্র ব্যবহারের উপরেই নির্ভর তাঁদের পক্ষে এ-কথা খুব বেশি ক'রে সত্য। রবীন্দ্রনাথের গানে রচনার কলাকৌশলও পরম বিস্ময়ের। আমরা সকলেই জানি যে তিনি perfection-পূজারী কবি নন, গ্রীকদের মতো কবিতা লেখাকে তিনি নিছক কারিগরি মনে করেন না, কাব্যের শরীরকে নিখুঁত করবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করা তাঁর প্রকৃতিগত নয়; তিনি বরং শেক্সপিয়রের মতো উদ্দাম, সমারোহময় রোম্যান্টিক—আবেগের টানে যা-কিছু কলমে আসে, সবই রাখেন, কিছু ফেলেন না, ভাষার বর্ণিল, ইন্দ্রজালে নিজেও সম্মোহিত হন, অন্যকেও করেন—কোথায় প'ড়ে থাকে সুমিতির প্রচলিত আদর্শ! শেক্সপিয়রের মতো, রবীন্দ্রনাথেরও মহত্ত্ব একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থে বা কবিতায় নয়, বিশ্লিষ্ট কাব্যাংশে, আবার কোনো বিশেষ একটি গ্রন্থে নয়, রচনার সমগ্রতায়। শেক্সপিয়রের এমন কোনো নাটক নেই যাতে সূক্ষ্ম বিচারে নানারকম খুঁত ধরা না পড়ে, রবীন্দ্রনাথের খুব বিখ্যাত কবিতাগুলি থেকেও ছিদ্রান্বেষীর পক্ষে খুঁত খুটে আনা সম্ভব। কিন্তু উভয় কবিতেই দীপ্যমান অংশগুলি এমনই জ্যোতির্ময় যে সমালোচকের মুখ প্রায়ই বন্ধ। কিন্তু সমালোচককে মুখ খোলবার কোনো সুযোগই দেবে না রবীন্দ্রনাথের গান। গানগুলি যে-কোনো অর্থেই নিখুঁত। এমন একান্ত সরল, ঋজু, জাদুকর

ভাষা রবীন্দ্রনাথও আর কোথাও ব্যবহার করেন নি। এত বিচিত্র ছন্দ, এমন চমক-লাগানো অভিনব মিল, এমন ললিত মধুর অনুপ্রাস তাঁর কবিতায় নেই। অথচ পড়বার সময় কখনো এমন মনে হয় না যে এগুলো কবির কারিগরি, মনে হয় সবই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, মনে হয় ছন্দ মিল অনুপ্রাস সব নিয়ে সম্পূর্ণ রচনাটি একটি সম্পূর্ণ ফুলের মতো আপনিই ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সব গানেই এই একটি আত্মজ ভাব ভরা পড়ে, ওরা যেন একটা জৈব পদার্থ, কারো রচিত নয়; জীবজগত উদ্ভিদজগতের অফুরান বিচিত্রতার মতো ওরা শুধু আছে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নেই। কলাকৌশল এত ও এতরকমের যে গুনে শেষ হয় না। মিল, মধ্য-মিল, অর্ধ-মিল, স্বর-মিল—সদ্যোজাত অপূর্ব সে-সব মিল—শুধু মিলের আলোচনাতেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। আবার মিল নেই এমন গানও আছে; সংস্কৃত-বহুল গাম্ভীর্য থেকে একেবারে মুখের ভাষার স্বচ্ছ সরলতা পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সম্ভব এমন-কোনো আলো-ছায়ার খেলা নেই, যা ধরা না পড়েছে তাঁর গানে; চায়ের গানের মতো যেন বাজী ধ'রে লেখা স্রেফ কারিগরির রচনাও আছে, যদিও সংখ্যায় নগণ্য; 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'-র মতো তরল শিশু-ভাষা থেকে 'অহো এ কী নিদারুণ স্পর্ধা, অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা!-'র মতো অসম্ভব যুক্তাক্ষর পর্যন্ত সব রকম কথা, সব রকম ধ্বনিবিন্যাস অনায়াসে বসেছে। ছন্দের বৈচিত্র্যের তো শেষ নেই। যে-তিনমাত্রার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তার নানারকম রূপের ব্যবহার গানে পৌনঃপুনিক, আছে ছড়ার ছন্দ, আছে পয়ার, আছে ছন্দের নানা নতুন ঢং। গল্প শুনেছি রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ ছন্দ ছাড়া যে-কোনো ছন্দ বাংলা ভাষায় আনা যায়। এণ্ডরুজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একটি গ্রীক কবিতার দুটি চরণ আবৃত্তি করে জিজ্ঞেস করেন এ-ছন্দ বাংলায় আনা সম্ভব কিনা। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি আর একবার মন দিয়ে শোনেন, আর একটু পরেই সেই গ্রীক ছন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব'লে ওঠেন: 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো।' মনে হয় বাংলা ভাষায় পদ্যের ছন্দে যত রকম আওয়াজ যত রকম সুর বের করা সম্ভব সব তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছেন তাঁর গানে। কলাকৌশল বিস্ময়কর, কিন্তু চায়ের

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

গানের মতো দু'একটি ঈষৎ লঘু রসের রচনা ছাড়া কোথাও মনে হয় না কোনো কৌশল আছে, মনে হয় এরা আপনিই হয়েছে, বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন ভঙ্গির মতো একটি আদিম অনির্বচনীয়তা নিয়ে এরা কাছে এসে দাঁড়ায়। আমার মনে হয় এখানেই কবিতার উপর গানের জিৎ। কবিতা যত ভালোই হোক্ তার কলাকৌশল দেখতে পাই, কলকজাগুলোর নামও জানি, কবি কী করতে চেয়েছেন ও কী করেছেন তা বুঝতে পেরে তাঁর দক্ষতার তারিফ করি শতমুখে, কিন্তু গানে—রবীন্দ্রনাথের গানের মতো গানে—সমগ্র জিনিসটি এক ধাক্কায় এক সঙ্গে হৃদয়ে এসে ঢোকে, ব্যাপারটা কী হলো তা বোঝবার সময় পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ কবিতা ব'লে কিছু যদি থাকে তা এই গান।

শুধু একটি আবেগ বহন করে, শুধু বিশেষ একটি ব্যাকুলতা মনে জাগায়, এ গানগুলি এই জাতের রচনা। কিছু বলে না, অথচ সবই বলে। এমন বিশুদ্ধ আবেগ যে ভাষায় সম্ভব তা কি আমরা কখনো জানতুম। সংগীতের কাজ করিয়ে নিয়েছেন ভাষাকে দিয়ে, এত বড়ো শিল্পী তিনি। আমরা জানি সংগীতেরই ক্ষমতা আছে আমাদের মনের সেই প্রদেশ স্পর্শ করবার, যা সব চেয়ে গহন, নিভৃত ও দুর্গম, গদ্যের যা অনধিগম্য, কাব্য যার প্রান্তটুকু মাত্র কখনো ছোঁয় কখনো ছোঁয় না; যে কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে হারিয়ে যায়, ঘুম আর জেগে-ওঠার মধ্যে উজ্জ্বল অলীক সেতু রচনা করে, যে-কথা মনে হয় যেন কতকাল আগে কোথায় শুনেছিলাম, যা ছায়াময়, সূক্ষ্ম-বিসর্পিত, অস্পষ্ট-স্মৃতি-বিজড়িত, সে-কথা এক সংগীতই আমাদের শোনাতে পারে—এ-কথা আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাষায় শুনিয়েছেন সে-কথা: কাব্যের স্বাদে যে অভ্যস্ত, তার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা যতখানি রোমাঞ্চকর, তাঁর গান পড়া তার চেয়ে কম নয়; তাঁর গান পড়তে-পড়তেও সেই রহস্যময় জগতের দুয়ার খুলে যায় যা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে, অথচ দৈনন্দিন জীবনে যাকে প্রায়ই ভুলে থাকি। আমার নিজের কথা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের তিন-চারটির বেশি গান আমি এক সঙ্গে পড়তে পারিনে, হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হয়, গলা যেন আটকে আসে।

রবীন্দ্রনাথের গানে তত্ত্ব আছে, চিত্র আছে অসংখ্য, আছে প্রেম, দেশপ্রেম

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

কি ভক্তির মতো নির্দিষ্ট ভাব কিন্তু আমার মনে হয় সে-সমস্তই উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। বিশুদ্ধ আবেগের জগতে আমাদের পৌঁছিয়ে দেবার নানা রাস্তাই তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে যে-পথ সব চেয়ে সরল ও ঋজু তা প্রকৃতি কিংবা ঋতুচক্র। ব্রহ্মসংগীত যেমন সব চাইতে অ-রাবীন্দ্রিক, তেমনি ঋতুর গানগুলো রাবীন্দ্রিক সৌরভে সব চেয়ে বেশি ভরপুর, সেখানে প্রতিটি কথার চরম ব্যঞ্জনা নিষ্কাষিত। এই গানগুলো আমাদের সমস্ত জীবন অধিকার ক'রে আছে; প্রতিদিনের জীবনে কতবার যে নতুন ক'রে নানা গানের নানা চরণ মনে পড়ে, নতুন ক'রে তাদের উপলব্ধি করি, তার কি অন্ত আছে। আকাশে মেঘ করে, নদীতে ছায়া পড়ে, একা চাঁদ আকাশ পাড়ি দেয়, হাওয়ায় গাছের পাতা দোলে, হঠাৎ একটু লাল রোদের ফালি ঘরে এসে পড়ে, সূর্যাস্ত আকাশে সোনা ছড়ায়, আবার শীত সন্ধ্যার শূন্যতা আকাশকে রিক্ত ক'রে যায়—যখন যা কিছু চোখে পড়ে, যা-কিছু মন দিয়ে ছুঁই সে-সমস্তই বয়ে আনে রবীন্দ্রনাথের কত গানের কত বিক্ষিপ্ত চরণ। তাঁর গান মনে না ক'রে আমরা দেখতে, শুনতে, ভালোবাসতে, ব্যথা পেতে পারি না, আমাদের নিগূঢ় মনের বিরাট মহাদেশের কোথায় কী আছে হয়তো স্পষ্ট জানিনে, তবে এটা জানি যে সে-মহাদেশের মানচিত্র আগাগোড়াই তাঁর গানের রঙে রঙিন।

আরোগ্য

সুধীরচন্দ্র কর

সকালের কাঁচা রোদ পড়েছে দুয়ারে এসে লুটে,
নাম না জানিয়ে কে-যে ফুল রেখে গেছে পত্রপুটে।
পাখিগুলি কিচিমিচি লাগিয়েছে চাতালের 'পর
ঘরের কুকুর 'লালু' দোরে তোলে ঘেউ ঘেউ স্বর।
দেখা দেন 'দিদিমণি' প্রাতঃরাশ-পাত্রটি হাতে,
মূর্ত মায়ের স্নেহ, কুশল-প্রশ্ন আঁখিপাতে!
গৃহ-বারান্দায় হোলো লেখার টেবিলখানি ফেলা,
ডাক এল বাহিরের, চিঠিপত্র এসে গেছে মেলা;
উত্তর অপেক্ষি' তাতে মানুষের বিচিত্র জিজ্ঞাসা,—
রাগে অনুরাগে সে যে মানুষেরি জ্যান্ত ভালোবাসা।
সাজানো সরঞ্জাম, প্রস্তুত প্রভাতী কফি পান;
পত্রিকা এনেছে বার্তা কী ঘটালো নাৎসি ও জাপান!
একদিকে বিশ্ব বহে রুগ্নতার কালোরাত্রি-ছায়া,
এদিকে আরোগ্য বহি' রবি-লেখা মেলেছে কী মায়া!
সে লেখা উদ্ভাসি' তোলে চলমান জীবনের ছবি,
দিন আছে, রাত্রি আছে,—সব নিয়ে আছে এক কবি।
তাহারি আহ্বান বাজে প্রাণবাহী বাতাসের বীণে;
মৃত্যু হতে জন্ম চলে প্রতিদিন নব জন্মদিনে॥

রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি ত' ছিলাম ঘুমে ;
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে।
চল রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন- রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে ॥

চমকি' উঠিনু জাগি' ;
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও ,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য্য তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে ;
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা, ঊষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ-বৈরাগিণী ,
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জলে,
কূল হ'তে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কা'র
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে ।

প্রথম প্রকাশিত : "সবুজপত্র" ।
"আধুনিক বাংলা কবিতা" থেকে সংকলিত ।

রবীন্দ্রনাথের নতুন বই

• রোগশয্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৲ ও ৪৲

আরোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৲ ও ৪৲

'কিছুদিন থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্যে যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে।'

বাংলা কবিতায় শত সুর লাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এ দুটি বইয়ে আরো একটি নতুন সুর লাগালেন। রোগ পরাজিত মহাকবির কাছে, কায়িক ক্লেশ লজ্জিত। মনীষীর মনও তাঁর দেহের দাস, এই আমরা জানি ; দেহ বিকল হ'লে মন তার স্বাধীনতা হারিয়ে যন্ত্রণার ক্ষুদ্র কেন্দ্রেই ঘুরে মরে, সেখানে সাধারণ লোক ও প্রতিভাবানে প্রভেদ নেই। প্রভেদ নেই এটা হ'লো বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ের কথা, কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখতে পাই প্রতিভাবানের কী আশ্চর্য ক্ষমতা রোগের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে লড়বার। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ যে-দারুণ রোগে পড়েছিলেন, যার জের এখনো টানছে তাঁর দেহ, আমরা ভাবতে পারিনে সে-রোগের যন্ত্রণার পরিধি কাটিয়ে কোনো মানুষের মন উঠতে পারে। কিন্তু যে-সময়ে সমস্ত দেশ তাঁর কুশলজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল, ঠিক সেই সময়েই রোগশয্যায় শুয়ে তিনি একটি দুটি ক'রে ছোটো-ছোটো কবিতা রচনা করছিলেন। 'রোগশয্যায়' ১৯৪০-এর নবেম্বর-ডিসেম্বর ও 'আরোগ্য' ১৯৪১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে লেখা—তাঁর রোগভোগের সময়ে ও তারই অব্যবহিত পরে। এ দুটি বই আসলে একটি বইয়েরই দুটি খণ্ড, একসঙ্গে না পড়লে সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করা যাবে না।

রোগযন্ত্রণাকে হার মানিয়েছে কবিপ্রতিভা,' এ দুটি বই শুধু এই কারণেই উল্লেখযোগ্য হ'তে পারতো, কিন্তু তা নয়। এরা নিজস্ব দীপ্তিতেই উজ্জ্বল। এতে রোগযন্ত্রণার কথা, রোগীর দুঃসহ নির্জনতার কথা আছে, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিবাহপ্রস্তাব তাও আছে—

'মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে জীবনের বন্দনা, ব্যথার বাঁশিতে আনন্দগানই বেজে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে-নির্মল প্রসন্নতা আছে তা থেকে তাঁর চোখ ফেরে না, মন ফেরে না। এ-কবিতাগুলিতে তাই রোগদুঃখভোগের কথা থাকলেও রোগের মলিনতা নেই। রোগ বিষয় নয়, জীবনের উজ্জ্বলতাকে আরো স্পষ্ট ক'রে তোলবার কালো দৃশ্যপট। 'আরোগ্যে'র প্রথম কবিতা :

'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'

আবার কয়েক পাতা পরেই :

'বলে, আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি'
বলে, ধন্য আমি।'

এই তো রবীন্দ্রনাথের চিরকালের বাণী। পৃথিবীকে ভালোবাসেন, প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, মানুষকে ভালোবসেন, এ-কথা কতবার কত রকম ক'রে বললেন, তবু বলা ফুরুলো না। কী ক'রে ফুরোবে? যে-প্রণয়ীযুগল চির-নবীন চির-নববিবাহিত তাদের প্রণয়ভাষণের কি শেষ আছে! মানুষ নিজে প্রেমে পড়লে যেমন অন্যের লেখা প্রেমের কবিতা যথেষ্ট মনে হয় না, তেমনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিদিন তাঁর নিজের রচনাই মনে হয় অসম্পূর্ণ, নতুন ক'রে আবার বলেন, 'তোমাকে ভালোবাসি।' এই পৃথিবী থেকে ছন্দে গানে তিনি বিদায় নিচ্ছেন 'পূরবী' লেখবার সময় থেকে—বিদায়ের শেষ কথা আজও কি বলা হ'লো! প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায় নেবার মতোই দীর্ঘ করুণ মধুর সুন্দর এ-বিদায়। আজ তিনি প্রস্তুত, তবু বেলাশেষের ম্লান আলোতেও নির্নিমেষ নয়নে দেখছেন প্রিয়তমার মুখশ্রী; সেই চির পুরানো যে এখনো এত নতুন তা কি তিনিই জানতেন!

অসুস্থ দেহের সঙ্গে প্রচণ্ড জেদ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আজকাল কবিতা লেখেন, তাতে তাঁর কষ্ট হয়—

'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।'

'অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কান্না।'

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

আমাদের ভাষায় যিনি বাণীমূর্তি, এই 'ক্লিষ্ট রচনার প্রয়াস' হয়তো তাঁকে ব্যথিত করে। তাই তাঁর বিনয় কত। 'রোগশয্যায়'-র উৎসর্গ-কবিতায় লিখেছেন—

'রোগের সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে
রেগে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।'

শেষের পংক্তিতে হয়তো বলতে চেয়েছেন এই প্রথম তাঁর লেখনী অপটু হ'লো। তারপর ঐ গ্রন্থের প্রথম কবিতা তাঁর অ্যাপলজি। মুহূর্তকাল তাল কাটলেও উর্বশীর ক্ষমা নেই ইন্দ্রের সভায়। মানুষও ক্ষমা করে না কবির ক্ষণিকতম ক্ষুদ্রতম ত্রুটি।

'তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।'

তবে খ্যাতির অসারতা তিনি জেনেছেন, লোকমতের কথা আর ভাবেন না।

'খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি' সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয় ;
নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।'

কবির দিক থেকে এ-কুণ্ঠা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এ-বই দুটির বিশিষ্ট স্থান, তার কারণ প্রধানত আঙ্গিকের। কবিতাগুলি ক্ষুদ্র ও সংহত, এবং এ-হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যশরীর থেকে একটু স্বতন্ত্র। যৌবনে তিনি সনেট লিখেছেন, কিন্তু লিখে খুশি হ'তে পারেন নি, 'কণিকা' লিখেছেন, কিন্তু 'কণিকা' তো কবিতা নয়, পদ্যে বাঁধা উজ্জ্বল aphorism ; ছোটো কবিতা তাঁর প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায়নি, অবশ্য গান বাদ দিয়ে বলছি। বিশেষণ, উপমা ও রূপকের সমারোহই তাঁর কবিতার

বিশেষত্ব। এ-সমারোহ আছে 'পূরবী'তে, 'মহুয়া'য়, এমনকি কবির ১৯৩৮-এর অসুখের পরে লেখা 'প্রান্তিকে'ও। এ দুটি বইয়ে কোনো সমারোহ নেই; এগুলি সাত্ত্বিকভাবের রচনা, ক্ষুদ্র পরিসরে নিরাভরণরূপে দেখা দেয়, অল্প কথা কথা ব'লে চ'লে যায়, কিন্তু সেটুকুতেই মনে ছাপ রাখে। আমার তো কবিতাগুলি খুব ভালো লাগলো; চকিত ঝলকে 'পূরবী' 'মহুয়া'র কথা মনে পড়ে, কিন্তু এদের সৌরভ একটু নতুন রকমের; তাছাড়া এই বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্রনাথ এত বেশি ব্যক্তিগত কবিতা লিখলেন। তাঁকে যারা চোখে দেখেছে, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ে ধন্য হয়েছে যারা, তাদের পক্ষে এ দুটি বইয়ের বিশেষ একটি মূল্য। সে-মূল্য সেন্টিমেন্টাল, কিন্তু জীবনে সেন্টিমেন্ট যে একেবারে অনর্থক তা তো নয়।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় নিয়ে বিশদ আলোচনা কোনো-একদিন আমার করবার ইচ্ছা আছে, মূল কথাটা এখানে ব'লে নিই। 'পরিশেষ' থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর কাব্যের প্রসঙ্গের একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গীতিকবিতার চিরাচরিত বিষয় বিশ্বপ্রকৃতি, যা কখনো-কখনো ভগবানের সঙ্গে মিশে এক হয়েছে, আর নাটকীয় ও আখ্যান-কবিতার বিষয় প্রায়ই পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক। 'চৈতালি'র 'দিদি' প্রভৃতি কবিতায় মানুষগুলো স্ব-প্রতিষ্ঠিত নয়, তারা বিশ্বপ্রকৃতিরই অংশ, বোটের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা গাছপালা জলমাটির মতো তারাও দৃশ্য মাত্র। সমসাময়িক মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে প্রথম তিনি কবিতা লিখলেন 'পলাতকা'য়, তবে সেখানেও মানুষগুলো নিছক কাব্যের বিষয়বস্তু নয়, সমাজ-সমালোচনার উপলক্ষ্য। 'লিপিকা'র দু'একটি রচনায় সমসাময়িক জীবন নিয়ে আশ্চর্য রূপকথা আছে; 'পরিশেষে'ই প্রথম সমসাময়িক মানুষকে কাব্যের সম্পূর্ণ মূল্য তিনি দিয়েছেন। এ-ঝোঁক আরো স্পষ্ট হ'লো 'পুনশ্চ'তে—গদ্য কবিতা তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন বোধ হয় এই কারণেই যে আশে-পাশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চলতি ছবিগুলো ফোটাবার পদ্যের চাইতে গদ্যই ভালো উপায়। সমসাময়িক মানুষকে কাব্যের বিষয় হিসেবে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকার 'পুনশ্চ'তে। দৃশ্য নয়, রূপকথা নয়, সমস্যা উত্থাপনের উপলক্ষ্য নয়, তার অলজ্জ বাস্তব রূপেই সে সার্থক হ'লো। (রবীন্দ্রনাথ এ-কথা খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন 'পুনশ্চ'র 'সাধারণ লোক' কবিতায়।) খোট্টা দরোয়ান, বুড়ো পণ্ডিত, দুরন্ত বালক কলেজের ছাত্র, বাংলার সাধারণ মেয়ে, পুজোর বলির পাঁঠা, গাড়ি-টানা বলদ—আমাদের অতি পরিচিত চেহারাগুলির মিছিল দেখলুম 'পুনশ্চ'তে।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

('খাপছাড়া'য় এই মিছিলই আরো দীর্ঘ ; রেখায় ও ছন্দে সমসাময়িক প্রাকৃত উপাখ্যান আঁকা হ'লো অতিপ্রাকৃত আঙ্গিকে।) তারপর থেকে অন্যান্য বইগুলোতেও থেকে-থেকে চোখে পড়ে অস্পৃশ্য মেয়ে, কবির জাত-ভাঙানো প্রিয়া—

'গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টুঘোড়ায় চড়ো'—

উঁকি মারে বস্তির নোংরা ছবি, রেলগাড়ির ইস্টেশন উপমারূপে ব্যবহৃত হয়, শোনা যায় কলেজ-পড়া মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের গল্প। আলোচ্য বই দুটিতেও আছে চড়ুইপাখি নিয়ে, কুকুর নিয়ে, শাক-তুলতে-আসা গরিব মেয়ে নিয়ে কবিতা ; রোগ যেন তাঁকে নবজন্ম দিয়েছে, নতুন চোখে যিনি এ-জগৎ দেখছেন, আপাতত যা অতি ছোটো, অতি তুচ্ছ তার 'পরেও পড়েছে তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রেম। এ ছাড়া 'অফুরান সান্ত্বনার খনি দিদিমণি'-র উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা ক'টিতে নিখুঁত-নিপুণ, স্নেহ-সঞ্জীবনী নারীর যে-সহজ বাস্তব ছবি তিনি এঁকেছেন তা থেকে প্রত্যেক পুরুষই ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ হতে শিখবে জীবনে যে-ক'টি নারীর ভালোবাসা পেয়েছে তার জন্য।

এ দুটি বইয়ে মোটামুটি কবির ব্যক্তিগত কথা সহজভাবে বলা, তবু মাঝে-মাঝে অভিনব মিল চমক লাগায়, আর মাঝে-মাঝে অতি গভীর ইঙ্গিতময় কবিতা প'ড়ে থমকে যেতে হয়। 'আরোগ্য'র ১০নং কবিতাটি খুবই উল্লেখ-যোগ্য। কালস্রোতে সব ভাসে।

'এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল,...
আর তার কোনো চিহ্ন নাই।
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে
অনলনিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে ব'য়ে যাবে কাল...

ভাবা যেতে পারতো এর পরে কবি বলবেন, সাম্রাজ্য থাকে না, শক্তির দম্ভ

আষাঢ়, ১৩৪৮

ভেঙে পড়ে, থাকে প্রেম, থাকে ফুল পাখি সূর্যালোক। 'কিন্তু এখানে সে-কথা নয়। মানুষই থাকে, থাকে বিপুল জনতা। তারা কারা?

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।···
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে।···
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥

প্রগতিবাদীরা খুশি হবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আইভরি টাওয়ারের বাসিন্দা ব'লে জানেন তাঁরা পরম ভ্রান্ত। তাঁর মতো সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল মন দুর্লভ, অতএব তাঁর মতো সমাজ-সচেতন, সময়-সচেতন কবিও দুর্লভ। তিনি বড়ো হবার পর এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি তাঁর মনে যার প্রবল প্রতিক্রিয়া না হয়েছে, তাঁর সাহিত্যে যা ছায়া না ফেলেছে। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রাণ ও প্রেরণা, বাঙালিকে আত্ম-সম্মানবোধে দীক্ষা দিয়েছেন তিনিই। আজ পর্য্যন্ত দেশে ও বিদেশে মনুষ্যত্বের এমন কোনো অপমান ঘটেনি যার তীব্র প্রতিবাদ তিনি না করেছেন, মনুষ্যত্বের মহিমা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই জানিয়েছেন অভিনন্দন। মানুষের মর্যাদার জন্য অক্লান্ত যোদ্ধা তিনি। আজ এই বয়েসেও তাঁর বৈরাগ্য আসেনি, এখনো বিশ্বের সমস্যা নিয়ে, মানুষের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে তিনি ব্যাকুল। এখন তো তাঁর মনে হতে পারতো, 'পৃথিবীর যা হবার হোক্—আমার কী!' কিন্তু মুহূর্তের জন্যও এ-কথা মনে হয় না তাঁর। কী ক'রে হবে? তিনি যে প্রাণে-মনে মানবপ্রেমিক, কী ক'রে উদাসীন হবেন তিনি? কয়েক বছর আগে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'কল্লান্ত' প্রবন্ধে আমরা দেখেছিলুম দুর্মানুষিক সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি তাঁর জলন্ত ঘৃণা। এবারে তাঁর নববর্ষের বাণীতে আবার শুনলুম সেই তীব্র দৃপ্ত স্বর, যা ভয় দূর করে, আশা জাগায়। গত কয়েক বছর ধ'রেই

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮।

পৃথিবীতে যুদ্ধ চলেছে, আবিসিনিয়ায় চীনে স্পেনে, তারপর এই মহাসমর। শান্তি নেই, মানুষের মুক্তি এখনো বহু দূরে। কিন্তু এই উলঙ্গ উন্মত্ততার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবির কণ্ঠস্বর তো ফুটলো না; স্বদেশের ও সমস্ত জগতের সমস্যারাশি নিয়ে কী প্রচণ্ড ব্যাকুলতা তাঁর! ১৯৩৮-এর অসুখের পরে তিনি একটি কবিতা লেখেন ('প্রান্তিকে'র ১৭নং কবিতা) যা এদিক থেকে অত্যন্ত ইঙ্গিতময় :

'যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময় ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ···
এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধশূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।'

মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের কথা থাকলেও এখানে তিনি প্রশান্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন, তিনি বিদ্রোহী, যে-বিদ্রোহ 'তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা তুমি কি বেসেছো ভালো?' এই প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন ছিলো। তিনি জানেন কোনো-কোনো অবস্থায় প্রশান্ত মনোভাব অসম্ভব, তাই 'প্রান্তিকে'র শেষ কবিতা—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আসে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ॥'

এর বেশি আর-কোন আধুনিক কবি বলেছেন ?

বুদ্ধদেব বসু

তিনসঙ্গী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : মূল্য ১॥০ ও ২৲ টাকা

'গল্পগুচ্ছে'র 'নামঞ্জুর গল্পে'র কিছুকাল পর থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত ছোট-গল্প রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি। বাঙলা স্যাহিত্য ছোট-গল্পের স্রষ্টা তাঁর এই নতুন পথকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন অনেক দূরে। গল্পগুচ্ছের যে-কলম অজস্রতা নিয়ে বৈচিত্র্যময় বহুসংখ্যক সার্থক গল্প রচনা ক'রে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে আবার উদ্দীপ্ত চেতনায় কেঁপে উঠলো বার্দ্ধক্যের কম্পমান হাতের মুঠোয়। 'তিন সঙ্গী' রবীন্দ্রনাথের চরম বার্দ্ধক্যের দান। দৃষ্টি যখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল, যখন কলমের গতি-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইচ্ছা আর স্নায়ুর মধ্যে দুরন্ত রকমের একটা টানাহেঁচড়া চলছে তখন বহুকাল পর আবার রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোট-গল্প লিখলেন 'রবিবার'—সে আজ পুরো দু' বছরের কথাও নয়। কেরাণীকীর্ণ বাঙলাদেশ যে-আকুল আন্তরিক আগ্রহে দিন গোনে সাপ্তাহিক রবিবারের অপেক্ষায় তার চেয়ে বেশি ব্যগ্র হয়ে সেদিন দিন গুনেছিল রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার'কে হাতে পাবার আশায়। বাঙলাদেশের এ আগ্রহকে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত করলেন পর পর আরও দুটি গল্প লিখে : 'শেষ কথা' আর 'ল্যাবরেটরি'—এই তিনটি গল্পের সংগ্রহ 'তিন সঙ্গী'।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার বর্ণনা দিতে কতকগুলো বিশেষণের পুনরুক্তি আবশ্যক। চলতি ভাষা তাঁর রচনায় চরম পরিণতি পেয়েছে এটাও নতুন কথা নয়, 'তিন সঙ্গী'তে যেটা খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে সে হলো ভাষার অতি-সংহতি ও বলার ভঙ্গীতে একটা ঋজু বলিষ্ঠ ভাব। এদিক দিয়ে গল্প তিনটির ভাষার সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র ভাষার সামান্য একটু পার্থক্য আছে, ওতে সাবলীলতার দিকে ঝোঁকটাই বেশি। শেষের

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

কবিতার কয়েকটি চরিত্র ও গল্পের মূল সুরের সঙ্গে 'রবিবারে'র খানিকটা মিল আছে। অমিত রায়, লাবণ্য ও শোভনলালকে নতুন করে তিনি ছোট-গল্পে রূপ দিয়েছেন, সিসি-লিসিকেও আমরা দেখতে পাই শীলার মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে হালফ্যাসানের অর্দ্ধ-ইঙ্গ-চটুলতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তিক্ততার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ 'পাত্র ও পাত্রী'তে। তখন সুরটা ছিল একটু নরম, 'বিলিতি গিল্‌টি-করা মেয়ে' বা 'বিলিতি পুতুল' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান অপদার্থতার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তীব্র হয়ে উঠেছেন, যার চরম প্রকাশ শীলাকে ঘিরে 'ল্যাবরেটরি'তে। এই ফাঁপা মানুষগুলোর প্রতি তাঁর তিক্ততার ঝাঁঝ সেখানে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষের ভিতর দিয়ে। জাগানী ক্লাবের নমুনা আমাদের দেশে বিরল নয়, যেখানকার সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মতো বড়ো বড়ো শব্দের ফাঁকা আওয়াজ নিয়ে আলোচনার মকফাইট বাইরের গরীব লোকদের ভড়কে দেয়। জাগানী ক্লাবে চিত্রটি হয়েছে নিখুঁত। শ্লেষ ও ব্যাঙ্গর ভাবটা গল্পের পরিবেশের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মিশে আছে যে রেবতী ও শীলাকে নিয়ে প্লটের বাড়াবাড়িটুকু অপরিহার্য্য মনে হয়। ভালবাসার খাঁটি রসটুকু প্রিয়তমের জন্যে তুলে রেখে ছিবড়েতুল্য দেহটাকে যেমনি তেমনি ছুঁড়ে দেওয়ার সার-যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকাটা অসঙ্গত হলেও অসঙ্গতি তাতে নেই। কিন্তু সোহিনী ও অধ্যাপকের বেলায় ঘটনার সহজ গতিতে একটু ব্যতিক্রম অনুভূত হয়। 'মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর' বা সোহিনীর আদর্শের টিকের জোরে শারীরিক ও মানসিক বেপরোয়া ভাবটা তার অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নিয়ে একটু যেন মাটি থেকে আলগা হয়ে গেছে। 'রবিবার' ও 'ল্যাবরেটরি'তে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রাঙ্কনের চেয়ে আদর্শের দিকেই ঝোঁকটা বেশি দিয়েছেন ব'লে মনে হয়। 'পয়লা নম্বরে'র অনিলা নেপথ্যে থেকে শুধু প্রতিফলনের মধ্যে দিয়েই সজীব হয়ে আমাদের মনকে স্পর্শ করে, গল্প শেষে যার অস্তিত্ব মনকে সাড়া দেয় সব চেয়ে বেশি। শেষের দিকে কোথাও কোথাও তিনি চরিত্রটাকে নিয়েছেন আদর্শের নিছক একটা অবলম্বন হিসেবে তাই ভাব ও ভাষার মধ্যে ব্যক্তির অবলুপ্তিটা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু তেমনি আবার 'শেষ কথা'য় দেখতে পাই হঠাৎ ঝোঁকে মোড় ফিরে চলে গেছেন সেই গল্পগুচ্ছের আবহাওয়ায়, যার পরিবেশ ও প্রেম বিদগ্ধ মনের পোড়া জমি ভেদ ক'রে তার শেকড়বাকড় মেলে দেয় সরস প্রাণের সজীবতায়। 'শেষ কথা'র অচিরার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রের

আদর্শ। অচিরা, লাবণ্য, বিভা, এরা সবাই একই স্তরের—রূপের চেয়ে লাবণ্য যাদের বেশি, বুদ্ধি ও শিক্ষার সঙ্গে সংযম ও আত্মত্যাগের যেখানে ঘটেছে এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এরা প্রিয়তমের প্রতিভাকে নিজের দেহের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে তাকে খর্ব্ব করে নি, প্রেরণা জুগিয়েছে অগ্রগমনে, এমন কি প্রয়োজন বোধে নিজের সব স্বার্থ বলি দিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে তার চলার পথের সামনা থেকে। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ থেকে সুরু ক'রে অভিক পর্য্যন্ত এটাও তিনি পরিচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে লাবণ্য বা বিভার মতো মেয়েও ভালবাসার বেলায় ভালবাসে অভিকের মতো পুরুষ, যার মধ্যে ফুটে ওঠে গতানুগতিকের বিপক্ষে একটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ অস্বীকৃতি, যার প্রকাশের মধ্যে থাকে শিল্পী-মনের চোখ-ঝলসানো জাঁক; কিন্তু শ্রদ্ধা বা আত্মনিবেদন করার বেলায়, অথবা নিশ্চিত আশ্রয় হিসেবে বেছে নেবার বেলায় বেছে নেয় শোভনলাল বা অমরের মতো সৌম্য শান্ত আড়ম্বরহীন লোকটিকে। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ছোট-গল্পের মতো এ তিনটি গল্পেও নারীচরিত্রই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

কবির অশীতিতম জন্মদিনে প্রকাশিত 'জন্মদিনে' (এক টাকা) ও 'সভ্যতার সংকট' (চার আনা) এ দুটি বই এইমাত্র আমাদের হাতে এলো। 'জন্মদিনে'-তে আছে ২৯টি নতুন কবিতা, এ সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো। 'সভ্যতার সংকট' গত ১লা বৈশাখে কবির জন্মোৎসবের অভিভাষণ, দৈনিক পত্রের মারফৎ-এর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত হয়েছেন। তবু এ-বইটি বাংলা পড়তে পারে এমন প্রত্যেক লোকের কেনা উচিত এবং বার-বার পড়া উচিত, কারণ কবির বাণী এখানে বজ্র-বাণী, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেটা বীভৎস দিক, যার ফলাফল এখন পৃথিবী-জোড়া মানুষ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তেজে ধ্বনিত। নিজেদের দুর্গতি উপলব্ধি করতে, নিজেদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলতে কবির এই পুস্তিকা হবে জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা।

সাহিত্যের মূল্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম; সেই সঙ্গে বলেছিলেম যে ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতার কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের তারতম্য ঘটে। এইজন্য রসের ব্যবসা সর্বদা ফেইল হবার মুখেই থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম—"ছবি ও গান"। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতি মাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের সীমা ছড়িয়ে ওঠে। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড় রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে সেক্সপিয়ারের Lucrece এবং Venus and Adonis-এর কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হ'তে পারে সে কথা সাহস করে বলি বা না বলি, কিন্তু Lady Macbeth অথবা King Lear অথবা Anthony ও Cleopatra এদের সম্বন্ধে এমন কথা

যদি কেউ বলে তাহলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সেক্সপিয়ার মানব চরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি "কুমারসম্ভব"-এর হিমালয় বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-মর্য্যাদা হয়তো আছে তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই। কিন্তু সখীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনও যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে, মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি সাহিত্যের আসরে এই রূপ সৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবি কঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইলো তার "ভাঁড়ুদত্ত"। Midsummer Night's Dream নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে কিন্তু Falstaff এর প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে, যা প্রত্যক্ষ—ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই রকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য Don Quixote, ধন্য Robinson Crusoe। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপ, রচনা। কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত। আবার কোনো-কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়—যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

"চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে"—এ লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে "তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি।" এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ আছে, এঁকে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদয়ন
২৫।৪।৪১
দুপুর